নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন

2013

দ্বিতীয় ভাগ

[কর্ম্মকৌশল]

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"-প্রণেতা
শ্রীবিনয়কুমার সরকার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯৩২

মূল্য দুই টাকা।

প্রকাশক
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি.
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপতি প্রেস
৩৮, নন্দকুমার চৌধুরী লেন,
কলিকাতা।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় ভাগ—কর্ম্মকৌশল

নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন

দ্বিতীয় ভাগ

কর্ম্ম-কৌশল

যুবক বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্র *

জগদ্‌গুরু ফিখ্‌টে

মানবজাতির এক জগদ্‌গুরু জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিখ্‌টে দুনিয়ায় যৌবন-পূজার প্রথম পুরোহিত। যৌবনের ঋষি সেই জার্ম্মাণ সন্তানকে সেলাম ঠুঁকিয়া যুবা-জগতের সকল ঠাঁইয়েই কাজ চালানো রেওয়াজ। কাজেই বাঙলার যৌবনশক্তিও ফিখ্‌টেকে কুর্ণিশ করিয়া কাজের আড্ডায় খাড়া হউক।

সে ১৮০৬ সনের কথা। নেপোলিয়নের সবুট পদাঘাতে তখন জার্ম্মাণ নরনারীর হাড়গোড় ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেই চরম দুর্গতির দিনে,—

"যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর—
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"

---

* বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ (এপ্রিল ১৯২৭), মাজু, হাওড়া

ইত্যাদি সুরে গান গাহিবার জন্য শিলার আর বাঁচিয়া ছিলেন না। কবিবর গ্যেটে তখন হ্বাইমারের রাজ-নিকেতনে বসবাস করিতেছেন। তিনি ভাবুকতার উন্মাদনা হইতে এক প্রকার পেনশ্যনই লইয়াছেন। য়েনা-পল্লীর 'টোলে' তখন ফিখ্টে দর্শন-চর্চ্চায় বাহাল। এই 'টুলো পণ্ডিত' জার্ম্মাণিকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার মতলবে "য়ুগেণ্ড-বুণ্ড" বা যৌবন-সঙ্ঘ কায়েম করিতে লাগিয়া যান। পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণেরা "ফ্রাইহাইট্স-ক্রীগ" বা স্বাধীনতা-সমরের ঝাণ্ডা খাড়া করে। সেই সময়ে যে সকল শক্তি জার্ম্মাণিতে কাজ করিয়াছিল তাহার ভিতর ফিখ্টে-প্রবর্ত্তিত যৌবনপূজা নং ১ শ্রেণীর সামিল।

পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণ ইয়োরোপে "যুবক ইতালি" নামক আন্দোলন সুরু হয়। সেই আন্দোলনও সফলতা লাভ করিয়াছে। তাহার পর আজ দুনিয়া ভরিয়া দেখিতেছি যৌবন-আন্দোলনের নানা স্রোত, নানা খুঁটা, নানা গড়ন।

বাঙলার যৌবন-শক্তি

কিন্তু যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে দুনিয়ার ভিতর কোন যৌবন-শক্তিটা সব্সে সেরা তাহা হইলে আমি বলিব সে হইতেছে ভারতের যৌবন-শক্তি। কেননা যুবক জার্ম্মাণি, যুবক ইতালি, যুবক জাপান, যুবক হাঙ্গারি, যুবক শ্লাভ ইত্যাদি সকল যৌবন-শক্তির পশ্চাতেই খোলা-খুলি অথবা গোপনীয় ভাবে কোন-না-কোন রাজশক্তি কিছু কিছু কাজ করিয়াছে। কিন্তু আজ বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া যুবক বাঙলা আর যুবক ভারত দুনিয়ায় যে অসাধ্য-সাধনের ছোট-বড়-মাঝারি খুঁটা গাড়িয়া চলিয়াছে তাহার পশ্চাতে কাজ করিতেছে এক মাত্র যৌবন-শক্তি। বিশ্বব্যাপী বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে ও যুবকবাঙলা আর

যুবকভারত আজ জগতের বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম বিশ্ব-শক্তিরূপে পরিগণিত হইতেছে। যুবক আমেরিকার নবীনতম ডেমক্রেসি, যুবক ইংলণ্ডের ভবিষ্য-পন্থী নরনারী, যুবক ফ্রান্সের ভাবুকদল, যুবক জাপান, যুবক তুর্ক, যুবক জার্ম্মাণি, যুবক রুশিয়া, যুবক চীন, যুবক ইতালি সকলেই ভারতের যৌবন-শক্তিকে—আফিসী কায়দায় না হউক প্রাণের প্রণালীতে—অভিনন্দন করিতে সুরু করিয়াছে।

এই বিশ বাইশ বৎসরের বাঙালী যাহা কিছু করিয়াছে তাহা খুব উঁচু-দরের বস্তু। কিন্তু এই বাসি মালের পচা গন্ধ শুঁকিবার জন্য আমি বাঙ্‌লার যৌবনশক্তিকে ডাকিতেছি না। বুড়া গুলার লেজুর ধরিয়া চলা,—মামুলি সভা-সমিতির বাছুর স্বরূপ, সুপ্রচলিত দলাদলির পরিশিষ্টের মতন যুবক বাঙ্‌লার চলাফেরা করিলে চলিবে কেন? আজ ১৯২৭ সন। এ ১৯২০-২২ নয়,—১৯১৫-১৭ নয়, ১৯০৫—৭ ত নয়ই। ১৯২৭ সনের উপযুক্ত,—১৯৩০ সনের জন্য যুবক বাঙলাকে আজ বড় বড় কাজের,—আসল কথা, বড় বড় চিন্তার,—ভার ঘাড়ে বহিয়া লইতে হইবে। আগামী পাঁচ সাত দশ বৎসরের কাজের দ্বারা বিগত বিশ বাইশ বছরকে ডুবাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করাই আমি আমাদের যৌবন-আন্দোলনের এক মাত্র লক্ষ্য সমঝিয়া থাকি।

যৌবন-দর্শন

যৌবন আর জীবন আমার কাছে একই বস্তু। ১৯০৫-৭ সনের ভারতে আমরা জীবন আর যৌবন এক সঙ্গে সুরু করিয়াছিলাম। সেই জীবন আর যৌবন কি চিজ তাহা কয়েক বৎসর হইল (১৯১৬) জাপানের হাকোনে হ্রদের কিনারায় বসবাস করিবার সময়,—তুলনায় বুঝিবার এক সুযোগ পাইয়াছি। অদূরে দেখা যাইতেছিল ফুজি-সান।

এই আগ্নেয়গিরি তখন নির্ধূম, নিঝুম, স্পন্দনহীন, মরা। তাই দেখিতাম আর ভাবিতাম,—

ফুজি তুই বুড়ী হয়েছিস, শুকিয়ে গেছে তোর যৌবন,
তাই বুড়াবুড়ীদের তীর্থস্থান তুই, হায় নিষ্ফল তোর জীবন।
তোর বুকের আগুন গেছে নিভে',—নাকে মুখে নাই নিঃশ্বাস,
রক্তের স্রোত নাই শিরায় শিরায়,—হৃদয়ে ছুটেনা উচ্ছ্বাস।
দপ্‌দপায় না ধমনী তোর,—ফুস্‌ফুস্‌ গেছে পচে',
মেঘ-চিক্কণ আগুনে ধোয়া চুলছড়ানো গেছে ঘুচে'।
রক্তমাংসে প্রাণ বহিত যখন, পাগ্‌লি ছিলি তখন তুই,
(তোর) জীবনভরা যৌবন আর যৌবনভরা জীবন ছিল দুই।
(তোর) জ্যান্ত মুখের কথায় তখন আগুন ছুট্‌ত আকাশে,
আবেগে ভরা চোখের চাহনি প্রলয় তুল্‌ত বাতাসে।
তোর ধড়-ফড়-করা হিয়ার পরশে টগ্‌বগ্‌ ফুট্‌ত ধরাতল,
তোর ছোঁয়ায় আস্‌ত উন্মাদ জীবনের,—যৌবনের রক্ত-চলাচল।

যৌবন-আন্দোলন বলিলে আমি যাহা বুঝি তাহা অতি সহজ-সরল। মামুলি কথা কপ্‌চাইবার জন্য নরনারী আর লালায়িত নয়। পয়সাওয়ালা লোকগুলো একমাত্র পয়সার জোরে আর জননায়ক বা দেশনায়ক বিবেচিত হইতেছে না। যেন তেন প্রকারেণ নামজাদা হইয়া পড়িলেই কোনও ব্যক্তি সমাজে ইজ্জৎ পাইতেছে না। প্রতিমুহূর্ত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই খোলা বাজারে তাহার ব্যক্তিত্ব যাচাই করাইয়া লইতেছে। দুচার বৎসর ধরিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষ দেশের উপর তাহার হামবড়ামির জুলুম চালাইবার সুযোগ পাইতেছে না। একমাত্র বয়সের খাতিরে অথবা পুরানা কৃতিত্বের জোরে বর্ত্তমানকে দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইতেছে।

অপর দিকে নতুন নতুন অজ্ঞাতকুলশীল লোকেরা মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতেছে। যখন তখন দেশের গলিঘোঁচে নয়া নয়া জাত, নয়া নয়া দল, নয়া নয়া স্বার্থ, নয়া নয়া আন্দোলন দেখা দিতেছে। সর্ব্বত্র নয়া নয়া জ্যান্ত চিন্তা গজিতেছে আর তাজা তাজা প্রাণে-ভরা প্রতিষ্ঠান মূর্ত্তি পাইতেছে। ছোটগুলা বড় হইতেছে, বড়গুলা ছোট হইতেছে। হরদম ভাঙা-গড়ার উন্মাদনাই যৌবন-পূজার প্রাণ।

আমার যুবা কাহারা?

ছুটাছুটি করছে সদা উদ্বেগেভরা পরাণে তারা,
শান্তি তারা চাখেনা কখনো, জানেনা আরাম ক্লান্তিহারা।
উদাস নীরস জীবন তাদের, কর্ম্ম যখন সফল হয়,
যেথা হতে পারে পরাজয় শুধু সেথাই তারা শক্তিময়।
কঠোর কড়া ও অসাধ্য যাহা, যাহা বোধ হয় নাহি কখনো হবে,
তাদেরই রসেতে মস্‌গুল্‌-তারা, তাদেরই তারা বাছিয়ে লবে।
পুরাণো এলাকা ছেড়ে দিয়ে তারা—কাড়িবে নতুন নতুন স্থান,
কালিকার মাল ছোঁবেনা আজিকে, চাঙ্গা তাহাতে হয় না প্রাণ।
অশান্তি প্রাণ, পাগলামি প্রাণ, বিফলতা-পরাজয় প্রাণ—
আবেগ যাদের ফুরায় না হিয়ায়, এই দুনিয়ায় তারাই জোআন।

নবীন ভারতের জীবন-স্পন্দন

আমরা খবর রাখি বা না রাখি আমাদের চোখের সম্মুখে একটা নবীন ভারত গড়িয়া উঠিতেছে। এই ভারতের নর-নারী, এই ভারতের শ্রেণীভেদ, এই ভারতের উচ্ছ্বাস-উল্লাস "সেকেলে" ভারতের,—এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতের নর-নারী, শ্রেণীভেদ ও উল্লাস-উচ্ছ্বাস হইতে স্বতন্ত্র। এমন একটা ভারত গজিয়া উঠিয়াছে বঙ্কিম-মধু-

স্থদনের আমলেও তাহার আন্দাজ করা সম্ভবপর হয় নাই। একালের যুবক বাঙ্‌লাকে এই নবীন ভারতের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইতে হইবে।

ভারতে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৩ সনে অনেক নেহাৎ ছোট কারখানাকে কারখানা বলা হইত না। তথাপি "ভারতীয় ফ্যাকটরীজ্‌ আইন" (১৯১১, ১৯২১) মাফিক ৫,৯৮৫ কারখানা গণা হইয়াছিল। ১৯২৪ সনে মোট সংখ্যা ৮,৫৪৮। যে সকল কারখানায় বিশ জনের চেয়ে কম লোক কাজ করে সে সব বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশে কার্পাস বীজ বহিষ্করণের ছোট ছোট কারখানাগুলি রেজিষ্ট্রেশন এড়াইয়া শাসনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অতি সত্বর সেগুলির উপর "নোটিস জারি" করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে হস্তনির্ম্মিত দিয়াশলাইয়ের কারখানার ছয় বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়সের বালকবালিকাদিগকে বহুসংখ্যায় নিযুক্ত করা হইত। নোটিস দিয়া সেই প্রথা বন্ধ করা হইয়াছে। বেহার এবং উড়িষ্যায় অনেকগুলি করাতের কলে বিশ জনের ন্যূন্য-সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইত। কলগুলির অবস্থাও বিপজ্জনক ছিল। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেগুলিকেও "নোটিস" দিয়াছেন। কারখানার শাসনে গবর্ণমেণ্টের হাত বেশ একটু দেখা যাইতেছে।

ছাপাখানার সংখ্যা ছিল ২৩১, এখন হইয়াছে ৩৬৩। বিশেষতঃ চা-কারখানাগুলিতে এই বাড়তি বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৩ সনে চা-কারখানা ছিল ৬৫৭টা। ১৯২৯ সনে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৮৫টা। কারখানার লোকজনদের সংখ্যা ১৯২৩ সনে ছিল ১,৪০৯,১৭৩। ১৯২৯ সনে এই সংখ্যা হইয়াছিল ১,৭৪২,৮৬০। মেয়েরাও ফ্যাক্টোরির কাজে মোতায়েন হইতেছে। ১৯২০ সনে ছিল ১৮৪,৯২২ জন, ১৯২৯ সনে দেখিতে পাই ২৫৭,১৬১।

বার বৎসরের কম বয়সে বালকবালিকাদিগকে আর কারখানায় কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ১৯২৪ সনের ইহাই বিশেষ কীর্ত্তি। ১৯২৩ সনে সকল বালকবালিকার সংখ্যা ছিল ৭৪,৬২০। কিন্তু ১৯২৯ সনে সংখ্যা নামিয়াছে ৪৬,৮৪৩ পর্য্যন্ত। বয়সের সার্টিফিকেট ব্যতীত বালকবালিকা নিয়োগ প্রায়ই হয় না। সার্টিফিকেটগুলি ভালরকমে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। ১৯২৪ সন আমাদের মজুর-সমাজের পক্ষে নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে।

যে সমস্ত কারখানায় "পুরুষদের" জন্য ৪৮ ঘণ্টার সপ্তাহ রক্ষিত হয়, তাহাদের অনুপাত ছিল শতকরা ২৯। যেখানে পুরুষেরা ৫৪ ঘণ্টা অথবা তাহার কম খাটে তাহার অনুপাত শতকরা ৪১। ৫৪ ঘণ্টার বেশী যেখানে খাটিতে হয় তাহাদের অনুপাত শতকরা ৫৯। ১৯২৩ সনের তুলনায় "স্ত্রীলোকদের" তরফ হইতে ফ্যাক্‌টরিগুলার ঐরূপ অনুপাত ছিল শতকরা ৩৪, ৪৬ এবং ৫৪। এই অঙ্কটায় কিছু উন্নতি দেখা যায়। যে সমস্ত কারখানায় বালকবালিকা রাখা হয় এবং তাহাদের কাজ সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা অথবা তাহার কম,সে সমস্ত কারখানার শতকরা হার ৩৪; ১৯২৩ সনে ছিল ৪৩।

১৯২৯ সনে দৈব-দুর্ঘটনা অনেক হইয়াছে। তাহাদের মোট সংখ্যা ২০,২০৮। তন্মধ্যে ২৪০টায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। জানিয়া রাখা উচিত যে, ১৯২৪ সনের মধ্যভাগে, "শ্রমিক ক্ষতি-পূরণ আইন" প্রচলিত হইয়াছে। সেই বৎসর তিনটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি সূতার কলের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ২৬টি লোক মারা যায়। দিল্লীর একটি কারখানায় বয়লার পরিষ্কার করিবার সময় ১৮ জন লোক পুড়িয়া মরে। খান্দেশের একটা কারখানায় আগুন লাগায় ১২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯১২ সনের পূর্ব্বে ঐ ধরণের দুর্ঘটনা যত ঘটিত, ফ্যাক্টরী আইনের ২০ ধারা প্রচলিত হইবার পর হইতে আর তত হয় না।

কিন্তু মারাত্মক ও সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিল্প-ব্যবসায়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কলকব্জার জটিলতা বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদিগকে কি ভাবে নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। চলন্ত যন্ত্র পরিষ্কার করিবার সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে।

শ্রমিকদিগের মঙ্গল-সাধন-উদ্দেশ্যে চেষ্টা চলিতেছে। কলের মালিকেরা কেহ কেহ শ্রমিকদিগের উপযোগী বাসস্থান দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু জমি পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। বোম্বাইয়ে শ্রমিকদিগের জন্য বাস-ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। কারখানার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে ভিজা হাওয়া আনা হইয়া থাকে। তাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে। তাহা নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে। বোম্বাইয়ে কোনো কোনো কারখানায় হাওয়া আনিবার জন্য কল স্থাপিত হইয়াছে।

"ফ্যাক্টরী আইন" ভাঙ্গিবার দোষে ১৯২৯ সনে সাজা পাইয়াছে ৪৬৩ জন মালিক। অন্যান্য সাজা ধরিলে সবশুদ্ধ মোট ১৩০২টি দণ্ড হইয়াছে। অনেক প্রদেশে অনেক স্থলে জরিমানার হার বড় কম। রেঙ্গুনের হাইকোর্ট এই সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া একটি সাকুলার জারি করিয়াছেন। সেখানকার জজদিগের মত এই যে, যেসব অপরাধী আইন ভঙ্গ করিয়া শত শত টাকা সঞ্চয় করে, অল্প জরিমানা করিলে তাহাদিগকে অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

বোম্বাইয়ে তাঁতী মজুর সমিতি

কারখানার আবহাওয়াই নয়া ভারতের একমাত্র নূতনত্ব নয়। সঙ্গে সঙ্গে মজুর-সমিতির উৎপত্তিও একালের এক বড় ঘটনা। তাদের গতি-

ভঙ্গীর সঙ্গে চলিতে না শিখিলে যুবক বাঙ্গলা দুর্ব্বল থাকিতে বাধ্য। মজুর-সমিতির গঠনে বোম্বাই অগ্রণী। তাহার কথা আমাদের এদিকে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১৯২৬ সনে বোম্বাইয়ের তাঁতী-মজুর সমিতি "(টেকষ্টাইল লেবার ইউনিয়ন)" গঠিত হইয়াছে। ঐ সময়ের পূর্ব্বে সহরে কলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ছোটখাট প্রায় দশটি মজুর-সমিতি ছিল। কিন্তু বিগত বিরাট ধর্ম্মঘটের সময় বুঝা যায় যে, একই সহরে একই উদ্দেশ্য লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সমিতি থাকিলে তাহাদের দ্বারা কোনো ফললাভ হয় না। সেরূপ থাকাও বিপজ্জনক। সবগুলিকে একটি কেন্দ্রসমিতির অন্তর্গত করা বিশেষ দরকার। তাই পূর্ব্বোক্ত সমিতিগুলিকে লইয়া একটা নূতন সঙ্ঘ-গঠনের চেষ্টা হইল। ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন সমিতির প্রতি-নিধিবর্গের একটা সভা হয় এবং তাহার ফলেই এই সমিতির জন্ম। ইহার সঙ্গে বোম্বাইয়ের নয়টি তাঁতী-মজুর-সমিতি মিলিত হইয়াছে। সভ্যদের মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে। যদিও কলের সব বিভাগ হইতেই সভ্য গ্রহণ করা হইতেছে, তবু তাঁতবিভাগের সভ্য সংখ্যাই বেশী। চাঁদার হার প্রতি সভ্যের চারি আনা মাত্র।

ম্যানেজিং কমিটি কর্ত্তৃক সমিতির কার্য্যাবলী সম্পাদিত হয়। সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক এবং শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠিত। প্রত্যেক কলের শ্রমজীবীদের সভায় প্রতি এক শত জন শ্রমজীবীর মধ্য হ‧তে এক একটি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত; হয়। বর্ত্তমানে ম্যানেজিং কমিটির সভ্য-সংখ্যা ৭৯ জন। তন্মধ্যে ৭১ জন শ্রমজীবী, এবং চাঁদাদাতা সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, ৮ জন কার্য্যনির্ব্বাহক। সমিতির কাজ ভালরূপে চালাইবার জন্য দুইটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। একটি কুর্লাতে, আর একটি মদনপুরায়। কেন্দ্র

স্থানে কেন্দ্রীয় কমিটি রহিয়াছে। তাহা নিকটবর্ত্তী কলসমূহের শ্রমজীবী-দের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এইসব কেন্দ্রস্থানের প্রধানদিগকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলা হয়। তাহারাও শ্রমজীবী, এবং শ্রমজীবীদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত। ইহারাই সমিতির সেক্রেটারী এবং সেই জন্যই সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক-মণ্ডলীতে ইহাদের স্থান আছে।

মাসিক চাঁদা ছাড়া ইহার আয়ের আর কোনো উপায় নাই। চাঁদার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সমিতির সংস্থাপন ও প্রচার কার্য্যে খরচ করা হয় এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ উপকার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে জমা থাকে। মালিক-দের বিরুদ্ধে নালিশ চালানো সমিতির কার্য্যতালিকায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে।

বোম্বাইয়ের তাঁতী-মজুরদের সংখ্যা ধরিলে, তাহার তুলনায় ইহার শক্তি অতি ক্ষুদ্র। সমিতির সভ্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু পথে অনেক বিঘ্ন-বাধা। প্রথমতঃ, যদিও শ্রমজীবীদের এই সমিতির প্রতি অনেক নিয়োগকারী সহানুভূতি-সম্পন্ন, তবু সকলে সেরূপ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের ক্ষেত্র এরূপ বিস্তৃত যে, সমিতি তাহার এই শৈশব অবস্থায় অর্থাভাবে সমস্ত স্থানের তত্ত্বাবধান এবং চাঁদা-সংগ্রহের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে অসমর্থ। তৃতীয়তঃ, শ্রমজীবীরা অশিক্ষিত হওয়ায়, সমিতি তাহার সামান্য কয়জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে এই সঙ্ঘের আবশ্যকতা কি, তাহা তাহাদিগকে সমঝাইতে পারিতেছেন না।

যাহা হউক, অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও মজুরসমাজ ক্রমশঃ আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বরাজ-লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মজুরদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি ঘটিলেই অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও জনগণের স্বরাজ ও স্বাধীনতা পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। ইহাই ধনবিজ্ঞানের অন্যতম রাষ্ট্রীয় উপদেশ।

কারখানা-ভারত আর মজুর-ভারত দুই'ই একালের ভারত। এই ধরণের অন্যান্য দফায়ও ভারতকে বাড়্‌তির পথে অগ্রসর দেখিতে পাই। সম্প্রতি সকল কথা বলিবার দরকার নাই।

"আধুনিক ভারত"-সঙ্ঘ

১৯০৫—৭ সনের তুলনায় যুবক বাঙ্‌লা আজ খুব বড়। আমরা বাস্তবিকই একটা "বৃহত্তর বঙ্গে" বাস করিতেছি। কিন্তু তথাপি বলিব যে, বাঙ্গালীর চিত্ত এখনো অতি সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গালী নরনারী আজও বাংলার বাহিরের ভারত সম্বন্ধে প্রায় পূরাপূরি অজ্ঞ ও অন্ধ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জ্ঞানে ও কর্ম্মে বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই বাড়্‌তির সংবাদ বাঙালী জাতি, বাঙ্‌লা সাহিত্য, বাঙ্‌লা দেশ বড একটা রাখে না। বাঙালীর চেতনা ভারতের ডাকে যথার্থরূপে সাড়া দিতে অসমর্থ। বাঙলা দেশে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুবকবঙ্গের ভাবুক আর কর্ম্মদক্ষ নরনারী শক্তিযোগের পরীক্ষা দেখাইতে অগ্রসর হউন। পাঁচ সাত দশ বৎসরের পূর্ব্বেকার মাপকাঠিতে জীবন যাচাই করা যৌবনধর্ম্মের পক্ষে অসম্ভব। এই বুঝিয়া আমাদের কাজে নামিতে হইবে।

"আধুনিক ভারত" নামক একটা সঙ্ঘের সৃষ্টি হইলে বাংলা দেশের একটা মস্ত দারিদ্র্য ঘুঁচিবার সম্ভাবনা আছে। বাংলার যৌবনশক্তির দেড়আনা বা দুইআনা অংশ এই দিকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই আমরা বৃহত্তর জীবনের একটা নতুন ধাপ লইতে সমর্থ হইব। এই সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব পেশ করিতেছি। সঙ্ঘটার পরিচালনা সম্বন্ধেও কয়েকটা ইঙ্গিত দিয়া যাইতেছি।

উদ্দেশ্য—(ক) বাঙালী সমাজে আধুনিক ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য এই সঙ্ঘ গঠিত।

(খ) তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, হিন্দী, উর্দ্দূ ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে আধুনিক ভারতের ক্রমবিকাশ এবং বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করা এই সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কার্য্যতালিকা—(১) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে সুদক্ষ নরনারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইবে। তাঁহারা ইংরেজীতে (অথবা সম্ভব হইলে হিন্দীতে বা বাংলায়) নিজ নিজ প্রদেশের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতা, কথোপকথন, সমালোচনা ইত্যাদি নানাবিধ চর্চ্চায়ই বক্তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্য হইতে উপকরণ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) বাঙালী সাংবাদিক ও লেখকদিগকে ভারতের নানা প্রদেশে পাঠাইয়া বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের ছাত্র-বিনিময় কায়েম করা হইবে। প্রবাসে থাকিবার সময় ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে সেই সকল প্রদেশবাসী নরনারীর অতিথিরূপে কিছুকাল কাটাইতে পারে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

(৪) বাঙালী পর্য্যটকদিগকে ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রদেশবাসী নরনারীর সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেওয়া হইবে।

(৫) বাংলার দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রে তামিল, তেলেগু, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) কলিকাতা-প্রবাসী বিভিন্ন প্রাদেশিক নরনারীর সঙ্গে বাঙালী সমাজের মেলমেশ পুষ্ট করিবার আয়োজন করা হইবে।

(৭) দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া "আধুনিক ভারত" সঙ্ঘ অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবেন।

বক্তৃতার খরচ—(১) আপাততঃ মাসে একবার করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বক্তা নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইবে।

(২) এই জন্য প্রত্যেককে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের খরচ দিতে হইবে।

(৩) জন প্রতি সাধারণতঃ গোটা তিনেক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) বক্তাকে কোনো প্রকার দক্ষিণা দেওয়া হইবে না।

(৫) কলিকাতায় বক্তাকে আট দশ দিন বা দুই সপ্তাহ কাটাইতে হইতে পারে। কলিকাতাবাসী দুই তিনটী গৃহস্থ-পরিবার প্রত্যেকে দুই তিন দিনের জন্য বক্তাকে অতিথি ভাবে রাখিবার ভার লইবেন।

(৬) কলিকাতায় বসবাসের সময় বক্তাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ অথবা পত্র ব্যবহার করিবার দরকার হইতে পারে। এই জন্য তাঁহাকে এককালীন ১০৷১৫৲ দেওয়া যাইবে।

(৭) বক্তৃতাবলীর খরচ মোটের উপর বার্ষিক ৩০০০৲ ধরা যাইতে পারে।

কার্য্যনির্ব্বাহের খরচ—(১) কলিকাতার কোনো লাইব্রেরীতে অথবা অন্য কোনো সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এই জন্য সম্প্রতি ভাড়া দিবার দরকার হইবে না।

(২) তবে একজন ম্যানেজার এবং একজন দরোয়ান আবশ্যক হইবে। এই জন্য বার্ষিক ১০০০৲ লাগিতে পারে।

(৩) চিঠি পত্র ছাপিবার জন্য এবং ডাক টিকেট ও সভার ব্যবস্থা সম্পর্কে আনুমানিক ১,০০০৲ বার্ষিক ধরিয়া রাখা উচিত।

(৪) সকল প্রকার খরচ ধরিলে প্রথম বৎসর ৫,০০০৲ খরচ হইবার সম্ভাবনা।

"আন্তর্জ্জাতিক ভারত"-সমিতি

বুড়ারা কি করিবে তাহা নির্ভর করে যুবারা কি করিতেছে তাহার উপর। দুনিয়ার সকল দেশেই যৌবন-আন্দোলনের এই কান্তি। আশুতোষ-চিত্তরঞ্জনের মতন যৌবন-সেবক বীরপুরুষ সৃষ্টি করা একালে যুবক বাঙলার অন্যতম গৌরব। আজ ১৯২৭ সনে বাঙলার মগজে নতুন নতুন ধরণের ঘী গজাইবার জন্য নতুন নতুন ঢঙের কর্ত্তব্য-তালিকা প্রচার করা আবশ্যক। এ হইতেছে দেশের লোকের মাথা পরিষ্কার করিবার কথা। তাহার ভারও আসিয়া পড়িতেছে যুবক বাঙলার ঘাড়ে। আমি সম্প্রতি বাঙলায় বিশ্বশক্তিকে ও বর্ত্তমান জগৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা পাড়িতেছি। বিশ্বশক্তির চর্চ্চা করা আমার জীবনে নতুন কিছু নয়। সেকালে অর্থাৎ ১৯১৪ সনে বিদেশে যাইবার পূর্ব্বেও বিশ্বশক্তির আরাধনা করিয়াছি প্রচুর। বিশ্বশক্তি সম্বন্ধে বাংলায় একখানা প্রবন্ধ-পুস্তক আমার সেই যুগেরই রচনা। অধিকন্তু ১৯১২ সনে আমার এক ইংরেজি বই বিলাতে প্রকাশিত হয়। তাহাতে ইতিহাস-বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল কথা আছে তাহার আগাগোড়া সবই বিশ্বশক্তি মূলক। আজও সেই বিশ্বশক্তির কথাই পাড়িতেছি।

একটা "আন্তর্জ্জাতিক ভারত"-সমিতি গড়িয়া উঠুক।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-তালিকা—(১) বাংলার নরনারীকে নিজ নিজ

জীবন পুষ্টির মতলবে সকল প্রকার বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে উপযুক্ত করিয়া তোলা "আন্তর্জ্জাতিক ভারত"-সমিতির লক্ষ্য।

(২) বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজের সকল প্রকার মেলমেশ, লেনদেন ও আনাগোনা কায়েম করা এই লক্ষ্যের অন্তর্গত।

(৩) এই জন্য ভারতের বহির্ভূত এশিয়ার, ইয়োরামেরিকার আর আফ্রিকার নানা দেশের বিভিন্ন চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর এবং অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের সংবাদ বাংলার অলিতে গলিতে বাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করা মুখ্য উদ্দেশ্য।

কর্ম্ম-প্রণালী— ১) বিদেশের নগরে নগরে যে সকল আন্তর্জ্জাতিক চিন্তা-কেন্দ্র ও কর্ম্ম-কেন্দ্র আছে তাহাদের সঙ্গে এই সমিতি সর্ব্বদা পত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

(২) বিদেশী সুধী, এঞ্জিনিয়ার, মজুর-সেবক, কিষাণ-সেবক, রাসায়নিক, পর্য্যটক, গবেষক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুকুমারশিল্পী, চিকিৎসক, সমাজ-সেবক ইত্যাদি ধরণের লোক ভারতে আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে বাঙালীর ভাব-বিনিময় ও কর্ম্ম-বিনিময়ের বন্দোবস্ত করা হইবে।

(৩) অধিকন্তু তরুণ বঙ্গের কর্ম্ম-দক্ষ ও সুবিবেচক নরনারীকে বিদেশ-পর্য্যটনে এবং বিদেশ-প্রবাসে উৎসাহ প্রদান আর সাহায্য করাও সমিতি নিজ কর্ত্তব্য সমঝিয়া চলিবেন।

বিশ্বশক্তি-মূলক মাসিক পত্র—সমিতি নিজ মুখপত্রস্বরূপ একখানা বাংলা মাসিক পত্র চালাইবার ভার লইবেন। তাহার নাম হইবে "বিশ্বশক্তি" অথবা "আন্তর্জ্জাতিক ভারত"। "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ" "বঙ্গবাণী" ইত্যাদির আকারে কাগজ চালানো হইবে। সমিতির সভ্যেরা সভ্য হিসাবে এই কাগজ বিনামূল্যে পাইবেন।

কাগজটা চালাইবার জন্য সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠন করা হইবে। পাচ ছয়

জন বিশেষজ্ঞ তাহার ভার লইবেন। ফরাসী, জার্ম্মান, জাপানী, আরবী, ফার্সি, তুর্ক, রুশ, ইতালিয়ান, স্পেনিশ ইত্যাদি ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাহাকেও সম্পাদক-সঙ্ঘে ঠাঁই দেওয়া হইবে না।

তাহা ছাড়া সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, বাস্তবিদ্যা, রসায়ন, এঞ্জিনিয়ারিং, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, ধনবিজ্ঞান, চিত্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যায় সুদক্ষ লোক বাছিয়া সম্পাদক-সঙ্ঘে বসাইতে হইবে।

সম্পাদক-সঙ্ঘের মাথায় কোনো লোক রাখিবার দরকার নাই। তবে একজনকে কর্ম্মকর্ত্তা-সম্পাদক (ম্যানেজিং এডিটার) রূপে বাহাল করা আবশ্যক হইবে।

পত্রিকাটি বাহির করিবার জন্য বেশী সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। দুচারমাসের ভিতরই কাজ সুরু করা যাইতে পারে। পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গেই সমিতির অন্যান্য কাজে ক্রমশঃ হাত দেওয়া সম্ভবপর হইবে। আগামী বর্ষের যুবক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যুবক বাংলার কয়েক-জন কর্ম্মদক্ষ ও সুবিবেচক তরুণ-তরুণী যদি পত্রিকাটা কয়েকমাস ধরিয়া চালাইতে পারেন তাহা হইলে আমাদের যৌবন-পূজা অনেক দূর আগাইয়া যাইতে পারিবে।

জীবনটা যতই বিচিত্র তথ্যে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইতে থাকিবে ততই বাঙালীর মাথা পরিষ্কার হইয়া চলিবে; ১৯০৫—১৫—২৫ সনের বীরত্বকে লইয়া আমরা আর মাতামাতি করিতে থাকিব না। আগামী-ভবিষ্যতের জন্য বৃহত্তর বীরত্বের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপে এক একটা বৃহত্তর বীরত্বের স্বপ্ন দেখা আর কর্ম্ম করা হইতেছে যৌবন-পূজার আসল সরঞ্জাম। কালকার বীরগুলাকে আজ ছাড়াইয়া যাইতে যদি পারি আর তাহার জন্য যদি সত্যসত্যই উপযুক্ত হই তাহা হইলেই আমাদের যৌবন-আন্দোলন সার্থক হইবে। আসল কথা তাঁহাদের সুরু-করা

কাজগুলাকে পরিপুষ্ট করা আর সেসবকে তাদের পরের ধাপে হিড় হিড় করিয়া ঠেলিয়া তোলাই ভবিষ্য-পন্থী যুবক বাঙলার জীবন-সাধনা।

বিশ্বশক্তির খতিয়ান

এক কথায় বিশ্বশক্তি-চর্চ্চার একটা খতিয়ান করিয়া যাইতেছি। বিশ্বশক্তির আরাধনা কি চীজ এই মোসোবিদায় খানিকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

অর্থকরী ভূগোলবিদ্যা

ভূগোলবিদ্যাটার সঙ্গে আজকাল আমাদের দেশে শুনিতে পাই "অসহযোগের" লড়াই চলিতেছে তুমুল ভাবে। কিন্তু রাষ্ট্রিক বা আত্মিক উন্নতির নানা মহলে যাঁহারা বাহাল আছেন তাঁহাদের পক্ষে ভূগোল, ভৌগোলিক পর্য্যটন, ভৌগোলিক ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছুই ডালভাতের সমান জরুরি। আসল কথা এই বিদ্যাটা যারপর নাই অর্থকরী। অধিকন্তু আজকালকার দিনে সকল দেশেই বহির্ব্বাণিজ্য সম্পদ্‌বৃদ্ধির একটা বড় উপায়। বাঙালীরাও একালে আর নেহাৎ "ঘরকুনো" কূপমণ্ডুক নয়। এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা সকল মহাদেশের সঙ্গেই বাঙালীর কারবার চলিতেছে। কাজেই "কেজো" লোকেরা আর্থিক আর বাণিজ্যিক ভূগোলটাকে আটপৌরে জীবনের সঙ্গী সমঝিতে বাধ্য। তবে আমাদের মাথা খেলে বড় অলসভাবে, এই যা। কাজেই যে যে দেশের সঙ্গে আমাদের কারবার চলিতেছে আমাদের বেপারীরা না জানে তাহাদের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কথা, না জানে তাহাদের সহর-পল্লীর আর্থিক অবস্থা, না জানে তাহাদের আমদানি-রপ্তানির আইনকানুন। নেহাৎ অন্ধের মতন আমরা দেশ-বিদেশের সঙ্গে লেনদেন চালাইয়া আসিতেছি।

"আর্থিক উন্নতি"র নানা অধ্যায়ে বিশেষতঃ "দুনিয়ার ধনদৌলত"

আর "ব্যক্তি ও সঙ্ঘ" অধ্যায়ে "নমো নমঃ" করিয়া শিল্প-ভূগোল বাণিজ্য-ভূগোল ইত্যাদি ভূগোলের যৎকিঞ্চিৎ ছড়াইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ সমগ্র বাঙালী সমাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যান্য মাসিক পত্রের এই দিকে ঝোঁক দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধন-সাহিত্যের মতন এই বিষয়েও বাঙালী লেখকদিগকে বিদেশীর নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ল্যাটিন-আমেরিকা

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেপারীরা দক্ষিণ আমেরিকার মুল্লুকগুলায় বাণিজ্য পাতাইবার ফিকিরে ঢুঁড়িতেছে। এই সকল দেশে ইংলণ্ডের আর জার্ম্মাণির পসার খুব বেশী। মার্কিণরা বহুকাল ধরিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তাহাদের ঘুম ভাঙিতেছে। ঘুম ভাঙিবামাত্রই সুরু হইয়াছে দক্ষিণ-আমেরিকায় মার্কিণ পর্য্যটন,— দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে মার্কিণ মুল্লুকে লেখাপড়া, অনুসন্ধান-গবেষণা, বক্তৃতা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাদি প্রকাশও চলিতেছে দস্তুর মতন।

আমেরিকায় বসবাস করিবার সময় ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানসেবীদের মহলে এই আন্দোলনের প্রভাব স্পর্শ করিয়া আসিয়াছি। সেই প্রভাবের জের আজকাল বেশ মোটা আকারেই দেখা যাইতেছে। প্রতি মাসে অনেক বই ছাপা হইতেছে। ধনবিজ্ঞান, ব্যাঙ্ক, শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। একখানা বইয়ের নাম করিতেছি। লেখক কুপার। বইটার নাম "ল্যাটিন আমেরিকা,—মেন অ্যাণ্ড মার্কেটস।" প্রকাশক নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের গিন কোম্পানী। আমেরিকা-মহাদেশের যে-যে অঞ্চলে ল্যাটিন-সন্তান স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজ ভাষার চল আছে সেই সকল অঞ্চলকে "ল্যাটিন" বলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর ক্যানাডা ছাড়া আমেরিকার

অন্যান্য অংশ সবই ল্যাটিন.—যথা মেক্সিকো, আর্জ্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি। একমাত্র ব্রেজিল হইতেছে পর্ত্তুগীজভাষী। অন্যত্র চলে স্পেনিশ। বইএর নামেই বুঝা যাইতেছে যে ল্যাটিন আমেরিকার ব্যক্তি ও বাজার এই বৃত্তান্তের কথাবস্তু। মার্কিণ চোখে তথ্যগুলা দেখা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ গলিঘোঁচে মাকিণ বেপারীদের কিরূপ সুযোগ তাহা ঢুঁড়িয়া বাহির করাই গ্রন্থকারের মতলব। ফলতঃ অবশ্য গোটা দেশের কৃষিশিল্পবাণিজ্য, রাস্তাঘাট, যানবাহন, দোকান-হাট, ব্যাঙ্কবীমা সবই আসিয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কথা, রাজস্ব ব্যবস্থা, আমদানি রপ্তানি, শুল্কের আইন ও হার কিছুই বাদ পড়ে নাই।

ল্যাটিন আমেরিকার নরনারী মার্কিণ মাপে অর্থাৎ ইয়োরামেরিকার উচ্চতম সভ্যতার মাপকাঠিতে নেহাৎ নীচু। ইয়োরোপের বল্কান জনপদ, রুশিয়া ইত্যাদির অবস্থা যা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি জনপদের আর্থিক অবস্থাও তাই। এক কথায় ভারতের নরনারীরা ল্যাটিন আমেরিকার নরনারীকে মাসতুত ভাইবোন বিবেচনা করিলে ভুল হইবে না। কাজেই ল্যাটিন আমেরিকার নামে নাক শিঁটকানো ইংরেজ-মার্কিণ-ফরাসী-জার্ম্মাণ পণ্ডিত-ব্যবসায়ী-রাষ্ট্রিকের স্বধর্ম্ম। এই সব "ছোটলোক"গুলার সঙ্গে কারবার করা ঝকমারি,—ইহারা না জানে ব্যাঙ্কের কিম্মৎ না বুঝে সময়ের মূল্য,—এই হইতেছে উচ্চতম মাপকাঠিতে ল্যাটিন আমেরিকার "নৈতিক" অবস্থা। কিন্তু কুপার বলিতেছেন, "এইরূপ নাক শিঁটকাইলে ব্যবসা চলিবে না। লোকগুলা উন্নত হউক অবনত হউক তাহাতে বেপারীদের বেশী কিছু যায় আসে না। তাহাদের সঙ্গে সহৃদয়তার সহিত কথাবার্ত্তা চালানো উচিত। ইয়োরামেরিকার যে জাত সহৃদয়তার সহিত এই সব জাতির সঙ্গে লেনদেন চালাইতে অভ্যস্ত তাহাদের ব্যবসা ফুলিয়া উঠিতেছে। তাহাদের বিচারে

ল্যাটিন আমেরিকার বেপারীরা বিশ্বাসযোগ্য ভদ্রলোকই বটে।" ভাবার্থ, —"অতএব মার্কিণ বেপারী ধাওয়া কর ল্যাটিন আমেরিকার বাজার লুটিতে। জার্ম্মাণ আর ইংরেজকে টিট করা চাই-ই চাই।"

আগামী লড়াইয়ের তোড়জোড়

এইবার আর এক তরফ হইতে বিশ্বশক্তির বিশ্লেষণ করিব। আন্তর্জ্জাতিক গতিবিধি কখন কিরূপ ঘটিতেছে তাহার খতিয়ান করা যুবক বাঙলার বিচক্ষণ স্বদেশসেবকদের পক্ষে কত জরুরি তাহা সহজেই মালুম হইবে। "দুনিয়ার আবহাওয়া' বইয়ে এই দিকে নানা কথা বলিয়াছি। তাহারই পরিশিষ্ট স্বরূপ আজ দুচার কথা বলিব।

হ্বিয়েনা, প্যারিস, রোম, জুরিখ ও বার্লিনের দৈনিক কাগজগুলা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া একসঙ্গে পড়িলে মনে হয় যে,—দুনিয়ায় আর একটা বিপুল লড়াই বাঁধ' বাঁধ'। প্রত্যেক দেশেই পল্টনের সাজগোজ চলিতেছে। ফৌজের শিল্পশিক্ষা ও সমরশিক্ষা সর্ব্বত্রই হু হু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। লড়াইয়ের জাহাজ, উড়ো জাহাজ, তেলের খনি এই সব লইয়া ছোট বড় মাঝারি সকল রাষ্ট্রই তুমুল আন্দোলন চালাইতেছে।

তাহার উপর চলিতেছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নয়া নয়া সমঝোতা। এই সমঝোতা গুলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রোশের কথা খোলাখুলি আলোচিত হইতেছে। কোন্ দেশের বিরুদ্ধে কোন্ দেশের লড়াই বাঁধিবার সম্ভাবনা এই সকল বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতে সাংবাদিকেরা আর ইতস্ততঃ করিতেছে না।

অবশ্য এই সকল হুজুগপূর্ণ খবরের এবং লেখালেখির আসল দাম সম্প্রতি বেশী নয়। একটা মহালড়াই দুচার বৎসরের ভিতর বাঁধিবে

বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে,—দুনিয়ার স্বাধীন জাতীয় লোকেরা মহালড়াইয়ের ক্লান্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। ১৯১৯ ২০-২১ সনে জগতের নরনারী যেন অনেকটা হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিল। লড়াইয়ের কথা মুখে আনিতে অনেকেই রাজি হইত না। কিন্তু এখন বহুলোকেরই হাড়মাস কিছু চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তাজা প্রাণে জ্যান্ত শরীরে সজাগ মনে আজকালকার যুবা ও প্রৌঢ়েরা আগামী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবাসার মগজে এই কথাটা প্রবেশ করা আবশ্যক।

তুর্কী-গ্রীস গণ্ডগোল

বৎসর দু'তিন হইল গ্রীস তুর্কীর নিকট একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এশিয়া মাইনরের লড়াইয়ের ধাক্কা সামলাইয়া উঠা গ্রীসের পক্ষে কখনো সম্ভবপর হইবে কি না ইয়োরোপের রাষ্ট্রবীরেরা এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু ইতি-মধ্যেই দেখিতেছি গ্রীস আবার লড়াইয়ের জন্য তাতিয়া উঠিয়াছে।

গ্রীসের রাজধানীতে এবং মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রনায়কেরা লোক ক্ষেপাইতে লাগিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বত্রই রব উঠিতেছে "সাজ সাজ, তুর্কীকে উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দিবার সুযোগ আসিয়াছে।"

তুর্কী কন্‌ষ্টান্টিনোপল হইতে গ্রীক ক্যাথলিক ধর্ম্মের মোহন্তকে খেদাইয়া দিয়াছে। এই তাহার অপরাধ। মুসলমানদের খলিফা যে চীজ, গ্রীক-দের এই "পাত্রিয়ার্ক" তাই। খৃষ্টিয়ান মোল্লারা গ্রীসের এবং বল্কান অঞ্চলের অশিক্ষিত নিরক্ষর এবং অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইতেছে। সকলেই তাতিয়া উঠিয়াছে। গ্রীক সরকার স্বয়ংই পল্টনের খোরপোষ যোগাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কিন্তু গ্রীসের পক্ষে এক্‌লা তুর্কীর সঙ্গে লড়াইয়ে হাজির হওয়া অসম্ভব। তাই বল্‌কান অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রকে খৃষ্টিয়ান জিহাদের জন্য ডাকা

হইতেছে। কিন্তু জিহাদের ডাকে কয়জন সাড়া দিবে এখনো বলা যায় না।

গ্রীসের চরম দুস্‌মন জুগোশ্লাহ্বিয়া। গ্রীক প্রতিনিধিরা এইদেশের সঙ্গে যেন তেন প্রকারেণ জোড়াতালি দিয়া একটা বন্ধুত্ব পাতাইবার চেষ্টায় আছেন। অন্যান্য দেশের কথা এখনো অনিশ্চিত।

কিন্তু আসল কথা ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড। ফরাসী সরকার এশিয়া মাইনরের কাণ্ডে সর্ব্বদাই ইংরেজের দুসমন অর্থাৎ তুর্কীর দোস্ত্। আর ইংরেজেরা বহুকাল ধরিয়া তুর্কীর দুস্‌মন আর গ্রীসের দোস্ত। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ফরাসীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আর ইংরেজেরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে বেশী কিছু করিতে প্রস্তুত নয়। কেন না জার্ম্মাণ সমস্যাটার মিটমাট এখনো হয় নাই।

বল্কানের নানাস্থানে আরও গণ্ডগোল চলিতেছে। রুমেণিয়াকে ১৯১৯ সনের সন্ধিতে বেসারাবিয়া প্রদেশ দেওয়া হইয়াছিল। রুশিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট এইজন্য রুমেণিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাইতে প্রস্তুত। এই দিকে একটা গণ্ডগোল যে-কোনো সময়েই বাঁধিতে পারে। রোমের রুশপ্রতিনিধি স্পষ্টাস্পষ্টি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন।

বল্‌কান সমস্যা

বুলগেরিয়ার লোকেরা জাতিতে ম্যাসিদোনিয়ান। এই জাতীয় লোক জুগোশ্লাহ্বিয়ায় অনেক আছে। তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য বুল্‌গেরিয়ায় চলিতেছে মস্ত বড় ন্যাশন্যালিষ্ট আন্দোলন। এই সূত্রে বুল্‌গেরিয়ায় জুগোশ্লাহ্বিয়ায় খাওয়া-খাওয়ি চলিতেছে অহরহ। অর্থাৎ তুর্কীর বিরুদ্ধে একটা তথাকথিত "বল্কান ঐক্য" কায়েম হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

তাহা ছাড়া,—গোশ্লাহ্বিয়ার ভিতরেই অনেকগুলা পরস্পরবিরোধী

জাতি বসবাস করে। ইহাদের পরস্পর বনিবনাও নাই। ক্রোআট জাতীয় লোকেরা একটা স্বাধীন গণরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চালাইতেছে। তাহাদের দলপতি শ্রীযুক্ত রাদিচ্ হাঙ্গারি এবং রুশিয়া এই দুই দেশের গুপ্ত সাহায্য আশা করেন।

বল্কান অঞ্চলে চিরকালই এইরূপে চলে "স্যাঁকরার ঠুকুর ঠাকুর।" এসব নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে এই সকল কুচো-কাচা হামেশাই চলিয়া থাকে, অনেক সময়েই উদ্বেগজনক বিবেচিত হয় না। অল্প দিন হইল "কামারের এক ঘা" লাগাইয়া দিয়াছে রুশ-জাপানী সন্ধিটা। বিশ্বশক্তির বেপারীরা নানাপ্রকার জল্পনকল্পনের সুযোগ পাইতেছে।

এশিয়ায় রুশিয়া

এই সন্ধিটাকে আমেরিকার ও ইংল্যাণ্ডের বিরোধী রূপে খবরের কাগজে প্রচারিত করা হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস,—বুঝিবা জাপান ও রুশিয়া ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করিতে প্রস্তুত।

বিষয়টা কিছু জটিল। অত সহজে একটা লড়াইয়ের জন্য "প্রস্তুত" হওয়া সম্ভব নয়। জাপানকে রুশিয়া সাগালিয়েন দ্বীপের তেলের খনিগুলার অধিকার দিয়াছে। এইটাই খাঁটী খবর। ইহাতে জাপানী নৌসেনার পক্ষে অনেক সুবিধা জুটিবে। তাহা ছাড়া ব্লাদিবস্তকের বন্দরটাকে যদি রুশিয়া ও জাপান দুইজনে একত্র হইয়া গড়িয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে কালে বিলাতী সিঙ্গাপুরের জবাব দেওয়া হইতে পারিবে। ব্যস। ইহার বেশী কিছু কল্পনা করা বর্ত্তমানে যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

চীনের সঙ্গে রুশিয়া এবং জাপান বন্ধুত্ব করিতে চাহিতেছেন। এই বন্ধুত্ব কায়েম করা সহজ নয়। ইংরেজের ক্রোর ক্রোর টাকা চীনে

খাটিতেছে। অপর দিকে মাকিন জাতি যুবক চীনকে টাকা সাহায্য করিয়া একপ্রকার কিনিয়া রাখিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে চীনকে ক্ষেপানো অনেক সময়-সাপেক্ষ।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা একত্র হইয়া জাপান ও রুশিয়ার সঙ্গে লড়িতে সুরু করিবামাত্র গোটা ইয়োরোপের মানচিত্র লইয়া টানাটানি পড়িবে। ফ্রান্স যাইবে কোন্‌দিকে? জার্ম্মাণি যাইবে কোন্‌দিকে? ইতালি যাইবে কোন্‌দিকে?

ফরাসীর বিরুদ্ধে ইংরেজ জার্ম্মাণকে টানিয়া লইতে পারে। আবার রুশিয়াও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণিকে টানিয়া লইতে পারে। জার্ম্মাণির শিল্প ও সেনাশক্তি প্রচুর। লড়াইয়ের জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জার্ম্মাণি কোনো দেশের নীচে নয়।

যে শক্তিই জার্ম্মাণির সাহায্য লইতে অগ্রসর হউক না কেন,—তাহাকে জার্ম্মাণির অনেক দাবী হজম করিতে হইবে। এক কোটি জার্ম্মাণ নরনারী আজকাল পোল্যাণ্ডে, চেকোশ্লোহ্বাকিয়ায়, রুমেনিয়ায়, জুগোশ্লাহ্বিয়ায়, ইতালিতে এবং ফ্রান্সে পরপদদলিত গোলাম। তাহাদের স্বাধীনতা জার্ম্মাণির অন্যতম প্রধান দাবী হইবে। অর্থাৎ জার্ম্মাণি এই সকল "বিজেতা" দেশের বিরুদ্ধে লড়িতে লাগিয়া যাইবে। এক কথায় ১৯১৮ সনের সন্ধিগুলা সবই ছিঁড়িয়া ফেলা আবশ্যক হইবে।

জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ইংরেজ অতদূর যাইতে রাজি আছে কি? রাজি নয় এখনো। এই কারণে ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড পুরাণো "আঁতাঁত্‌" বজায় রাখিয়া চলিতেছে। কুরুক্ষেত্র শীঘ্র বাঁধিবার সম্ভাবনা নাই।

জগতের কোথাও একটা মহালড়াই বাঁধিবামাত্র ইয়োরোপে কিরূপ ভজকট সুরু হইবে তাহার একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। অষ্ট্রিয়ায়

জার্ম্মাণির ফকির

চলিতেছে বহুকাল ধরিয়া অর্থাৎ ১৯১৯ সনের পর হইতে—"বৃহত্তর জার্ম্মাণি"র আন্দোলন। বহুসংখ্যক অষ্ট্রিয়ান জননায়ক অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণির সঙ্গে জুড়িয়া দিতে চাহেন।

অষ্ট্রিয়ার শিল্প-আইন, বাণিজ্যবিষয়ক আইন, শুল্কবিধি,—সবই জার্ম্মাণ নিয়মে আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত করা হইতেছে। যদি কখনো জার্ম্মাণির সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার পূরাপূরি সংযোগ সাধিত হয় তাহা হইলে অষ্ট্রিয়ার নরনারী আইনতঃ নতুন কিছু ঘটিল বলিয়া বিস্মিত হইবে না।

কিন্তু এইরূপ বৃহত্তর জার্ম্মাণির তেজ সহ্য করিবে কে? না ফ্রান্স, না ইংল্যাণ্ড না বল্কান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলা, না ইতালি। কেহই এই জার্ম্মাণ শক্তি হজম করিতে পারিবে না। কাজেই সকলেরই সমবেত স্বার্থ হইতেছে অষ্ট্রিয়ায় জার্ম্মাণিতে সংযোগে বাধা দেওয়া।

অথচ যেই জার্ম্মাণি কোনো মহালড়াইয়ের কোনো পক্ষে দাঁড়াইবে তৎক্ষণাৎ জার্ম্মাণ শক্তি ইয়োরোপে লঙ্কাকাণ্ড করিয়া ছাড়িবে।

ইতালি সেই ভয়ে জড়সড়। দক্ষিণ টিরোলের জার্ম্মাণ নরনারীকে গোলাম করিয়া রাখিয়া ইতালি জার্ম্মাণির ভয়ে ঘুমাইতে পারে না। ইতালি যদি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যায় তাহা হইলে জার্ম্মাণিকে ইংল্যাণ্ড স্বপক্ষে পাইবে না।

এদিকে ভূমধ্যসাগরের রাষ্ট্রনীতি যেরূপ বিচিত্র তাহাতে ইতালি ইংল্যাণ্ডের স্বপক্ষে থাকিবারই সম্ভাবনা। কেননা আফ্রিকার উত্তরকূলে তুনিস লইয়া ফ্রান্সে ইতালিতে খাওয়া-খাওয়ি খুব বেশী। তুনিস ফরাসী উপনিবেশ বটে। কিন্তু এই উপনিবেশে শ্বেতাঙ্গ নরনারীর ভিতর ইতালিয়ানরাই ফরাসীদের চেয়ে গুণ্‌তিতে বেশী। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহা সত্ত্বেও গোটা উপনিবেশে "ফরাসী-করণ" নীতি চালাইতেছে।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইতালি এবং ইংল্যাণ্ড দলবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু

সেই দলে জার্ম্মাণি আসিবামাত্র পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোহ্বাকিয়া ইত্যাদি দেশগুলা গুঁড়া হইয়া যাইবে। সেই সূত্রে ইতালির উত্তর সীমানা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। কাজেই ইংরেজদলের স্বপক্ষে জার্ম্মাণির যোগ দেওয়া এখনো সম্ভবপর নয়। ইংরেজকে অনেক ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

জার্ম্মাণি দুনিয়ার গতিবিধি দেখিয়া মস্ত "দাঁ" মারিবার ফিকিরে টুঁড়িতেছে। দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডল এখনো লড়াইয়ের জন্য পাকিয়া উঠে নাই। তবে ঠিক কখন পাকিয়া উঠ' উঠ' হইল তাহা বুঝিতে পারিবে একমাত্র বিশ্বশক্তির সমঝদারেরা। সেই বিশ্বশক্তির গবেষণা যুবক বাঙলায় সুরু হউক বিস্তৃত, গভীর ও নিয়মবদ্ধরূপে।

"বল্কান-চক্র" ও যুবক বাঙ্গলা

ইয়োরামেরিকান অর্থাৎ পাশ্চাত্য নরনারীর জীবনযাত্রা ও সভ্যতাকে যুবক বাঙলার মুঠার ভিতর রাখিয়া কাজে নামিতে হইবে। ইহাই হইল আগাগোড়া আমার সমাজ-দর্শন। ইহাই আমার বিচারে দেশোন্নতি আর আর্থিক উন্নতির রাষ্ট্রনীতি। কিন্তু পাশ্চাত্য বলিলে কোনো একটা দেশ বা ঐক্যগ্রথিত সামঞ্জস্যশীল জনসমাজ বুঝিতে হইবে না। ইয়োরামেরিকার দেশগুলার ভিতর বামুন শূদ্দুর ফারাক আছে বিস্তর। এই ফারাকগুলা ভারতবর্ষে একপ্রকার আলোচিতই হয় না। পশ্চিমারাও যখন ভারতে অথবা এশিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার মহিমা কীর্ত্তন করে, তখন তাহারা তাহাদের মহাদেশের ভিতরকার উঁচুনীচু স্তরগুলা, ছোট বড় মাঝারি জাতগুলা ইত্যাদি পার্থক্য সম্বন্ধে টুঁ শব্দ করে না। ইয়োরোপের পঁয়তাল্লিশ কোটি নরনারী সকলেই যেন সমান শিক্ষিত সমান শিল্পদক্ষ, সমান কর্ম্মদক্ষ, সমান সভ্য ইত্যাদি ধারণা সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া থাকে। এই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে আমি অনেক দিন ধরিয়া দেশ-বিদেশে আলোচনা

চালাইয়া আসিতেছি। নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তনে যাঁহারা মোতায়েন হইতেছেন তাঁহাদের মগজ হইতে এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কারটা ঝাড়িয়া ফেলা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি, আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই তিন দেশ বর্ত্তমান জগতের সেরা। এই তিন দেশেরই জুড়িদার—বহরে ছোট থাকা সত্ত্বেও—অষ্ট্রিয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ড। এই গোত্রের ভিতরই ফ্রান্সকেও ফেলিতে পারি। কিন্তু যন্ত্রনিষ্ঠা, শিল্পদক্ষতা ইত্যাদি একালের ধনদৌলত বিষয়ক মাপ কাঠিতে ফ্রান্স খানিকটা খাটো। জিজ্ঞাস্য,—ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলার অবস্থা কিরূপ? আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলার ভিতর আধুনিকতা, বর্ত্তমান-জগৎসুলভ কর্ম্মপ্রবণতা, একেলে সভ্যতা কতখানি প্রবেশ করিয়াছে? পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা বাদ দিলে যে কয়টা দেশ থাকে তাহারা সমগ্র ইয়োরোপের কতটুকু অংশ? বস্তুতঃ এক-তৃতীয় অংশের বেশী নয়। অর্থাৎ ইয়োরোপের দুই-তৃতীয় অংশ বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে বেশ কিছু অবনত। এমন কি ইতালিও যারপরনাই খাটো। অথচ ইতালি রাষ্ট্রিক বিচারে প্রথম শ্রেণীর শক্তি। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, শিল্পনিষ্ঠা, সভ্যতা ইত্যাদির বিচারে প্রথম শ্রেণীর দেশ না হইয়াও ইতালি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। রুশিয়ার দৃষ্টান্ত সেই কথাই বলিতেছে। এই সকল বিষয়ে রুশিয়া ইতালির চেয়েও অবনত।

তাহা ছাড়া বল্কান জনপদের দিকে তাকাইলে বেশ বুঝিতে পারি যে, ইয়োরামেরিকান বা পাশ্চাত্য সভ্যতা ইত্যাদি নামে কোন ঐক্যশীল ধরণ-ধারণ নাই। কোথায় লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস আর কোথায় সোফিয়া, বুখারেষ্ট, বেলগ্রেড ইত্যাদি। ভারতবর্ষে আমরা যেরূপ আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় আজ রহিয়াছি "বল্কান-চক্রের"র সকল জনপদই প্রায় সেই

অবস্থায় রহিয়াছে। অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে আমাদেরই মতন অবনত থাকিয়াও বল্কান অঞ্চলের নরনারী রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। এই কথাটা বিশেষভাবে তলাইয়া মজাইয়া বুঝা আবশ্যক।

জার্ম্মাণরা, ইংরেজরা, ইয়াঙ্কিরা, নানা বিষয়ে বাঙালীর চেয়ে উন্নত সন্দেহ নাই। কোনো কোনো বিষয়ে তাহারা আমাদের চেয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পর্য্যন্ত এগিয়ে আছে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া বুলগেরিয়া, রুমেণিয়া, জুগোশ্লাভিয়া আর গ্রীস, তুর্কী, হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ আমাদের চেয়ে উন্নত অথবা কাল হিসাবে অগ্রগামী এইরূপ সমঝিয়া রাখিলে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মাত্র। ইয়োরামেরিকার এই ভেদগুলা সম্বন্ধে সজাগ না থাকিলে আমরা পদে পদে অতিমাত্রায় নৈরাশ্য আর কর্ম্মপঙ্গুত্ব দেখিতে থাকিব মাত্র। এই জন্য অনেক দিন হইতেই আমি যুবক বাঙ্গলার পক্ষে বল্কান-চক্রে নাক গুঁজিয়া বল্কান-দক্ষ হইবার পরামর্শ দিয়া আসিতেছি। বল্কান-সমস্যায় যে সকল বাঙ্গালী ওস্তাদ হইবেন তাহারা নয়া বাঙ্গলার পাকা ঘরামী হইতে পারিবেন। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জার্ম্মাণ-মার্কিণ-ইংরেজ বুখনি না আওড়াইয়া বল্কানের পল্লীশহর, বল্কানের কুটির-শিল্প, বল্কানের অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারীর ধরণ-ধারণ আর তাহাদের সমাজে প্রচলিত দেশোন্নতির কর্ম্মকৌশল ইত্যাদি আলোচনা করিতে শিখিলেই আমরা বাঙ্গলা দেশের জন্য করিৎ-কর্ম্মা ও বিচক্ষণ স্বাধীনতাসেবক হইতে পারিব।

মগজ মেরামতের হাতিয়ার

বাঙলা দেশের অভাব অনেক। যুবক বাঙলার কর্ত্তব্য ও অনেক। কোনো দুচারটার সঙ্গে অসহযোগ ঘটাইয়া অপর পাঁচ সাতটার সঙ্গে দরহম

মহরম চালানো আমার মেজাজ-মাফিক কাজ নয়। বাঙ্‌লার যৌবন শক্তির এক এক আনা, দেড় দেড় আনা, দুদু আনা অংশ এক একটা কাজে লাগিয়া থাকিলেই বহুবিধ প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন এক সঙ্গে চলিতে পারিবে।

আজকার আখড়ায় আমি প্রধানতঃ চিন্তাক্ষেত্রের কথাই বলিয়া চলিতেছি। মাথা পরিষ্কার করিবার কথাই আমার আসল কথা। যৌবন-শক্তির যুক্তি-শাস্ত্রটা আলোচনা করাই বর্ত্তমানে আমার মতলব। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন করিবার জন্য একটা তর্ক-বিজ্ঞান আবশ্যক। সেই যুক্তি-যোগের প্রতিনিধিস্বরূপ নানা প্রকার কর্ম্মকৌশল, চিন্তাপ্রণালী আর মাথাওয়ালা এবং কর্ম্মদক্ষ লোকও আবশ্যক। কাজেই আজকার সভায় আমার মুখে আপনারা বাঙালী মস্তিষ্ককে মেরামত করিবার কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধেই বেশী শুনিতে পাইতেছেন। এই জন্য কয়েকটা নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্রের কথা আপনাদের কানে গিয়া পৌঁছিতেছে।

দেশোন্নতি-পরিষৎ

বাঙালী মগজের একটা দারিদ্র্যের কথা আমি বার বার ভাবিতেছি। স্বদেশ-সেবক, রাষ্ট্র-সেবক, সমাজ-সেবক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বাঙলা দেশে গড়িয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া ভুঁইফোড় ভাবে স্বদেশ-সেবক রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছি। সমাজ-সেবার কায়দা ও কর্ম্মপ্রণালী রপ্ত করিবার জন্য কোনো আখড়া বাঙ্‌লাদেশে আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রেল, জাহাজ, বিজলী, গ্যাস, স্বাস্থ্য, পাট, তিশি, চিনি, নগর, পল্লী, খাজনা, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, বীমা, শাসন-ব্যবস্থা, নির্ব্বাচন-প্রণালী ইত্যাদি সমাজ-জীবনের কোনো দফা সম্বন্ধেই

আমরা যথার্থ বিজ্ঞান দক্ষ, তথ্য-দক্ষ, অঙ্ক-দক্ষ বাঙালী তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করি নাই। সেই দিকে নজর ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

"দেশোন্নতি"-পরিষৎ নামে একটা পরিষৎ কায়েম করা দরকার। তাহার কাজকর্ম্ম কিছু বলিয়া যাইতেছি।

উদ্দেশ্য—(১) উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীকে "দেশোন্নতি" বিষয়ক বিদ্যা সমূহের চর্চ্চায় সাহায্য করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেশোন্নতি-বিদ্যা বলিলে ব্যাপক ভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। সমাজ-বিকাশ, আর্থিক ব্যবস্থা, শাসন-প্রণালী, জন্ম-মৃত্যু-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞানবিজ্ঞান আছে সবই দেশোন্নতি বিদ্যার অন্তর্গত।

(২) বাংলার প্রত্যেক জেলা হইতে দুইজন করিয়া এম,এ,এম, এসসি, এম এ, বি,এল ইত্যাদি দরের লোককে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাদিগকে এই দেশোন্নতি-বিদ্যার গবেষণায় পাকাইয়া তোলা পরিষদের লক্ষ্য। প্রত্যেককে অন্ততঃ দুইবৎসর ধরিয়া গবেষণায় বাহাল থাকিতে হইবে। দুই বৎসরের শেষে গবেষকগণ নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইবেন। তাঁহারা কেহ বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন, কেহ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবেন, কেহবা উকীল হইবেন, কেহবা অধ্যাপক হইতে পারেন, ইত্যাদি।

কর্ম্ম-প্রণালী (১) পরিষৎ কলিকাতার কর্ম্মকেন্দ্রে কোনো বিদ্যা-পীঠ বা অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিবেন না। জন পঞ্চাশেক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যাহাতে নিজ নিজ খেয়াল মাফিক দেশোন্নতি-বিদ্যার নানা বিভাগে মাথা খেলাইতে পারেন তাহার জন্য মুসাবিদা করিয়া দেওয়া মাত্র পরি-ষদের কর্ত্তব্য থাকিবে।

(২) প্রত্যেক দেশোন্নতি-গবেষক রোজ পাঁচ সাত ঘণ্টা গ্রন্থাগারে বসিয়া লেখাপড়া করিতে বাধ্য থাকিবেন। দরকার মত তাঁহাদিগকে

সহর ও মফঃস্বলের কারখানা, হাঁসপাতাল, ব্যাঙ্ক, মজুরসঙ্ঘ, পল্লী, কৃষিক্ষেত্র, লোকহিত-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র দেখিয়া চাক্ষুষ ও বাস্তব জ্ঞান বাড়াইবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৩) পরিষদের উদ্দেশ্য অনুসারে দেশোন্নতি-গবেষকেরা কাজ করিতে পারিতেছেন কি না তাহা তদ্‌বির করিবার জন্য দুই তিন জন পরিচালক থাকিবেন।

(৪) গবেষকদিগকে অভাব মাফিক ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক হইবে। মাসে ২,৫০০ অর্থাৎ বৎসরে ৩০,০০০ টাকা এই গবেষণা-বৃত্তির জন্য লাগিতে পারে।

লাখখানেক টাকার ডাক—(১) দুই বৎসরে ৬০,০০০ টাকার বরাদ্দ।

(২) পরিচালনার খরচ দুই বৎসরে ১৫।২০ হাজার টাকা লাগিতে পারে।

(৩) মোটের উপর এক লাখ টাকার হাঁক ছাড়িয়া কাজটা সুরু করা সঙ্গত হইবে।

কোনো বিষয়ে সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা আজ আমার মতলব নয়। যুবক বাঙলার গলিঘোঁচে লোহালক্কড়, গ্যাস-সোডা, আর যন্ত্রপাতির আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার দিকে সকলের নজর টানিয়া আনাই প্রধান লক্ষ্য। দেশোন্নতি-পরিষৎ কায়েম হইলে বাঙ্গালী সমাজে নানা কর্ম্ম ও চিন্তা রাশির সঙ্গে যন্ত্রনিষ্ঠার আন্দোলনও সহজেই দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবে।

লোহালক্কড়ের শালসা

কয়লা, লোহা, ইস্পাত, মাঙ্গানিজ ইত্যাদি ধাতব বস্তুর আকরিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও আর্থিক তথ্য সাধারণতঃ বাঙ্গালীর পেটে পড়ে

না। কিন্তু এই সব তথ্য কিছু কিছু করিয়া হজম করিতে থাকিলে আমাদের রক্ত পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ আর কার্য্যাংশ দুইয়ের জন্যই এই সমুদয় ধাতব তথ্য যার পর নাই আবশ্যক। আমার বিবেচনায় যন্ত্রপাতি আর লোহালক্কড়ের শালসাই বর্ত্তমানে বাঙালীর আসল দাওয়াই।

ভারতবর্ষে ধাতব কারবার বাড়িতেছে মন্দ নয়। ১৯২৫ সনে ভারতগবর্মেণ্টের দপ্তর হইতে ৮৫৯টা "কন্‌সেশ্যন"-মঞ্জুর জারি করা হইয়াছে। ১৯২৪ সনে সরকারী মঞ্জুরের সংখ্যা ছিল ৭৬৯। ১৯২৫ সনে ৭৩৭ জন দরখাস্তকারী খনি-বহুল জনপদ "প্রস্‌পেক্‌ট" (বা পরখ) করিবার "লাইসেন্স" (অধিকার বা অনুমতি) পাইয়াছে। ১১১ জন খনিতে খোদাই কাজ সুরু করিবার "লীজ" (স্বত্ব) লাভ করিয়াছে।

আড়াই লাখের উপর ভারতীয় নরনারী নানা খনিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মেহনৎ করিয়া অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। ১৯২৪ সনে এই সংখ্যা ছিল ২৫৮,২১৭। ১৯৩০ সনে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৬১,৬৬৭। এই সংখ্যার ভিতর ১২০,৩৩৩ জন আন্তর্ভৌম কাজ করে। ৭১,৫৮২ জন খোলা হাওয়ায় আর ৬৯,৭৫২ জন খনির উপরে এবং আশে পাশে নিযুক্ত। খনিতে মেয়ে মজুরদের সংখ্যাও কম নয়। ৫৬,৯১৩ জন নারী এই আড়াই লাখের অন্তর্গত। তবে মেয়ে মজুদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। ১৯২৯ সনে ছিল ৭০,৬৫৬।

১৯২৫ সনে ভারতে যত কয়লা উঠিয়াছিল তাহার দাম ১২,৬৪,০০,৯০৮ টাকা। ১৯২৪ সনে আরও বেশী ছিল (১৪,৯৬,৫৩,৪১৯)। ১৯২৫ সনে ১৯২৪ সন অপেক্ষা ২৭০,০০০ টন কম কয়লা উঠিয়াছিল। ১৯৩০ সনে কয়লা উঠিয়াছিল ২২,৬৮৩,৮৬১ টন।

ফেব্রুয়ারি মাসে ২০ লাখ টনের চেয়েও বেশী কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু বর্ষাকালের মাসিক গড় ছিল প্রায় ১৫ লাখ টনের কাছাকাছি। মোটের উপর ২০,০১৮,৫২৫ টন কয়লা খনি হইতে নানা স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল। খনিতেই নানা কাজে খরচ হইয়াছিল ১,৩৩৫,৪৫৫ টন। যত কয়লা উঠে তাহার শত করা ৫,৮৯ অংশ খাদেরই নানা কাজে খরচ হয়।

১৯২৪ সনে ৯৯টা কয়লার খাদে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইত। ১৯২৫ সনে তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে ১৮০, ১৯৩০ সনে ১১৯। অশ্ব-শক্তি ৪৩.৫০২ হইতে ৭৬.৪৬০ এ আসিয়া পৌছিয়াছে। কয়লা কাটিবার যন্ত্র-সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১১৪টা, ১৯২৫ সনে ১২৫টা আর ১৯৩০ সনে ২০২টা যন্ত্র দেখা গিয়াছে। এইগুলার ভিতর ১৯১টা চলে বিদ্যুতের জোরে, আর ১১টার জন্য চাপা হাওয়ার শক্তি ব্যবহার করা হয়।

১৯২৫ সনে ২১৬,৩৭০ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৪ সনের তুলনায় এই পরিমাণ ১০,০০০ টন বেশী। কয়লা রপ্তানি হইয়াছিল লঙ্কায়।

অপর দিকে ভারতে কয়লার আমদানিও হয় বিস্তর। ১৯২৪ সনে আমদানি হইয়াছিল ৪৬৩,৭১৬ টন। ১৯২৫ সনে আমদানির পরিমাণ ছিল ১৯,৪০০ টন বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সব চেয়ে বেশী আসিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা আর গ্রেট বৃটেন এই দুই দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই ভারতের প্রচুর পরিমাণে কয়লা যোগাইয়া থাকে।

১৯২৪ সনে জনপ্রতি কয়লা উঠিয়াছিল ১০৩.৭ টন। ১৯২৫ সনে খাদে লোক খাটিয়াছিল কম। ফলে দেখা যায় যে, কুলী প্রতি ১১০,৫ টন কয়লা উঠিয়াছে। এই হিসাবে চরম বৎসর ছিল ১৯১৯ সন। সেই

বৎসর জন প্রতি ১১১,০৫ টন উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩০ সনে সংখ্যা ছিল ১৩৪ টন।

১৯২৫ সনে খাদে দৈব-ঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা ২০২। এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। কেন না ১৯১৯-২৩ এই পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা দৈব-মৃত্যুর হার ২৭৪। কিন্তু ১৯৩০ সনে এই সংখ্যা ছিল ২১৭।

সাধারণ মৃত্যু-সংখ্যায় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৩ সনে ফী হাজার মজুরে মরিয়াছিল ১,৮২। ১৯৩০ সনে ১,২৫ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ভারতের তিন কেন্দ্রে "আয়রণ ওর" অর্থাৎ ধাতব লোহা বা কাঁচা লোহা খনি হইতে তোলা হয়। ১৯২৫ সনে ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৫৫ টন "ওর" উঠিয়াছিল। তাহার ভিতর টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল হ্বার্কস্ তুলিয়াছিল ৯৫৭,২৭৫ টন। ২২৭,৭২২ টন উঠে ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর তাঁবে। অবশিষ্ট ২৪৬,৮৫৮ টন তোলে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী।

ধাতব লোহাকে কারখানায় পোড়াইয়া "শোধন" করিলে তিনি "পিগ্ আয়রণ" রূপে পরিচিত হন। সাধারণতঃ লোহা বলিলে এই "পিগ" বা পাকা লোহাই বুঝা হয়। অবশ্য ষ্টীল বা ইস্পাত পিগ্ হইতেও স্বতন্ত্র। পিগ্‌কে ষ্টীল অবতারে পরিণত করিতে হইলে অনেক "কাঠখড়" খরচ হয়। কারখানায় আর এক প্রকার পাকা লোহা তৈয়ারী হয়, তাহার নাম "ফেরো মাঙ্গানিজ।" নামেই প্রকাশ—এই বস্তুর ভিতর মাঙ্গানিজ মাথা গুঁজিয়া থাকে।

১৯২৫ সনে এই তিন ধরণের পাকা লোহা ভারতের কোথায় কত উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা দেখানো হইতেছে :—

	পিগ্	ষ্টীল	ফেরো-মাঙ্গান
টাটা	৫৬৩,১৬০ টন	৩০৯,৯৩৮ টন	৬,৫২৭ টন
ইণ্ডিয়ান	২৪৭,৫০০ টন		
বেঙ্গল	৫২,৬৭৪ টন	২৯,৩২৭ টন	
মাইসোর	১৬,৭৪১ টন		
	৮৮০,০৭৫ টন	৩৩৯,২৬৫ টন	৬,৫২৭ টন

ভারতের পিগ লোহা বিদেশে যায় বিস্তর। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি এবং চীন এই তিন দেশ আমাদের খরিদ্দার। ৩৮১,৯৮৯ টন বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে (১৯২৫)।

এই খানে লোহার মাপে ভারতবর্ষকে জরীপ করিয়া দেখা মন্দ নয়। ৮ লাখ ৮০ হাজার টন পিগ্ যে দেশের দৌড়, তাহার সঙ্গে ইয়োরোপের আন্তর্জ্জাতিক লৌহ-সঙ্ঘের তুলনা করা যাউক. এই সঙ্ঘে আছে পাঁচ জনপদ—(১) বেলজিয়াম, (২) সার (৩) লুক্সেমবুর্গ, (৪) ফ্রান্স, (৫ জার্ম্মাণি। সঙ্ঘের যে সমঝৌতা কায়েম হইয়াছে তাহার বিধানে বেলজিয়াম একা ২৯৫,০০০ টন পাকা লোহা ফী বৎসর তৈয়ারী করিতে অধিকারী। জার্ম্মাণি তৈয়ারী করিবে বার্ষিক ৯ কোটি ২৫ লাখ টন। আর গোটা সঙ্ঘের সমবেত বার্ষিক উৎপাদন হইবে ২ কোটি ৭৫ লাখ টন। অর্থাৎ সঙ্ঘের ৩০ ভাগের এক ভাগ লোহা সমগ্র ভারত তৈয়ারী করিতেছে।

১৯২৮ সনে ইস্পাতের দুনিয়া ছিল নিম্নরূপ (মোট উৎপন্ন ১০৯, ৪০০,০০০ টন)

(ক)

দেশ	উৎপন্ন
১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৫২,৩৭১,০০০ টন

২।	জার্ম্মাণি		১৪,৫১৭,০০০	টন
৩।	ফ্রান্স		৯,৪৮৩,০০০	”
৪।	গ্রেট বৃটেন		৮,৯৮৭,০০০	”

(খ)

১।	রুশিয়া	..	.	৪,১৫৮,০০০	”
২।	বেলজিয়াম	...	...	৩,৯৫৬,০০০	”
৩।	লুক্‌সেম্বুর্গ	...	...	২,৫৬৭,০০০	”
৪।	ইতালি	...	...	২,০৯৮,০০০	”
৫।	সার	...	...	২,০৭৩,০০০	”
৬।	চেকোশ্লোভাকিয়া	...	...	১,৭০০,০০০	”
৭।	পোল্যাণ্ড	...	...	১,৪৩৯,০০০	”
৮।	জাপান	...	...	১,৪০০,০০০	”
৯।	কানাডা	...	...	১,২৬০,০০০	”

(গ)

১।	স্পেন	...	...	৭৩৪,০০০	”
২।	অষ্ট্রীয়া	...	...	৬৩৬,০০০	”
৩।	সুইডেন	...	...	৬১১,০০০	”
৪।	ভারত	...	...	৬০০ ০০০	”
৫।	হাঙ্গারি	...	...	৪৮৬ ০০০	”
৬।	অষ্ট্রেলিয়া	..	..	৪৫৫,০০০	”

১৯২৪ সনে ইস্পাত-সংরক্ষণ আইন জারি হইয়াছিল। সেই আইনের মেয়াদ ছিল ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত। এপ্রিল মাস হইতে আগামী সাত বৎসরের জন্য একটা নূতন আইন কায়েম হইতে চলিল।

তাহার বিধানে "বিদেশী" ইস্পাতের উপর আমদানি-শুল্ক এখনকার মতনই জারি থাকিবে।

কিন্তু "বিদেশী"কে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে,—(১) বিলাতী, (২) অন্যান্য বিদেশী,—যথা মার্কিণ, ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি। ১৯২৭ সনের আইনে বিলাতী ইস্পাতের উপর যে হারে শুল্ক বসানো হয় "অন্যান্য বিদেশী"র উপর তাহার চেয়ে বেশী হারে চাপানো হইয়া থাকে।

দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় বাজারে "অন্যান্য বিদেশী"র আক্রমণ হইতে বিলাতীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। অন্যান্য বিদেশী ইস্পাতের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে টক্কর চালাইয়া বিলাতী ইস্পাত ভারতের বাজারে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, কাজেই প্রস্তাবিত আইনটাকে একমাত্র ভারতীয় ইস্পাত-শিল্পের সংরক্ষক বলা চলিবে না। বিলাতী ইস্পাত-শিল্পের সংরক্ষণই এই আইনের একটা বড় উদ্দেশ্য।

পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ-শুল্কের ফলে ভারতবাসী চড়া মূল্যে বিদেশী ইস্পাত কিনিতে বাধ্য হয়। তাহাতে বিলাতের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের লাভ আছে যথেষ্ট, কিন্তু ভারতীয় নরনারীর লাভ আধ কাঁচ্চাও নাই। বরং আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি বড় বড় দেশের শত্রুতা অর্জ্জন করা হইতেছে মাত্র। তাহাতে রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক দুই প্রকার ক্ষতিই ভারতের কপালে জুটিতে পারে।

যুবক বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্র,—দুনিয়া

"আধুনিক ভারত"-সঙ্ঘের প্রধান কাজ হইতেছে বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করা। "আন্তর্জ্জাতিক ভারত"-সমিতির প্রধান কাজ পত্রিকা চালানো। আর "দেশোন্নতি"-পরিষদের বিশেষত্ব হইবে গবেষণা, অনুসন্ধান আর

বিদ্যার মাত্রা-বৃদ্ধি। যুবক বাংলার যার যে দিকে মর্জ্জি বা সুযোগ সে সেই দিকে মগজ খেলাইতে পারে। সকলকেই কোনো একদিকে ঢলিয়া পড়িতে বলিতেছি না। যৌবন-পূজার নতুন নতুন সরঞ্জাম নানা ঘাঁটিতে মজুত হইতে থাকিলে বাঙ্গালী মগজ এক অভিনব শক্তির পরিচয় দিতে থাকিবে।

বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"কোন্ কাজটা করি?" কাজের পথ বাত্‌লাইয়া দিবার অনুরোধ বোধ হয় আপনাদের নিকটও অনেক আসে। আবার অনেকের নিকট আপনারা হয়ত নিজেই কাজের তালিকা চাহিয়া থাকিবেন। এই সকল বিষয়ে আমার চিন্তা-প্রণালী অতি সোজা।

আমার বক্তব্য এই,—"ভাই যা পার, তাই কর।" খদ্দর চালাইবার সুযোগ থাকে, তাই সই। নৈশ পাঠশালা কায়েম করিতে পার? বেশ ত ভালই। হাসপাতালের জন্য টাকা তুলিবার ক্ষমতা আছে? তাই কি ফেলিয়া দেওয়ার জিনিষ? লাইব্রেরি-আন্দোলনে মাথা খেলিতেছে? যাও লেগে তাতেই! বই লিখিতে মন যায়? লিখে যাও! কাগজ চালাইতে ইচ্ছা কর, ভাল কথা। হকি-ফুটবলের আখড়া কায়েম করিতে চাও? তারও দরকার আছে। নমঃশূদ্রদের উঠাতে যাও। মন্দ কি? তারপর ব্যাঙ্ক, বীমা, ফ্যাক্টরী, আমদানীরপ্তানী,—এসবের দামও ঢের। আর শেষ পর্য্যন্ত গলাবাজি ত আছেই। গলা খাটাইয়া যদি দশ বিশ পঞ্চাশ জনের মতিগতি সমবায়-আন্দোলনের দিকে অথবা কুস্তি-কস্‌রতের দিকে কিম্বা আর কোনো দিকে ফিরাইতে পার তার কিম্মৎও লাখ টাকা। পল্লী-ব্রতী হইতে চাও, ভাল। সহরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে মতলব আঁটিতেছ,—তাহা ও ভাল। ফ্যক্টরী চালাইতে পার ত বলিব 'বাপকা বেটা।' আর যদি কুটির-শিল্পের বেশী এঞ্জিনিয়ারিংয়ের দৌড় না যায়

তাহা হইলেও বলিব "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, কুছপরোআ নাই লেগে থাক তাতেই।"

গরুর গাড়ি পাশ করিয়া আমার কুটির-শিল্প পরখ করিয়া দেখা আছে। আর ম্যালেরিয়া পাশ করিয়া পল্লীসেবা করা কি চিজ তাও আমার হাড়মাস বেশ ভাল রকমই জানে। অপর দিকে দেশ-বিদেশে বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার কাজে নিজকে মোতায়েন রাখিতে কসুর করি নাই। এশিয়ার ইজ্জৎ ইয়োরামেরিকায় আর ইয়োরামেরিকার ইজ্জৎ এশিয়ায় ছড়াইতেও,—ক্ষমতার দৌড় আর বিদ্যার দৌড় যত দূর যায়—প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। সর্ব্বত্রই আমি যুবক বাঙলার সেবক।

বঙ্গীয় যুবক-আন্দোলনের ভাবুক ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিগণকে খোলাখুলি তাই বন্ধুভাবে ডাকিয়া বলিতেছি,—

ভাই,—

পল্লী নয়গো গুড়মাখানো, আস্তাকুড় নয় সহর গুলা,
রাজধানী নয় সোণায় তৈরী, মফঃস্বল নয় পায়ের ধূলা।
সব বামুন নয় বিট্‌কেল আর সব মুচি নয় বীর,
সব গেরস্ত ভীরু নয়রে—সব সাধু নয় ধীর।
শক্তি-স্রোত বহে বিচিত্র শত পথে শত মুখে—
কভু দেখি তারে গ্রামে পল্লীতে কভু সহরের বুকে।
ভাসায়ে দেয় সে শত ক্ষেত আর শত ফসলের আঁটি,
চুপ করে কভু এক বাঁকে বসে' থাকেনা সে পরিপাটি।
'ফর্ম্মূলা' ধরে' চলেনা জীবন মাপজোক-কাটা পথে,
(শুধু) গ্রন্থসূত্র আওড়ায়ে কভু চলেনাগো কোন মতে।
তাই বাজিয়ে দেখি নরনারী সব কেরদানি কত কার,—
দ্বিজ-চণ্ডালে পল্লী-সহরে নাইক' কারণ তফাৎ করা'র।

বিদ্যার মাত্রা-বৃদ্ধি। যুবক বাংলার যার যে দিকে মর্জ্জি বা সুযোগ সে সেই দিকে মগজ খেলাইতে পারে। সকলকেই কোনো একদিকে ঢলিয়া পড়িতে বলিতেছি না। যৌবন-পূজার নতুন নতুন সরঞ্জাম নানা ঘাঁটিতে মজুত হইতে থাকিলে বাঙ্গালী মগজ এক অভিনব শক্তির পরিচয় দিতে থাকিবে।

বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"কোন্ কাজটা করি?" কাজের পথ বাত্লাইয়া দিবার অনুরোধ বোধ হয় আপনাদের নিকটও অনেক আসে। আবার অনেকের নিকট আপনারা হয়ত নিজেই কাজের তালিকা চাহিয়া থাকিবেন। এই সকল বিষয়ে আমার চিন্তা-প্রণালী অতি সোজা।

আমার বক্তব্য এই,—"ভাই যা পার, তাই কর।" খদ্দর চালাইবার সুযোগ থাকে, তাই সই। নৈশ পাঠশালা কায়েম করিতে পার? বেশ ত ভালই। হাসপাতালের জন্য টাকা তুলিবার ক্ষমতা আছে? তাই কি ফেলিয়া দেওয়ার জিনিষ? লাইব্রেরি-আন্দোলনে মাথা খেলিতেছে? যাও লেগে তাতেই! বই লিখিতে মন যায়? লিখে যাও! কাগজ চালাইতে ইচ্ছা কর, ভাল কথা। হকি-ফুটবলের আখড়া কায়েম করিতে চাও? তারও দরকার আছে। নমঃশূদ্রদের উঠাতে যাও। মন্দ কি? তারপর ব্যাঙ্ক, বীমা, ফ্যাক্টরী, আমদানীরপ্তানী,—এসবের দামও ঢের। আর শেষ পর্য্যন্ত গলাবাজি ত আছেই। গলা খাটাইয়া যদি দশ বিশ পঞ্চাশ জনের মতিগতি সমবায়-আন্দোলনের দিকে অথবা কুস্তি-কস্রতের দিকে কিম্বা আর কোনো দিকে ফিরাইতে পার তার কিম্মৎও লাখ টাকা। পল্লী-ব্রতী হইতে চাও, ভাল। সহরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে মতলব আঁটিতেছ,—তাহা ও ভাল। ফ্যাক্টরী চালাইতে পার ত বলিব 'বাপকা বেটা।' আর যদি কুটির-শিল্পের বেশী এঞ্জিনিয়ারিংয়ের দৌড় না যায়

বর্ত্তমান সভায়ও আপনারা যতটা স্বাধীন আমিও ততটা স্বাধীন। বিশেষতঃ, সভাপতির আসন হইতে যাহা কিছু বলা কওয়া হয়, তাহার সঙ্গে আসল রেজলিউশ্যান বা প্রস্তাবাদির কোনো যোগাযোগ না থাকাই বোধ হয় স্বাভাবিক। সভাপতির পেশা কেবল দেখাশুনা তদ্‌বির করা মাত্র। অতএব আমার কথাগুলা আপনাদের কাণে ভাল না শুনাইলেও আপনাদের কোনো লোকসান নাই।

বাঙালী জাতি কতদিনে স্বরাজলাভ করিবে সেই বিষয়টা এখানে আমার আলোচ্য বস্তু নয়। ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের চেয়ে ইয়োরামেরিকার নরনারীরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে বাস্তবিক পক্ষে নিকৃষ্ট কিনা সেই বিষয়ে তর্ক জুড়িয়া দিতে এই ক্ষেত্রে চেষ্টা করিব না। দেশোন্নতির জন্য এক্ সঙ্গে কত দিকে কাজ করা বা আন্দোলন চালানো কর্ত্তব্য তাহার বিশ্লেষণেও আজ সময় কাটাইতে চাই না।

ভারতীয় শিক্ষা-মণ্ডলের প্রাইমারি, সেকেণ্ডারি আর কলেজিয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ আর তাহার সংস্কার-সাধনের জন্য কিরূপ কৌশল আবশ্যক তাহা আজকার আলোচনার অন্তর্গত নয়। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষাবিভাগের সম্বন্ধ আর শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে সরকারী এবং বে সরকারী ম্যাট্রিকুলেশন ও অন্যান্য পাঠশালার সম্বন্ধ কোন্ লক্ষ্য মাফিক নিয়ন্ত্রিত করা উচিত তাহার কথা তুলিতেও সম্প্রতি ইচ্ছা করি না।

ষাট হাজার নরনারীর সুখদুঃখ

আজ আমি একমাত্র নয়া বাংলার ইস্কুল মাষ্টারদের কথা বলিব। বাংলাদেশের শ'নয়েক ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠশালার জন্য হাজার দশ বারো শিক্ষক মোতায়েন আছেন। বাঙালী জাতের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত ভদ্র

সমাজে এই দশ বার হাজার লোক ও তাঁহাদের পরিবার একটা নগণ্য চিজ নয়। প্রত্যেক পরিবারে পাঁচজন করিয়া গুণিলেও কমসে কম পঞ্চাশ যাট হাজার নরনারীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, স্মৃতি-স্বপ্ন এই আলোচনার অন্তর্গত। এতগুলা মানুষের কথা একটা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।

ইস্কুলমাষ্টারদের দল বাংলা দেশের এক বিপুল দল। এই দল যথার্থ রূপে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া উঠিলে বাঙালী সমাজে এক নবীন শক্তিযোগ দেখা দিবে। এই দলের আর্থিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় যাঁহারা ব্রতী রহিয়াছেন তাঁহারা একটা বড়-কিছু করিতেছেন। এই বিপুল আন্দোলনের কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যুবক বাংলা যাহা কিছু সুরু করিয়াছে আজ আমি তাহারই অন্যতম সেবক হিসাবে আপনাদের নিকট হাজির হইয়াছি। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে"—এই আমার মন্তর। কাজেই সন্তোষজনক কিছু করিতে না পারিলেও আমার দুঃখ নাই। আপনারাও আমার নিকট অতি-কিছু আশা করিবেন না।

আমরা ইস্কুলমাষ্টার; ছেলে পিটানো আমাদের পেশা। আমা-দিগকে গরু বিবেচনা করা হইতেছে দেশের লোকের রেওয়াজ। আজকাল কিন্তু গরুর সেবা করিবার জন্য সর্ব্বত্র খেয়াল দেখা যাইতেছে। গোপালন, গবাদির উন্নতি ইত্যাদি কথা যেখানে সেখানে শুনা যায়। অথচ মাষ্টারগুলার উন্নতি বা জীবন-বৃদ্ধির চর্চ্চা বেশী হয় না। গরুর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারদের সেবা করিবার আন্দোলনও বাংলাদেশে প্রবল হইতেছে না কেন

যাহা হউক, মাষ্টারেরা নিজেই নিজের উন্নতি-সাধনের পথে কর্ম্ম সুরু করিয়াছেন। বাঙালীর জীবনবত্তার এ এক নতুন লক্ষণ। বিশ বৎসর

পূর্ব্বে, ১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহে "জাতীয় শিক্ষার' এক খুঁটা গাড়িবার উপলক্ষে "বঙ্গে নব-যুগের নূতন শিক্ষা" নামক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। শিক্ষা-ব্যবসায় আর শিক্ষা-সাহিত্যে সেই আমার হাতে খড়ি। বস্তুতঃ তাহাকেই জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম অ্যাপ্রেন্টিসি বিবেচনা করিয়া থাকি।

সেই আন্দোলনের যুগে যখন "শিক্ষাবিজ্ঞান", "ভাষাশিক্ষা', "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা", "বিনা ব্যাকরণে সংস্কৃত শিক্ষা", "শিক্ষা-সমালোচনা" "শিক্ষা-সোপান", "ষ্টেপস্ টু এ ইউনিভারসিটি". "ইণ্ট্রোডাকশ্যন টু দি সায়েন্স অব এডুকেশন", "শিক্ষানুশাসন" ইত্যাদি সাহিত্য রচনা করিতেছিলাম, তখন দেশের ভিতর শিক্ষা-সংসারে কোনোরূপ সাড়া একপ্রকার পাওয়া যাইত না।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অধ্যাপক, ইস্কুল-পাঠশালার মাষ্টার, সকলেই কিছু কিছু সজাগ, কর্ম্মতৎপর ও উৎসাহশীল। দেশটা বড় হইয়াছে। এই দেশবৃদ্ধির কারবারে রামা, শ্যামা, আবদুল, ইসমাইল, সকলেরই কিছু কিছু দান করিবার আছে। যে-কোনো লোকই কারবারটাকে এক ধাপ, আধ ধাপ, সিকি ধাপ এগিয়ে দিতে সমর্থ। সেই সাহসেই আমিও আপনাদের দলে দাড়াইতে ঝুঁকিয়াছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের কথা আজ আলোচনা করিতেছি না। শিশুজীবন, ছাত্রজীবন ইত্যাদি বিষয়ক ভালমন্দ বর্ত্তমান বিশ্লেষণের বহির্ভূত। আমি একমাত্র ইস্কুল-মাষ্টারদের জীবন-বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা আর কর্ম্মদক্ষতা-পুষ্টির কথাই বলিব। এই দশ বার হাজার বাঙালীর দলকে বাংলার এক শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত করিবার কৌশলই আমার একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কোন্ কোন্ কাজ করিলে, কোন্ কোন্ চিন্তামণ্ডলের আওতায় আসিলে,

কোন্ কোন্ কর্ত্তব্য-তালিকা চোখের সম্মুখে রাখিলে, বাংলার ইস্কুল-মাষ্টারেরা বাঙালী জাতির অন্যতম কর্ম্মক্ষম অঙ্গরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই সকল বিষয়ের কোনো কোনো দিকে, স্বদেশবাসীর দৃষ্টি টানিয়া আনাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো কোনো কথা হয়ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকশ্রেণী সম্বন্ধেও থাকিবে।

বাংলার অন্যান্য লোকজনের মতন ইস্কুলমাষ্টারদের অভাবও অনেক। কাজেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যও বহুবিধ। কিন্তু সকল কথা বলিতে বসিলে একটা বিশ্বকোষ রচনা করা হইয়া পড়িবে। সম্প্রতি মতলব আমার সঙ্কীর্ণ। ইস্কুলমাষ্টারদের মুখ্য ব্যবসা লেখাপড়া করা, আর লেখাপড়া করানো। কাজেই প্রধানতঃ বিদ্যাচর্চ্চার তরফ হইতে ইস্কুলমাষ্টারদের কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইবার উপায় আলোচনা করিতে চাই। এই লাইনে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি? এই লাইনে তাঁহাদের উন্নতি সাধিত হইতে পারে কোন্ কোন্ পথে? সেই সকল কর্ত্তব্য আর পথের আলোচনাই আজ আমার প্রধান কথা। এই কথার ভিতরই ষাট হাজার নরনারীর সুখদুঃখের অনেক কথা জড়ানো আছে।

ইস্কুলমাষ্টারের বিদ্যাবৃদ্ধি

আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতির কথা বলিলে সাধারণতঃ একমাত্র ছেলে পিটাইয়া মানুষ করিবার কথাই ভাবিয়া থাকি। গুরুমশাই, ইস্কুলমাষ্টার বা কলেজের অধ্যাপকগুলাও যে ছাত্রই বটে আর তাহাদের জন্যও যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার তাহা একপ্রকার মনে আসেই না। কিন্তু এই দিক্কার গুরুত্বসম্বন্ধে দেশের লোকের পক্ষে উদাসীন থাকা আর উচিত নয়।

ইস্কুলমাষ্টারদের উচ্চশিক্ষা কথাটা কি? প্রথমেই মনে পড়িবে, "পেড়া-

গজিক্‌স্‌” বা শিক্ষাবিজ্ঞান চর্চ্চা করা, এল্‌-টি,বি-টি, ইত্যাদিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া, কলিকাতার ডেভিড্‌ হেয়ার ট্রেণিং কলেজে এক আধ বৎসর কাটাইয়া আসা ইত্যাদি। দুনিয়ার কয়েকজন নামজাদা শিক্ষাবীরের জীবনবৃত্তান্ত এই পেডাগজিক্‌সের অন্তর্গত বিবেচিত হইবে। সেকালের গ্রীক-হিন্দু শিক্ষাপদ্ধতি আর একালের জার্ম্মাণ-ইংরেজ-মার্কিণ-ফরাসী-জাপানী পদ্ধতি ইত্যাদি রকমারি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়াও এই এল্‌-টি, বি-টি, ট্রেণিংয়ের মধ্যেই পড়ে। অধিকন্তু ভাষাশিক্ষায়, বিজ্ঞানশিক্ষায়, ইতিহাসশিক্ষায় নয়া নয়া উপদেশ-প্রণালী রপ্ত করা ইত্যাদি কাজও শিক্ষাবিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটির কয়েক দফা।

শিক্ষাক্ষেত্রে যুবক ইয়োরোপ

পেডাগজিক্‌স্‌ বিদ্যার ক্ষেত্রে আজকাল ইয়োরামেরিকার আসরে আসরে বিভিন্ন ঢংয়ের পরীক্ষা বা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চলিতেছে। ড্যালটন-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকৌশলে ছাত্রদের কতখানি হাতপার কাজ চলে আর তাহাদের জীবনে কতখানি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয় তাহা বোধ হয় নয়া বাংলার ইস্কুলমাষ্টার মহলে অজানা-চিজ নয়। লণ্ডনের চেল্‌সী পল্লীতে কুমারী জেসী ম্যাকিণ্ডার মার্লবরো স্কুল নামে যে বিদ্যাপীঠ চালাইতেছেন তাহাকে ড্যাল্‌টন প্ল্যানের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিবেচনা করা চলে। বাঙালী সমাজে হয়ত তাহার নাম করিবার প্রয়োজন নাই।

সুইডেন দেশের শ্লয়েড-আন্দোলন আজ ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্রই শিশুদিগকে হাতের কাজে পোক্ত করিয়া তুলিতেছে। ইতালিয়ান মন্তেসরি-প্রণালীর মতন সুইডিশ শ্লয়েড-প্রণালীও বোধ হয় আমাদের “ট্রেণিং”য়ের আবহাওয়ায় বংলাদেশে সুপরিচিতই হইয়া রহিয়াছে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের চর্চ্চায় বাঙালী শিক্ষকেরা অগ্রসর হইতে থাকিলে

জেনেহ্বার সুইস পণ্ডিত ক্লাপারেদ প্রতিষ্ঠিত আঁস্তিতি-উ-জাঁ-জাক্-রুসো নামক শিক্ষাবিজ্ঞান-কলেজের কথা জানিতে পারিবেন। আর একজন সুইস পণ্ডিত জেনেহ্বার "লেয়্যার মুহ্বেল" (বা নবযুগ) নামে একখানা পত্রিকা চালাইতেছেন। শিক্ষাতত্ত্বের আখড়ায় যত কিছু নতুন নতুন তর্কপ্রশ্ন, কর্ম্মপ্রণালী, আদর্শ, ভাবুকতা কায়েম হইতেছে সবই এই কাগজে নিয়মিতরূপে প্রচারিত হয়। সম্পাদকের নাম আদল্‌ফ্ ফেরিয়্যার। তিনি "লেকল আকৃতিভ্" (অর্থাৎ কর্ম্মপ্রাণ বিদ্যাপীঠ) নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান ইয়োরোপের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রচেষ্টা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিলে শিক্ষাবিজ্ঞানের বাঙালী সেবকেরা তাজা দুনিয়ার শিক্ষা-যৌবন কিছু কিছু চাখিতে পারিবেন।

ইয়োরামেরিকা সজীবভাবে মানবসন্তানকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। পাশ্চাত্য নরনারীর যৌবনশক্তি দুনিয়াকে পুনর্গঠিত করিয়া ছাড়িবে। এই পুনর্গঠন কাণ্ডে তাহাদের এক মস্ত হাতিয়ার হইতেছে নয়া নয়া ছাঁচের পাঠশালা। তাহারা শিক্ষার আন্দোলনে পূরা মাত্রায় "আকৃতিফ্" সজাগ, কর্ম্মঠ। তাহাদিগকে "আলেকম সেলাম" বলিবার সুযোগ পাইলে অথবা কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিতে পারিলে বাঙালীর জীবনস্রোত বাড়িয়া যাইবে,—বাংলার জীবনবেদে নবীন বয়েৎ আত্মপ্রকাশ করিবে।

ফ্রান্সের একজন ইস্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কুজিনে ১৫০টা পাঠশালার তদ্‌বির করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কতকগুলা ইস্কুলে নতুন নতুন শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা চলিতেছে। তিনি নিজেও একটা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি ছাত্রদিগকে দল বাঁধিয়া লেখাপড়ার চর্চ্চায় মোতায়েন রাখিবার পক্ষপাতী। এই দলবদ্ধ ছাত্রদের বিদ্যা-স্বরাজ সম্বন্ধে বেল-

জিয়ামের দেক্রোলি অন্যতম পথপ্রদর্শক। দেক্রোলির শিক্ষা-প্রণালী ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে পরীক্ষিত হইতেছে।

চেকোশ্লোহ্বাকিয়ার স্রানক নগরে মাতৃপিতৃহীন অনাথ শিশুদের জন্য একটা পাঠশালা আছে। এখানে ছাত্রেরা নিজ নিজ খেয়াল মাফিক ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গড়ে, কাঠের বস্তু প্রস্তুত করে। মাষ্টারের মতামত বা সঙ্কেত তাহাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে না। এইরূপ স্বাধীনতা সাধারণতঃ কোনো বিদ্যাপীঠে দেখা যায় না। প্রাগ্ নগরের অধ্যাপক বাকুলে একটা পাঠশালা চালাইতেছেন। তাহাতে হাতের কাজই অন্যান্য সকল শিক্ষার ভিত্তি। ইস্কুলটা বিকলাঙ্গদের জন্য গঠিত। ছাত্রেরা লেখাপড়া শেষ করিয়াই এক একটা স্বাধীন জীবিকার পথে চলিতে পারে।

শিশু-জীবনের স্বাধীন প্রচেষ্টা আজ-কালকার ইয়োরামেরিকায় অতি উল্লেখযোগ্য শক্তি। মার্কিণ দার্শনিক জন ডুয়ীর আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী ভারতে সুবিদিত। জার্ম্মাণির হাম্বুর্গ নগরে পাউলসেন যে প্রতিষ্ঠান সুরু করিয়াছেন তাহা এই তরফের চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। বার্লিনেও কতকগুলা স্বাধীনতার শিক্ষালয় কায়েম হইয়াছে। এই সকল পাঠশালায় ছয় বৎসরের শিশুরা ভর্ত্তি হয়। প্রথমে একজন শিক্ষয়িত্রী মোতায়েন থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা নিজেই নিজ নিজ মাষ্টার বাছিয়া লইতে অধিকারী। ক্লাসের ধাপ, ওঠা-নামা ইত্যাদির বাঁধাবাঁধি একদম নাই। আট বৎসর কাটাইয়া ছাত্রেরা বয়সোপযোগী প্রায় সব কিছুই দখল করিতে পারিবে বলিয়া পাউলসেনের বিশ্বাস। এই সকল বিদ্যাপীঠে শিশুরা যথার্থ জীবন-স্বরাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

জার্ম্মাণ দেশ ইস্কুল-কলেজের জঙ্গল বিশেষ। এই মুল্লুকে অসংখ্য রকমের বিদ্যাপীঠ চলিতেছে। তাহার ভিতর কোনোটায় সরকারী সাহায্য বিস্তর, কোনোটায় আগাগোড়া সবই বে-সরকারী। কোথাও মামুলি

শিক্ষাপ্রণালাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল দেখাইবার চেষ্টা দেখিতে পাই। কোথাও বা একদম অজানা নতুন পথে মানবজীবন চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আবার কোথাও বা মামুলি ইস্কুলেরই কোনো কোনো শ্রেণীতে নূতন প্রণালীর "ফার্জু‌খ্" অর্থাৎ এক্‌সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক সহরে, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যকর জনপদে পাঠশালাগুলাকেই ঘরবাড়ী বিবেচনা করিয়া একসঙ্গে লেখাপড়া আর মানুষ হওয়ার ব্যবস্থা দুইই চালানো চলিতেছে। এই গুলা "আৎসিহুংস্-হাইম" বা শিক্ষা-পরিবার নামে পরিচিত।

ব্যাম্বেরিয়ার শিক্ষা-দার্শনিক কের্শেনষ্টাইনার মিউনিক নগরে মজুর নরনারীর জন্য যে সকল বিদ্যাপীঠ কায়েম করিয়াছেন সেই সবকে জগতের আদর্শ-স্থানীয় বিবেচনা করি। বার্লিনের অধ্যাপক স্প্রাঙ্গার শিক্ষা-দর্শনের আলোচনায় কর্ম্ম-কাণ্ডের যে তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, তাহাও এক নবযুগেরই পথ-প্রদর্শক। কের্শেনষ্টাইনারের কোনো কোনো রচনা ইংরেজিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্প্রাঙ্গার বোধ হয় ইংরেজী সাহিত্যে অপরিচিত।

বিদ্যাচতুষ্টয়

কিন্তু ইস্কুলমাষ্টারদের বিদ্যাবৃদ্ধি বলিলে আমি একমাত্র "পেডাগজিক্‌স্" চর্চ্চা বুঝি এরূপ নয়। আরও অন্যান্য হাজার দিকে ইস্কুলমাষ্টারদের মগজ খেলাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। বিদ্যার জগৎ হু হু করিয়া বাড়িতেছে, লম্বায়, চৌড়ায়, গভীরতায়, উচ্চতায়, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে। এই জগৎ বৃদ্ধির সঙ্গে ইস্কুলমাষ্টারদের এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও যোগাযোগ কায়েম না হইলে বাঙালী মাথার ঘী বেশী দিন তাজা থাকিবে না, বাঙালী সমাজ পচিয়া যাইতে থাকিবে।

প্রথমেই আমি বলিব অ্যান্থ্রপলজি বা নৃতত্ত্ব বিদ্যার কথা। বিগত পচিশ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের ভিতর মানবজাতির জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অসংখ্য নতুন আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক মুল্লুকেই ঠিক যেন একটা করিয়া ক্রাট, একটা করিয়া বগজকৈ. একটা করিয়া তুৎ-আঙ্খ্‌আমন, একটা করিয়া মহেঞ্জোদড়ো দেখা দিয়াছে, এইরূপ বলিতে পারি। অপর দিকে কোথায় মার্কিণ মুল্লুকের ইরোকোআ, কোথায় আফ্রিকার বুশম্যান, কোথায় দক্ষিণ চীনের লোলো, কোথায় জাপানের আইনু, কোথায় পলিনেশিয়া দ্বীপ-পুঞ্জের মাওরি, কোথায় ভারতের টোডা, কোথায় ইয়োরোপের বাস্ক্‌ —অসংখ্য "বুনো" "পাহাড়ী" জাতির পারিবারিক গড়ন, সম্পত্তি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রকর্ম্ম, ধর্ম্মের তুকতুক্, আর শিল্প-চর্চ্চা সবই মানবসমাজের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার ফলে সভ্যতা, অসভ্যতা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে দুনিয়ার পণ্ডিতেরা আজকাল তিনবার পাঁচবার পচিশবার ভাবিয়া দেখিতেছেন। মানবজীবনের সু-কু, সুনীতি-কুনীতি ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব বিদ্যা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়াছে। এই বিপ্লবের আবহাওয়ায় প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীকে চলাফেরা করিতে হইবে। তাহার জন্য ব্যবস্থা চাই।

(১) নৃতত্ত্ব

বিভিন্ন জাতির বিচিত্র অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানবাত্মার বহুমুখ ঐক্যবিশিষ্ট বিকাশ দেখিয়া নৃ-তত্ত্বের সেবকেরা অনেক বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতে শিখিয়াছেন। ভারতেও সেই উদারতার পুষ্টি আজ বিশেষ জরুরি। কেননা আমাদের পল্লীতে পল্লীতে কিছুকাল ধরিয়া পরজাতি-বিদ্বেষ, পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ, পরব্যবসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি সঙ্কীর্ণতা প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। কথায় কথায় মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান, নমঃশূদ্রের বিরুদ্ধে তথাকথিত উচ্চ জাত, বড় জাতের বিরুদ্ধে

তথা-কথিত ইতর জাত ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। যেখানে যোনি-গত, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রিক, আর্থিক বা অন্য কোনো বিরোধ আসল কথা,—সেখানে জোর জবরদস্তি করিয়া আমরা ধর্ম্মকলহ বা জাতিকলহ চাগাইয়া তুলিতে শিখিয়াছি। মানুষের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রবৃত্তিগুলার ইজ্জৎ স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করা আমাদের জন-নায়কের খেয়াল দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় নৃতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ফলে বাঙালার মতিগতি সুপথে চলিতে সুরু করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

"আর্থিক উন্নতি" পত্রিকায় "আন্তের গম্ভারা" নামক বাঙালা সমাজের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত বর্ত্তমান বাঙ্লার নানা জেলার বিভিন্ন জাতের সাংসারিক ওঠানামার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন। চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমান, মালদহ ইত্যাদি জেলায় বামুন কায়েৎ বৈদ্য জাত নামিতেছে। অপর-দিকে তথাকথিত ছোট জাত আর্থিক হিসাবে উঠিতেছে। এমন কি "অ-বাঙালী" সাঁওতালরাই অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্য-বাংলার চাষা-মিস্ত্রী কারিগররূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। নৃ-তত্ত্ব বিদ্যার আলোচনা সুরু করিলে বাঙালা সমাজের এই ওলটপালট দেখিয়া স্বদেশ-সেবকগণ নতুন নতুন কর্ত্তব্য ঠাওরাইতে পারিবেন।

তাহা ছাড়া প্রাচীন ভারতের জাতি-সংমিশ্রণ, রক্ত-সংমিশ্রণ, রীতি-নীতি-সংমিশ্রণ ইত্যাদি তথ্যও যুবক বাঙলার কব্জার ভিতর আসিয়া পড়িবে। তাহার ফলে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আর ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের হাড়মাস সম্বন্ধে আজকালকার বুজরুকিপূর্ণ অলীকতাময় কুসংস্কারগুলি একে একে নষ্ট হইতে থাকিবে। আমাদের বেদ-জাতক-পুরাণ-তন্ত্রের কাহিনী সমূহের ব্যাখ্যায় নব-যুগের নবনূর পড়িতে পারিবে। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামক গ্রন্থে নৃ-তত্ত্বের এইরূপ ব্যবহারিক প্রভাব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

তারপর চিত্ত-বিজ্ঞান বা সাইকলজির কথা। এই ক্ষেত্রেও বিপ্লব আসিয়াছে। আগেকার দিনে চিত্ত বলিলে লোকেরা বুঝিত একমাত্র মানবচিত্তের কথা। কিন্তু নৃ-তত্ত্ব যেমন মানব-জাতিকে লম্বায়, চওড়ায়, কাল হিসাবে এবং দেশ ও জাত হিসাবে বাড়াইয়া দিয়াছে, চিত্তবিজ্ঞানও সেইরূপ আজকাল চিত্তের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিয়াছে। জানোয়ারের চিত্ত এক্ষণে সুপরিচিত বস্তু। নরনারীর স্মৃতি, সংস্কার, মনোযোগ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার মতন প্রক্রিয়া পশুজীবনেও দেখা যায়। পশুচিত্তের বিশ্লেষণ করিতে করিতে পণ্ডিতেরা এক্ষণে চিত্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। জানোয়ার-সমাজের হিংসা, দ্বেষ, স্নেহ, প্রেম, অপরাধই মানব-সমাজের হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদির গোড়া। এইরূপে চেতনা, চিত্ত, মন-বস্তুর পারম্পর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশুচিত্তের মতন শিশু-চিত্ত, পাগল-চিত্ত, দল-চিত্ত, সমাজ-চিত্ত ইত্যাদি নানাবিধ চিত্তের আবিষ্কার বিগত দুই তিন দশকের কীর্ত্তি।

(২) চিত্ত-বিজ্ঞান

অপর দিকে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ বলিলে ছোঁড়া বুড়া, মেয়ে পুরুষ, রোগী সুস্থ, মজুর মালিক ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষের একটা খিঁচুড়ী বুঝা যাইত। আজকাল মানুষ বলিলে বয়স হিসাবে চিত্ত ও "চরিত্র" বিশ্লেষণ করা হয়। স্বাস্থ্য হিসাবে, ব্যবসা হিসাবে, আয় হিসাবে মানুষে মানুষে তফাৎ করা হয়। ছোঁড়ার চিত্তে আর জোআনের চিত্তে, আবার জোআনের চিত্তে আর প্রৌঢ়ের চিত্তে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই সব "বিহেভিয়ার", "চরিত্র" বা জীবনের "সাড়া" বিশ্লেষণ করিবার দিকে বিজ্ঞান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ফলতঃ অদ্বৈতবাদের মতন এক কথায় মানব-চিত্ত, মানবাত্মা ইত্যাদি চিজ আর স্বীকার করা চলে না। সর্ব্বত্রই বহুত্ব ও অনৈক্যের জয়জয়কার চলিতেছে। তাহার ফলেও

তথাকথিত জাতীয় ঐক্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, নীতির ঐক্য, ধর্ম্মের ঐক্য ইত্যাদি বস্তু চরম সন্দেহের চোখে দেখা হইতেছে। নয়া বাংলার ইস্কুলমাষ্টারদিগকে এই সকল সন্দেহের আর সংশয়বাদের ল্যাবরেটরীতে মাঝে মাঝে সময় কাটাইবার সুযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

এইবার আর্থিক ইতিহাসের স্তরগুলা সম্বন্ধে ইস্কুলমাষ্টারদের জ্ঞান বাড়াইবার কথা বলিতে চাই। বহুদিন ধরিয়া ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে একটা বিপুল পার্থক্য সম্বন্ধে মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এশিয়াকে আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে সাংসারিক কর্ম্মদক্ষতার পক্ষে একদম অনুপযুক্ত বিবেচনা করা এই প্রভেদ-বিজ্ঞানের বা পার্থক্য-সৃষ্টি-দর্শনের গোড়ার কথা। কিন্তু মানবজাতির আর্থিক জীবনের প্রাগৈতিহাসিক, আদিম, প্রাচীন, আর নবীন ও আধুনিক যুগগুলা বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করিলে পূর্ব্বে-পশ্চিমে, খৃষ্টিয়ানে-হিন্দুতে, এশিয়ায়-ইয়োরামেরিকায় মজ্জাগত পার্থক্য মালুম হয় না। মালুম হয় মজ্জাগত ঐক্য, আত্মিক সাদৃশ্য ও জীবনসাম্য। "পরিণাম-ক্রমের" এই সাম্যটা যেই বাঙালী মহলে সুপরিচিত হইয়া যাইবে তখনই আমরা বর্ত্তমান ভারতের জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠাওরাইতে গিয়া অকূলপাথারে হাবুডুবু খাইব না।

(৩) আর্থিক ইতিহাস।

বাঙালী বুঝিতে পারিবে যে, বিগত একশ' দেড়শ' বৎসর ধরিয়া যন্ত্রপাতির প্রভাবে ইয়োরামেরিকা যে ধরণের আর্থিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, এশিয়াও তাহারই প্রভাবে ঠিক সেই ধরণের আর্থিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিতেছে। আর ভবিষ্যতেও ইয়োরামেরিকার গতিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গেই এশিয়ার গতিভঙ্গীও চলিতে থাকিবে। দুনিয়ায় যে যে জাত যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণে ও আবিষ্কারে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বহু সংখ্যক নং ১ শ্রেণীর নরনারী সৃষ্টি করিতে পারিবে তাহারাই হইবে ভবিষ্য

দুনিয়ার নেতা আর অন্যান্য জাতি এই সকল নেতার পেছনে পেছনে অগ্রসর হইতে বাধ্য।

(৪) আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বৃত্তান্ত

চতুর্থতঃ আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আর যন্ত্রপাতি-উদ্ভাবনের ইতিহাস নয়া বাংলার ইস্কুলমাষ্টার মহলে সুপরিচিত হওয়া আবশ্যক। মধুচ্ছন্দার আগুন-আবিষ্কার বা আগুন-প্রয়োগের আমল হইতে আজকার প্যাস্তায়র-আইনষ্টাইন-এডিসন পর্যান্ত যুগের পর যুগ দেখিতেছি—নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়া আর নতুন নতুন উদ্ভাবনেরই ধারা। এই ধারাই মানবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পেট-চিন্তার দর্শন পর্যান্ত সবই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বিশেষতঃ বিগত বিশপচিশ বৎসরের ভিতর মেক্যানিক্যাল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল, রাসায়নিক, জীবতাত্ত্বিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক আবিষ্কার এত সাধিত হইয়াছে যে, কেবল মাত্র বিজ্ঞান আর কৃষিশিল্প মহলে নয়, গোটা সংসারের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে, মায় চরম দর্শনের আসরেও গভীর বিপ্লব মাথা তুলিয়াছে। এই নবীনতম আবিষ্কার সমূহের সম্পাদন সম্বন্ধে সজাগ না থাকিলে বাঙালার কর্ম্মে ও চিন্তায় নবীন জীবনবত্তা আসিবে না।

নৃ-তত্ত্ব, চিত্ত-বিজ্ঞান, আর্থিক ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বৃত্তান্ত এই বিদ্যা-চতুষ্টয়কে আমি বর্ত্তমান জগতের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ সমঝিতে অভ্যস্ত। নয়া বাংলার অধ্যাপক মহলে, গবেষক মহলে, ঐতিহাসিক মহলে, ইস্কুলমাষ্টার মহলে এই বিদ্যা-চতুষ্টয় যত দিন পর্য্যন্ত সুপ্রচারিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দেশোন্নতির পথে বিপুল বাধা থাকিবে এইরূপ আমার বিশ্বাস। কোন্ অধ্যাপকের বা কোন্ মাষ্টারের বিদ্যা কোন্ বিজ্ঞানের অন্তর্গত,—কে অঙ্কের পণ্ডিত, কে ভূগোলের পণ্ডিত, কে ইতিহাস পড়ান, কে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান পড়ান, বিদ্যা-চতুষ্টয়ের প্রচার সম্বন্ধে এই সব শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ বা বিদ্যাভেদ ইত্যাদি ভেদকে ফুলাইয়া

তুলিতে আমি প্রস্তুত নই। যে কোনো অধ্যাপক বা মাষ্টারের পক্ষেই এই বিদ্যাচতুষ্টয়ের কিছু কিছু দখল করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য। আর তাহার জন্য বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এইরূপ বুঝিয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছি।

জার্ম্মাণ মাপে যুবক বাঙ্গলা

ইস্কুলমাষ্টারদের বিদ্যা বাড়াইবার উপায় সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আলোচনা করা গেল। এইবার জনগণের ভিতর শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে ইস্কুলমাষ্টারদের কর্ত্তব্য বিষয়ে দুচার কথা বলিব। বিদ্যার বিস্তার বিষয়ে লোকমত গঠন করা তাহাদের অন্যতম ধান্ধা হওয়া উচিত। এই বিষয়ে অবশ্য নানা মুনির নানামত থাকা স্বাভাবিক। আমি নিজের মত বলিয়া যাইতেছি।

বর্ত্তমান ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-উৎকর্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার প্রথম স্বীকার্য্য কথা অতি গুরুতর রকমের। আজকালকার উন্নত সভ্য দেশগুলার মাপকাঠিতে আমরা সভ্য বা উৎকর্ষশীল জাতি বলিয়া দাবী করিতে অনধিকারী। এইরূপ আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

লেখাপড়ার তরফ হইতে বস্তুনিষ্ঠভাবে একটা দৃষ্টান্ত দিব। জার্ম্মাণিতে আজকাল প্রায় ছয়কোটি নরনারীর জন্য ২৩টা বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৬ সনের গ্রীষ্ম ঋতুতে ৬১,৯৩৫ পুরুষ আর ৮,৩৮১ নারী উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাহা হইলে সংখ্যাটা মোটের উপর দাঁড়ায় ৭০,৩৮৫।

"ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" বিদ্যাটা নিছক সংখ্যার বিদ্যা নয়। একমাত্র নাক গুণিলেই যথার্থ লোকসংখ্যা বাহির হয় না। কাজেই বর্ত্তমান সংখ্যাটা কিছু তলাইয়া বুঝা দরকার। জার্ম্মাণিতে বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে কি বুঝা যায়? টেক্‌নিক্যাল্ কলেজ, কৃষি কলেজ, বন-কলেজ,—এই তিন প্রকার

কলেজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। এই সমুদয়ের সব-কিছুই ২৩টা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত।

অপর দিকে জিজ্ঞাস্য, কিরূপ ছাত্রছাত্রী,—অর্থাৎ কয়টা পাশের পর পুরুষ-নারীরা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অধিকারী? ১৪ বৎসর বয়সে বাধ্যতামূলক পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া যাহারা "গিমনাজিয়ুম" অথবা "রেয়াল-শুলে" ও "লিৎসেয়ুম" নামক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায় একমাত্র তাহারাই কয়েক বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিতে হয় সাধারণতঃ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে। এই পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে সকল সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিদ্যার চর্চ্চা করে তাহার ওজন আমাদের ভারতীয় বি-এ. বি-এস্-সির সমান অথবা প্রায় কাছাকাছি। আমাদের ইণ্টার-মীডিয়েট জার্ম্মাণ গিমনাজিয়ুম্-রেয়ালশুলে-লিৎসেয়ুমের কিছু নীচে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের ইণ্টারমীডিয়েট আর বি, এ, বি-এস্‌সি, ক্লাসগুলাকে জার্ম্মাণ ঢংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত বিবেচনা করা উচিত। একমাত্র পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসগুলাকে অর্থাৎ এম্. এ, এম্-এস্‌সি, পরীক্ষার জন্য যে সকল ছাত্র তৈয়ারী হইতেছে, তাহাদিগকে বাহ্যতঃ জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমান বিবেচনা করা সম্ভব। এই সমতাটা কিন্তু সামাজিক বা ব্যবহারিক হিসাবে বুঝিতে হইবে, যথার্থ গুণ হিসাবে বুঝা চলিবে না।

কেননা জার্ম্মাণ গিমনাজিয়ুম্-রেয়ালশুলে-লিৎসেয়ুমের শিক্ষকেরা যে দরের বিদ্বান্ আমাদের ইস্কুল-কলেজের মাষ্টারের অনেকেই সেই দরের লোক নন। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে আসিয়া জার্ম্মাণ ছাত্রছাত্রীরা তিনচার বৎসর কাটায়। এই সময়ে তাহারা যাহা কিছু শিখে তাহা শিখাইবার মতন পণ্ডিত ভারতীয় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক মহলে বড় বেশী নাই।

একটা সোজা কথা বলিলেই চলিবে। জার্ম্মাণির অধ্যাপকেরা নিজেই গবেষক ও লেখক। আর ভারতের অধ্যাপকেরা ইংরেজ, মার্কিণ, জার্ম্মাণ ইত্যাদি বিদেশী অধ্যাপকদের লেখা বই ছাত্রদিগকে মুখস্থ করাইবার জন্যই বাহাল হন। পরের কথা কপ চানো সাধারণতঃ আমাদের স্বধর্ম্ম।

আর এক কথা। আমাদের দেশে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্রদিগকে মাত্র দুই বৎসর কাটাইতে হয়। কাজেই সকল দিক হইতে বিদ্যা-চর্চ্চার দৌড় হিসাবে ভারতীয় পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রেরা জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে কম বিদ্যার অধিকারী। এম্-এ, এম্-এস্‌সি, পাশের পর আরও দুই তিন বৎসর নিয়মিত লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইলে ভারতীয় ছাত্রেরা জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছাকাছি গিয়া ঠেকিতে পারিবে। তাহার পূর্ব্বে নয়।

একটা প্রমাণ এখনই দিতেছি। ভারতীয় এম-এ, এম, এস-সি উপাধিধারী লোকেরা জার্ম্মাণিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার পূর্ব্বে সাধারণতঃ কোনো ভারতসন্তান জার্ম্মাণবিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পায় না। অর্থাৎ গিম্‌নাজিয়ুম-রেয়ালশুলে লিৎসেয়ুমের ছাত্রছাত্রীরা যত বৎসর পরে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় প্রায় ঠিক তত বৎসর পরে ভারতীয় এম, এ, এম্,-এস্‌সিরা জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া থাকে।

এইবার কলিকাতা আর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্ এ, এম্-এস্‌সি ক্লাসগুলায় যে কয়জন ছাত্র পড়িতেছে তাহাদের সংখ্যা একত্র করা যাইতে পারে। করিলেই বুঝিতে পারিব যে, ৭০,৩৮৫ জার্ম্মাণ তরুণ-তরুণীদের তুলনায়, কি গুণ্‌তিতে আর কি গুণ হিসাবে, যুবক বাংলার চরম শিক্ষার্থীদের ঠাঁই কত নীচে। কেননা গোটা বাংলায় এম-এ, এম্-এস্‌সি পড়ে মাত্র ১,৫০০।

ছয় কোটী জার্ম্মাণদের সমাজে ৭০ হাজারের বেশী পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী থাকিলে ৪॥০ কোটি বাঙালীর সমাজে ৫২॥০ হাজার থাকা উচিত। আর এই সাড়ে বায়ান্ন হাজারের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৪।৫ বৎসর ধরিয়া এম-এ, এম্-এসসি, পড়াইবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য জার্ম্মাণ দরের বিজ্ঞানসেবী, দর্শনসেবী, ইতিহাসসেবী, সাহিত্যসেবী অধ্যাপক বাঙালী সমাজে থাকা চাই। আর চাই জার্ম্মাণ বহরের ল্যাবরেটারি, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ইত্যাদি মাষ্টার-ছাত্রদের খোরপোষ।

দুনিয়া কোথায় উঠিয়া গিয়াছে তাহা সমঝিবার পক্ষে জার্ম্মাণ গজকাঠি নবক বাঙ্গলার কাজে লাগিবে। তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা না করিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার বাতিক চাগিলে আমাদের মাথা বিগড়াইয়া যাইবে মাত্র। এইরূপ বদখেয়াল হইতে নিজকে বাঁচাইয়া চলা আমাদের করিৎকর্ম্মা লোকদের দরকার। এইজন্য লম্বা জার্ম্মাণ মাপটা "কেজো" লোকদের মনে না রাখিলেও চলিবে।

চাই ম্যাট্রিকুলেশন পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি

ইয়োরামেরিকার বড় বড় দেশে বি-এ, বি-এসসি পাশওয়ালা আঠার বিশ বৎসর বয়সের তরুণ-তরুণী, গুণতিতে আশমানের তারার মতন অনেক। তাহারাই হইতেছে শিক্ষিত সমাজ বা তথাকথিত "ভদ্র লোক" শ্রেণীর মেরুদণ্ড স্বরূপ। আমরা বাঙলায় বা ভারতে অত দূর উঁচুতে তাকাইবার অধিকারী নই। আমাদের দেশে বি-এ, বি-এসসির সংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবার আশা কম। বর্ত্তমান অবস্থায়, আমি ম্যাট্রিকুলেশন বিদ্যাকেই ভারতীয় সামাজিক মেরুদণ্ডের আধ্যাত্মিক ভিত্তি বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে বা ঐ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এমন তরুণ-তরুণীর দল যত বাড়িতে থাকিবে, ততই আমাদের

দেশোন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এইরূপ আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখা আমার দস্তুর। সম্প্রতি আমার ভাবুকতার দৌড় আর বেশী দূর যায় না। ভবিষ্যতের কোনো বাঙালী ভাবুক হয়ত বলিতে পারিবেন,—"না, বি-এ, বি-এসসি বিদ্যার কমে বাঙালী সমাজের মেরুদণ্ড খাড়া থাকিতে পারে না।" কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ কবে আসিবে আমি জানি না। শীঘ্র আসিলে সুখের ও গৌরবের সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সু-স্বপ্নের মোহে দিন কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

মুচী, তাঁতী, বাগদি, হাঁড়ি, ডোম, জেলে নমঃশূদ্র, মুসলমান ইত্যাদি সকল জাতের ভিতরই হাজার হাজার ম্যাট্রিকুলেশনের ছাপওয়ালা লোক দেখিতে পাইলেই সম্প্রতি আমি সুখী হই। পাড়াগাঁয়ের সকল সম্প্রদায়ের ভিতর গলিঘোঁচে বহুসংখ্যক এই চাপরাশওয়ালা নরনারী সৃষ্টি করা যদি আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত তাহা হইলে আমি নিজকে মস্ত বড় স্বদেশ-সেবক বিবেচনা করিয়া ধন্য হইতাম।

এতগুলা ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ লোক সৃষ্টি করা যাইতে পারে কি করিয়া? জবাব অতি সোজা। যেখানে যেখানে ম্যাট্রিকুলেশন পাঠশালা আছে সেখানে সেখানে পাঠশালাগুলার আকার প্রকার বাড়াইতে হইবে। আর যেখানে যেখানে ঐ দরের পাঠশালা নাই, সেখানে সেখানে ঐ সব নতুন করিয়া কায়েম করিতে হইবে। ম্যাট্রিকুলেশন-ইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ত্তমানে আমাদের আধ্যাত্মিক ও আর্থিক উন্নতির প্রধান খুঁটা।

বেশী পয়সা খরচ করিয়া ভাল ইস্কুল চালাইবার ক্ষমতা বাঙালীর আজ নাই। একথা অজানা নাই কাহারও। কাজেই ম্যাট্রিকুলেশন বিদ্যাটাকে অতি বিজ্ঞের মতন খুব কড়া নজরে পরখ করিয়া দেখিতে আমি রাজি নই। আর্থিক জীবনে আমরা ভারতে "মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে" নিতেই অভ্যস্ত। ইয়োরামেরিকার মাপকাঠিতে

আমাদের ধনী সম্ভ্রান্ত সভ্যভব্যপরিবার গুলাও যথেষ্ট হীন ও সামান্য বিবেচিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের সাধনা বা সিদ্ধি কিছুই কোনো স্বাধীন বা নিম-স্বাধীন জাতির সাধনা বা সিদ্ধির কাছাকাছি গিয়া ঠেকে না। জীবনযাত্রার অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রেও কি বাঙালীকে কি অন্যান্য ভারতসন্তানকে দুনিয়ার লোকেরা একটা হাতীঘোড়া সমঝিতে অভ্যস্ত নয়। কোনো বিষয়েই আমরা উচ্চ শ্রেণীর লোক নই। কাজেই আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ-করা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিদ্যার আসরে কেষ্ট বিষ্টু ভাবিতে যাইব কেন? আমাদের জননায়কগণ ম্যাট্রিকুলেশনকে মোটা কাপড় আর মোটা ভাতেরই জুড়িদার বিবেচনা করিতে না শিখিলে আহাম্মকি করিয়া বসিবেন মাত্র।

মোটা কাপড়ের জুড়িদার মোটা শিক্ষা

আমি যখন বাঙলার হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানকে ম্যাট্রিকুলেশনের অধিকারী করিয়া তুলিতে চাই তখন আমি মামুলি মোটা বিদ্যার চেয়ে বড় কিছুর স্বপ্ন দেখি না। আমি ইয়োরামেরিকার ইস্কুল-ফাইন্যালের বা সেকেণ্ডারী-পাঠশালা ইত্যাদির লম্বা লম্বা গজ দিয়া আমাদের পনর ষোল বৎসর বয়সের বিদ্বানদের মগজ জরীপ করিবার পক্ষপাতী নই। আমাদের যে ধরণের ম্যাট্রিকুলেশন ইস্কুল চলিতেছে ধরিয়া লইলাম যেন আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর তাহার শিক্ষাপ্রণালীতে নতুন কিছু বা উঁচুদরের কিছু কায়েম করা হইবে না। তাহা সত্ত্বেও এই সকল পাঠশালার মতন গণ্ডা গণ্ডা পাঠশালা মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে গড়িয়া উঠা আবশ্যক। পনর ষোল বৎসর বয়সের বাঙালীরা কমসে কম দেশবিদেশের নাম ত উচ্চারণ করিতে শিখিবে। একাল-সেকালের দুচারদশটা প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের ছায়া ত তাহাদের জীবনে পড়িতে পারিবে। বাজার

হিসাবে কলম চালানো আর চিঠিপত্র লিখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা ত সম্ভবপর হইবে। ইংরেজি ভাষায় দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজগুলা পড়িবার যোগ্যতা ত দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর ছড়াইয়া পড়িবে। দুচার দশ লাইন কবিতা মুখস্থ করা, কয়েকটা শ্লোক আওড়ানো, আর পাঁচ সাত জন নামজাদা লেখক-পণ্ডিতের নাম ধাম জানা, এ সবও ম্যাট্রিকুলেশনেরই গণ্ডীর ভিতর ধরিয়া রাখা নেহাৎ অসম্ভব নয়। অধিকন্তু শরীরপালন ও স্বাস্থ্যোন্নতির যৎকিঞ্চিৎ ম্যাট্রিকুলেশনে হজম করা কঠিন নয়। তাহা ছাড়া গোটা কয়েক যন্ত্রপাতি, গাছ গাছড়া, জীবজন্তু, ধাতুপ্রস্তর গ্রহনক্ষত্র এই সবের সঙ্গে কুটুম্বিতা ঘটাইয়া দেওয়া আজকালকার যে কোনো ম্যাট্রিকুলেশন পাঠশালার পক্ষেই সম্ভব

লেখাপড়ার মাপকাঠির তরফ হইতে আমাদের ইস্কুল-কলেজের সংস্কার সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে সংস্কার সাধন করাটা টাকার খেলা। যত গুড় তত মিষ্টি। ভাল ভাল মাষ্টার বাহাল করিতে লাগে পয়সা, আর গণ্ডা গণ্ডা আলমারি ভরা চাই মানচিত্র, ছবিচিত্র ইত্যাদির বাণ্ডিল থাকে থাকে সাজানো। পদার্থবিদ্যা বিষয়ক কলযন্ত্র অথবা রাসায়নিক দ্রব্য বা ভূতাত্ত্বিক ইট পাটকেল, আর জানোয়ারের হাড়গোড়, তরু-লতার ফলমূল ইত্যাদি বস্তু ইস্কুলের সংগ্রহালয়ে মজুত করিতেও রূপচাঁদেরই ডাক পড়ে। এই সকল সংস্কার সাধিত হইলে বাঙালীরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উঁচিয়ে উঠিতে পারিবে, এইটুকু বুঝিবার মতন ক্ষমতা নেহাৎ আনাড়ি লোকেরও আছে

কিন্তু আজ ১৯২৭ সনের অবস্থায় আমি বলিব যে,—অশিক্ষার চেয়ে অর্দ্ধশিক্ষাও ভাল। এমন কি তথাকথিত কু-শিক্ষাকেও আমি ডরাই না। সু-শিক্ষার বন্দোবস্ত করা আমাদের পক্ষে অর্থাভাবে সম্ভবপর নয় বলিয়া

শিক্ষার দুয়ার বন্ধ করিয়া দিবার প্রবৃত্তিই আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য ও মারাত্মক। এই জন্যই আজ আমি বাংলার ভাবুকতাশীল, বুকের পাটাওয়ালা সৎসাহসী স্বদেশ-সেবকগণকে ডাকিয়া বলিতে চাই, "যে যেখানে আছ প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকার ভিতর একটা করিয়া ম্যাট্রি-কুলেশন ইস্কুল কায়েম করিবার দায়িত্ব লও। পাঠশালাটা চোঁথা হউক কুচ পরোআ নাই। মাষ্টারগুলা অকম্মণ্য হউক বয়ে গেল। চাই সর্ব্বত্র অশিক্ষার সঙ্গে লড়াই করিবার কেল্লা; চাই সর্ব্বত্র অবিদ্যাকে ঢিট করিবার হাতিয়ার। চাই সর্ব্বত্র নিরক্ষরতাকে নির্ব্বাসিত করিবার অগণিত ফৌজ। মনে রাখিও প্রাথমিক শিক্ষাকে দেশে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই আবশ্যক হইবে হাজার হাজার ম্যাট্রিকুলেশন পাশওয়ালা গুরুমশাই।"

সমাজের নানা ঘাঁটিতে এইরূপ লোকমত গড়িয়া তোলা আমার মতে যুবক বাংলার ইস্কুলমাষ্টারদের অন্যতম আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য।

"ভদ্রলোকের" দল বাড়িতেছে

ম্যাট্রিকুলেশন ছাড়াইবার পর তরুণ-তরুণীদের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার? এই প্রশ্নটা এখনো দেশের জননায়কগণ তলাইয়া আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। বিগত দশ বিশ বৎসরের ভিতর তথাকথিত ভদ্রলোকের সংখ্যা আমাদের দেশে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার একটা প্রধান কারণ ম্যাট্রিকুলেশন পাঠশালা, ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষা, আর ম্যাট্রিকুলেশনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। এই ম্যাট্রিকুলেশন নামক যন্ত্রটা তথাকথিত "ছোটলোককে" ভদ্রের গোত্রে ঠেলিয়া তুলিয়াছে।

রেলগাড়ী আর ষ্টীমারের প্রভাবে ভারতে "জাতপাঁত" অনেকটা ভাঙিয়া গিয়াছে। একথা আজকাল আর কেহ অস্বীকার করেন না।

"সমাজসংস্কার" বস্তুটা বক্তৃতার আর লেখালেখির জোরে কতটা সাধিত হইয়াছে সম্প্রতি বিশ্লেষণ করিতে বসিব না। কিন্তু "সংস্কার" কাণ্ডের প্রকাণ্ড মুগুর যে লোকজনের যাতায়াত, গাড়ীর ভিতর ঠেলাঠেলি আর মোসাফিরখানায় ছোঁয়াছুঁ'ি তাহা কুলীনদরের বামুনকায়েত মহাশয়েরা এখন একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধস্বরূপই গ্রহণ করিতেছেন। ঠিক এই ধরণেরই আর একটা মুগুর হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-চাপরাশ। একবার এই ম্যাট্রিকলেশনের আবহাওয়ায় কয়েক বৎসর কাটাইতে পারিলে "কেবা হাঁড়ি কেবা ডোম"।

বিদেশে তথাকথিত "ভদ্রলোক" দিগকে মজুর শ্রেণীর লোকেরা "সাদা কলারওয়ালা গোলাম" ("হোয়াইট্ কলার্ড শ্লেভ") বলিয়া ডাকে। ভাবার্থ এই যে, মজুরে আর কেরাণীতে (অর্থাৎ ভদ্রলোকে) কোনো তফাৎ নাই। তফাৎ মাত্র এইটুকু—মজুরদের হাত পা সর্ব্বদা ধূলাকাদায় ময়লা থাকে। তাহাদের পক্ষে ধোআ সাদা কলার পরিয়া কর্ম্মশালায় হাজির হওয়া সম্ভব নয়। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা,—কেরাণীরা, "বাবু ভায়ারা",—অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্রশ্রেণী আপিসে দেখা দেন ধোআ কাপড় চোপড় পরিয়া। কলারটা তাদের শ্বেতবর্ণ। কিন্তু তাহা ছাড়া দস্তুরমাফিক হিসাবে অথবা চরিত্র হিসাবে মজুরে কেরাণীতে ফারাক কিছুই নাই। সবই একাকার হইয়া গিয়াছে।

আমাদের ভারতেও সামাজিক হিসাবে একাকার হওয়ার অর্থাৎ সামাজিক বিপ্লবের লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলে যাঁহা ঢুকিলাম তাঁহা আমরা,—বামুনকায়েতের বাচ্ছাই হই আর জোলা-নমঃশূদ্রের বাচ্ছাই হই,—চটি জুতা পরিতে সুরু করিয়া দিতেছি, টুইলের না হয় খদ্দরের শার্ট পরিতেছি, ধোপাবাড়ীতে কাপড় কাচাইয়া আনিতেছি। আর একবার ধোআ কাপড় কোঁচা করিয়া পরিয়া যখন

আমি রাস্তায় বহির হই, তখন আমাকে ভদ্রলোক বলিবে না এমন লোকটা কে আছে বাংলাদেশ ? ম্যাট্রিকুলেশনের অন্যান্য মাহাত্ম্যের মধ্যে কোঁচাকরা কাপড়ের চল বাড়ানো অন্যতম। দেশে যত উপায়ে অভদ্র নরনারী ভদ্রলোকে পরিণত হইতেছে তাহার ভিতর ম্যাট্রিকুলেশনের আবহাওয়ার ইজ্জৎ খুব বেশী। সমাজ-বিপ্লবের সেবকেরা সমাজ-সংস্কারকেরা ম্যাট্রিকুলেশনকে কুনিশ করিয়া চলিতে শিখুন।

যাহা হউক ভদ্রলোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। আর এই ভদ্রশ্রেণীর সকলেই আমরা ভেড়ার পালের মতন এম্-এ বি-এল্, ডি-এস্সি, পি-এইচ-ডির দিকে ছুটিতেছি। দুটা আড়াইটা তিনটা পাশও করিতেছি, চাপরাশও পাইতেছি। কিন্তু বাজারে এই সব চাপরাশের চাহিদা বেশী বাড়ে নাই। কাজেই ভদ্রলোকের বেকার-সমস্যা।

আজ সময় আসিয়াছে যখন নয়া-পুরাণা-মিশ্রিত ভদ্রলোকগুলাকে দুরস্ত করা দরকার। ভদ্রলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুখের কথা। আজও ভদ্রলোকের সংখ্যা বাডাইবার জন্যই ম্যাট্রিকুলেশনের বিদ্যাপীঠ বাড়াইবার কথা বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই,—ম্যাট্রিকুলেশনের পরবর্ত্তী বিদ্যার ধাপে যে সকল ছাত্রছাত্রী যাইতে চায় তাহাদিগকে কোন্ পথ দেখাইয়া দেওয়া উচিত ?

আমার বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে বেশী লোকের পা-মাড়ানো উচিত নয়। দুচার হাজার আসুক ভালই। উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ইত্যাদির চর্চ্চা-গবেষণার জন্যও ত বাঙালী সমাজে লোক চাই। কিন্তু অন্যান্য বিশ ত্রিশ হাজার ম্যাট্রিকুলেশন-বিদ্বানদের জন্য কি ব্যবস্থা করা যাইবে ?

জেলায় জেলায় "ফাখ্-শুলে" (শিল্পবাণিজ্য-শিক্ষালয়)

বি-এস্-সি, পি-এইচ্-ডি, বি-এল ইত্যাদি বিদ্যার বা ডিগ্রীর নিন্দা করা আমার মতলব নয়। এই গুলার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই সকল চাপরাশ ভালই। বলিতেছি মাত্র এই যে, একমাত্র এই গুলায় আর কুলাইতেছে না। অন্যান্য রংয়ের চাপরাশও চাই। অন্যান্য রকমের বিদ্যা, অন্যান্য ঢংয়ের ডিগ্রী উপাধি বা ডিপ্লোমা, অন্যান্য বিদ্যা-বিষয়ক সার্টিফিকেট আমাদের তরুণ-তরুণী মহলে ছড়ানো দরকার। এই নতুন ধরণের ডিগ্রী ডিপ্লোমা বাজারে ছাড়িবার জন্য নতুন ধরণের কারখানা কায়েম করা আবশ্যক। মামুলি ইন্টারমীডিয়েট বা বি-এ, বি-এস্-সি'র পাঠশালায় তা চলিতে পারে না।

কিরূপ পাঠশালার কথা বলিতেছি এক কথায় বিবৃত করা সহজ নয়। সেই গুলার নাম কোথাও বা হইবে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল, কোথাও বা বাণিজ্য-বিদ্যালয়, কখনও হয়ত ব্যাঙ্কিং-পাঠশালা, কখনও বা বয়ন-বিদ্যালয় ইত্যাদি। আবার কখনও রেশমবিদ্যালয়, দুধবিদ্যালয়, কৃষি-পরীক্ষাগার বা ঐ জাতীয় নামে এই সব বিদ্যাপীঠ পরিচিত হইবে। মফঃস্বলের চাষ-আবাদ, ব্যবসা, শিল্প-কর্ম্ম ইত্যাদি যে যে জনপদে যেরূপ, সেই সেই জনপদে সেইরূপ বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপীঠের নামকরণও নানা শ্রেণীর হইবে। জনপদ-গত বৈচিত্র্য ইস্কুলগুলার বিভিন্নতা সম্পাদন করিবে।

নামের জন্য সম্প্রতি আসে যায় না। কামের কথা বলিতেছি। ইস্কুল-গুলার পাঠ-ক্রম যাহাতে নতুন নতুন উপায়ে ধনোৎপাদনের সহায়ক হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাই আসল কথা।

প্রথমেই নজর দেওয়া দরকার ছবি আঁকা আর নক্সা করিতে পারার দিকে। আঠার-উনিশ বৎসরের ছোকরারা কোনো একটা কারখানায় ঘণ্টা খানেক যন্ত্র-পাতি দেখিয়া আসিয়া নক্সার দ্বারা তাহা যদি বুঝাইতে পারে তাহা হইলে বুঝিব যে যুবক বাংলার পেটে নতুন একটা বিদ্যা পড়িয়াছে।

(১) ছবি ও নকসা

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হইবে লোহালক্কড় আর যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটির অন্তর্গত। বিভিন্ন যন্ত্রের নানা অংশ খুলিয়া সেগুলা আবার জোড়া লাগাইতে পারা, বাঙালা ভদ্র সমাজে একটা নতুন যোগ্যতার সামিল বিবেচিত হইবে। কল গুলার ব্যবহার, কল মেরামত, আর কল দেখিয়া তাহার ভাল মন্দ সমঝিয়া লওয়া, এই সব এখন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যন্ত্রপাতি দেখিবা মাত্র আঁতকাইয়া উঠা অথবা ভাম-রতি লাগা আজ বাংলার আবহাওয়ায় মিশিয়া রহিয়াছে। জেলায় জেলায় এমন সব বিদ্যাপীঠ কায়েম করা দরকার, যাহাতে রকমারি লোহার গড়ন, ঢালাই, খোদাইএর কাজ, চাকা, ক্রেণ, লেদ ইত্যাদি যন্ত্র সবই আটপৌরে জিনিষে দাঁড়াইয়া যায়।

(২) যন্ত্রপাতি

নতুন ইস্কুল গুলার তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হইবে বিভিন্ন দ্রব্যের নাম ও গুণ। লোহা, তামা, কাঁসা, পিতল হইতে সুরু করিয়া মাঙ্গানিজ, অভ্র, কয়লা ইত্যাদি ধাতুজ বস্তু ঘাঁটাঘাঁটি করা আর তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য-ঘটিত কদর আলোচনা করা হইবে একদিক। তাহা ছাড়া কৃষিজ আর পশুজ মালের উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি এবং শিল্প-কর্ম্মে প্রয়োগের বৃত্তান্ত ও এই দ্রব্য-পরিচয়ের অন্তর্গত থাকিবে।

(৩) দ্রব্য-পরিচয়

চতুর্থ শিক্ষণীয় বিদ্যা—রসায়ন। আজকালকার দিনে মামুলি গৃহ-

স্থালাতেও রাসায়নিক বস্তুর রেওয়াজ আছে। তাহা ছাড়া গ্যাস বা অ্যাসিড-নাম ধারী বস্তুর দরকার পড়ে না, এমন কোনো সহর বা সাব-ডিভিসন আজ কাল বাংলা দেশে নাই। কাজেই দোকান হাট আর গৃহস্থালার জন্য কিঞ্চিৎ কিছু রাসায়নিক জ্ঞান বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চাষীমণ্ডলেও বাঁটিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

(৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া

পঞ্চম বিষয় হইতেছে বাজার-হাটের মর্ম্ম বিশ্লেষণ করা। কেনা-বেচার তত্ত্ব, হাটুয়া-বেপারী-আড়তদারদের স্বধর্ম্ম, বিজ্ঞাপন প্রণালী, খরচ পত্র, হিসাব নিকাশ, মালের উৎপাদন-বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ক কথা এই বিদ্যার অন্তর্গত। টাকা কড়ির গল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে বীমা-ব্যাঙ্কের ঠাঁই, রেলষ্টীমার ইত্যাদির কাহিনী ইত্যাদি সবই এই গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িবে। এক কথায় আর্থিক ভূগোল ও ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আর ধনবিজ্ঞানের কিছু কিছু এই বিভাগের শিক্ষণীয় বিষয়

(৫) বাজার-বিদ্যা

এই পাঁচটা বিষয় অবশ্য গ্রহণীয়। তাহার উপর সাধারণ শিক্ষণীয় বস্তু হিসাবে সাহিত্য, অঙ্ক, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি কিছু কিছু রাখা চলিতে পারে। প্রত্যেক ইস্কুলেই জনপদ হিসাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের — বিশেষতঃ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থায়,—কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকিবে। সর্ব্বত্রই কম সে কম তিন বৎসর ধরিয়া লেখাপড়া শেখানো চলিবে। মোটের উপর ১৮।১৯ বৎসর বয়সে ছাত্রেরা এই কারখানা হইতে নতুন ধরণের বিদ্যার সাক্ষীস্বরূপ নতুন নতুন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লইয়া বাহির হইতে পারিবে। তাহারা আজ কালকার বি-এ, বি-এস্‌সির চেয়ে কোনো অংশে নীচু দরের লোক হইবে না।

প্রত্যেক জেলায় এই ধরণের ৩।৪টা ইস্কুল গড়িয়া তুলিবার দিকে আমাদের নজর ফেলা আবশ্যক। এক একটা ইস্কুল চালাইতে বৎসরে

২০।২৫ হাজার টাকা লাগিবার কথা। তাহা ছাড়া ছোট ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ, লাইব্রেরি ও বাড়ী ঘরের জন্য প্রত্যেকটায় এককালীন ৩০হাজার টাকা লাগিতে পারে। টাকাটা তোলা উচিত প্রথমে জেলার ধনী লোকদের নিকট হইতে। তাহার পর মিউনিসিপ্যালিটি আর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট আবেদন চলিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট ধরণা দিয়া পড়িতেই হইবেই জানা কথা।

এই সকল শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষালয় কায়েম হইলেই ভদ্রলোকের ঘরে ঘরে হাড়ি চলিবে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। বেকার সমস্যার মীমাংসা অত সহজ সরল নয়। তবে আমাদের চাষ-আবাদ, তাঁতের কাজ, ছুতার মিস্ত্রীর শিল্প, চূণের কাজ, নূণের কাজ, নৌকা গাড়ীর তৈয়ারী-মেরামতির কারবার সবই খানিকটা উন্নত প্রণালীতে চলিতে পারিবে। ইহা নিশ্চিত যে বাংলার আর্থিক জীবন এ যাবৎ যে আদিম অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা ছাড়াইয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত যুগের প্রথম ধাপে পা ফেলিতে পারিবে। অধিকন্তু পল্লী ও জনপদগুলা আর্থিক সুযোগের বিভিন্নতা মাফিক বিভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে।

ফরাসী সমাজে এই বিদ্যাপীঠের তারিফ খুব বেশী। এইগুলা "একল প্রাতিক দ' কম্যার্স এ দ্যাঁদুস্ত্রী" নামে পরিচিত। এই জাতীয় পাঠশালার জার্ম্মাণ নাম "ফাখ্-শুলে"। মার্কিণ মুল্লুকে আর ইংল্যাণ্ডে এই ধরণের বিদ্যা-কেন্দ্রের অভাব নাই। ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখিয়া শুনিয়া আর সেই সম্বন্ধে সমালোচনা ও বাগ-বিতণ্ডা শুনিয়া আমাদের গরীব দেশের পক্ষে বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মোতাবেক যেরূপ খাপ খায়, সেইরূপ একটা মোসাবিদা সংক্ষেপে প্রচার করা গেল। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির শিল্পবাণিজ্যশিক্ষালয় সম্বন্ধে "ইকনমিক ডেভেলপ-মেণ্ট" নামক গ্রন্থে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে আমাদের

শিক্ষা ব্যবসায়ী আর ধন-বিজ্ঞান সেবীরা দেশোন্নতির উপায় সম্বন্ধে নানা সঙ্কেত পাইবেন, আশা করি।

লম্বা চওড়া বোলচাল ঝাড়িতেছি অনেক। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন যে, লোকটা দেশের খাঁটি অবস্থা কিছুই বুঝে না। এইবার তাহা হইলে বস্তুনিষ্ঠার কিছু পরিচয় দিব।

ইস্কুলমাষ্টারদের কর্ম্ম-দক্ষতা

ইস্কুলমাষ্টারদের শক্তি ও স্বাস্থ্য কিসে বাড়িবে, তাহাই আমার আলোচ্য বস্তু। লেখাপড়ার কথা বলিলাম। এই তরফকে আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তর্গত বিবেচিত করিতে পারেন। এখন ভৌতিক, সাংসারিক বা বৈষয়িক জীবনের কথা বলিব।

ইস্কুলমাষ্টারদের বাস্তব জীবন যত শক্তির প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার ভিতর দুইটি প্রধান। একটি হইতেছে তঙ্খা বা বেতন। অপরটি বিদ্যালয়ের শাসন-প্রণালী।

এই দুই শক্তির সঙ্গে প্রত্যেক ইস্কুলমাষ্টার, গুরুমশাই, অধ্যাপক — সকলেরই প্রতিদিনই কিছু না কিছু বঝা পড়া করিয়া চলিতে হয়।

ইস্কুলমাষ্টারের ভাতকাপড়

দর্ম্মাহার দুরবস্থা মাষ্টার সমাজকে অতি ঘৃণ্য ও শোচনীয় দশায় নামাইয়া আনিয়াছে। ভাতকাপড়ের অভাবে কষ্ট পায় না এমন শিক্ষক বা অধ্যাপক পরিবার বাংলাদেশে একটাও আছে কিনা সন্দেহ। বাঙালী শিক্ষাব্যবসায়ীদের চিন্তায় ঘী এক্ষণে প্রায় প্রত্নতত্ত্ব-মিউজিয়ামের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। দুধ কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য ইস্কুলমাষ্টারেরা আজকাল রাসায়নিক ল্যাবরেটারিতে নমুনা পরখ করিবার সুযোগ পান

মাত্র। এই সকল চাজের সঙ্গে হাট বাজারে মোলাকাৎ হয় দূর হইতে। গৃহস্থালীর হাড়ী কুঁড়িতে ঘী দুধ দেখা দেন কালভদ্রে হয়ত—পালাপার্ব্বণের সময়। মাছমাংসের সঙ্গে বাঙালীর অসহযোগ না থাকা সত্ত্বেও এই বস্তুর ভোজনটা অনেক সময়ে ইস্কুলমাষ্টারদিগকে ঘ্রাণেই সারিতে হয়। দুই বেলা পেট ভরিয়া যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পাওয়া, প্রায় কোনো মাষ্টার পরিবারের কপালে জুটে না।

শীতকালের গরম কাপড় চোপড় মাষ্টার সমাজে বিরল। সে সব চিজ্ কিনিয়া পরিবারের প্রত্যেককে দিবার ক্ষমতা অধিকাংশেরই নাই, কাজেই ইস্কুলমাষ্টারদের মহলে এক নয়া দর্শন গজিয়াছে। তাঁহারা বলিতে বাধ্য হন যে, "বাংলা দেশ গরম দেশ। এখানকার শীতে মোজা গেঞ্জি ফ্লানেল পশম ইত্যাদি দরকার হয় কি? এ সব বিলাস মাত্র।" ইহাকে বলে শিয়ালের নিকট আঙুর ফল খাট্টা।

তারপর ঘর বাড়ীর কথা। এ সম্বন্ধে ইয়োরামেরিকার নানা দেশে, এমন কি মজুর মহলেও যে আদর্শ চলিতেছে তাহার তুলনায় বাংলার মধ্যবিত্ত নরনারীও অতি দীন অতি দুঃখময় জীবন যাপন করিয়া থাকে। একদম ঠোঁট-কাটার মত আমাদের দুরবস্থা বিবৃত করিলে, আমার স্বদেশবাসীরা আমাকে মাপ করিবেন কি না সন্দেহ। তবে গলৎটা আমার চোখে বার বৎসর বিদেশ-প্রবাসের ফলে যেরূপ ঠেকিতেছে, তাহা খোলসা করিয়া না বলিলে আমার কর্ত্তব্য করা হইবে না। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘর-দুয়ার দেখিলে যে কোনো ইয়োরামেরিকান নর-নারীর যেরূপ ধারণা জন্মিবে, আমি সেই দিক হইতেই আমাদের দুর্দ্দশাটা স্বদেশ-সেবকদের নিকট খুলিয়া ধরিতেছি। গৃহ-সমস্যার সমাজ-তত্ত্ব গভীর ভাবে আলোচনা করিবার জন্য জননায়কগণ প্রস্তুত হউন।

অধিকাংশক্ষেত্রেই মাষ্টার বাড়ীর ভিতর বাহির জঘন্য। নেহাৎ বিশ্রী-

কুশ্রী নোংরা পল্লীতে আমাদের ঠাঁই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভবনে স্বাস্থ্য-রক্ষা, শীলতা-রক্ষা, সদাচার-রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব। প্রত্যেক বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীপুরুষের বাথান তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিত্ব সহায়ক আশ্রয় দেওয়া সুকঠিন। এই সকল কথা পশ্চিমা মাপে বলিতেছি না। আমাদের দেশী সু-কুর দাড়িপাল্লায় বাঙালার বাস-গৃহগুলা ওজন করিয়া দেখিলেও, বাঙালী চিকিৎসকেরা, আর নীতি-প্রচারকেরাও এইরূপ রায় দিতেই বাধ্য হইবেন।

অধিকন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যথেষ্টরূপে বজায় রাখা সোজা কথা নয়। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ইস্কুলমাষ্টারদের চতুঃসীমা হইতে নির্ব্বাসিত হইতে বাধ্য। কাজেই আড্ডায় আড্ডায় সৌষ্ঠব, শ্রীসম্পদ ইত্যাদির কথা যখন উঠে তখন ইস্কুলমাষ্টারেরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দু-চারটা কাহিনী আওড়াইয়া বর্ত্তমানের দারিদ্র্য সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকিতে অভ্যস্ত। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"।

বেতন বৃদ্ধির জন্য চাই তথ্য-দক্ষ চৌকিদার

এই সমস্যার মীমাংসা বেতন বৃদ্ধি। মজুরি বাড়াইবার জন্য আন্দোলন চালানো ইস্কুলমাষ্টার-সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। খাই খরচের সঙ্গে সঙ্গে সমান অনুপাতে ঝীচাকরের, রেল-কুলীর, রাস্তার মুটের, ফ্যাক্টরির মজুরদের দম্মাহা বাড়িতেছে। অধ্যাপক মাষ্টার গুরুমশাইদের দম্মাহা বাড়িবে না কেন? এই জন্য প্রত্যেক জেলায় জিনিষ পত্রের দাম বিষয়ক তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। তলব বাড়াইবার আন্দোলনটা সমাজে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখা দরকার। সম্মেলনের কয়েকজন সভ্য নিয়মিতরূপে সকল প্রকার হাটবাজারের মূল্য আর সকল প্রকার চাকুরীর বেতন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে চেষ্টা

করুন। তাহা হইলে ইস্কুলমাষ্টারের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারিবে।

তবে বেতন বৃদ্ধির দৌড় বাংলা দেশে বেশী দূর যাইবে কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু অল্প সময়ের ভিতর দর্ম্মাহা বাড়াইবার আন্দোলন সফল হইবে বলিয়াও বিশ্বাস করি না। কেন না মাহিয়ানা বাড়ানো সম্ভব একমাত্র তখন যখন দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে। বাংলার আর্থিক উন্নতির মাত্রা সম্প্রতি যারপর নাই অল্প। কিছু কিছু উঠিতেছে সন্দেহ নাই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারদের বেতন বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোন্ পল্লীতে কোন্ জেলায় কোন্ সমাজে কখন লোকজনের আর্থিক অবস্থা কতটা স্বচ্ছল হইল তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য চৌকিদার বাহাল করা চাই। "দেশ আমাদের দরিদ্র", "অবস্থা আমাদের স্বচ্ছল নয়", "সম্প্রদায় আমাদের নিঃসম্বল," ইত্যাদি ওজর যখন-তখন যেখানে-সেখানে শুনা যাইবার সম্ভাবনা। এই ওজর অনেক সময়েই হয়ত মাষ্টারদিগকে ফাঁকি দিবার ফিকির মাত্র। সেই সকল অছিলার সত্যাসত্য বিচার করিতে হইবে। এই মোকদ্দমার বাদী মাষ্টারেরা নিজেই। কয়েকজন তথ্যদক্ষ অঙ্কদক্ষ ষ্টাটিষ্টিক্স্-দক্ষ ইস্কুলমাষ্টার সর্ব্বদা সজাগ ভাবে নিজ দলের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হউন। সম্মেলন এই বিষয়ে একটা প্রস্তাব তুলিয়া দেখিতে পারেন।

আর একটা কথা। ইস্কুল-মাষ্টার আমরা গরীব থাকিতেই বাধ্য এই পেশায় বড় লোক হওয়া অসম্ভব। এ কেবল ভারতের তথাকথিত "আধ্যাত্মিক" আবহাওয়ার কথা মাত্র নয়। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা, জাপান, ইতালি ইত্যাদি সকল স্বাধীন এবং উচ্চ শ্রেণীর দেশে মাষ্টার জাতীয় নর-নারীর আর্থিক অবস্থা অন্যান্য ব্যবসার লোকের

আর্থিক অবস্থার চেয়ে নিকৃষ্ট। তবে ভারতের ইস্কুল-মাষ্টারেরা "লিভিং ওয়েজ" বা বেঁচে থাকবার মতন তঙ্খাও পান না। অন্যান্য দেশে মাষ্টার অধ্যাপকদের দারিদ্র্যটা জীবন নিষ্পেষণ করিবার মতন গভীরতা লাভ করে না।

ইস্কুল-শাসনে মাষ্টারের হাত

বিদ্যালয়ের শাসন সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিতে চাই। যে যে কারণে ইস্কুল-মাষ্টারেরা সমাজের অতি ঘৃণ্য জীবে পরিণত হইয়াছে, তাহার ভিতর ইস্কুল শাসনে হাত না থাকা বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। দারিদ্র্য লজ্জার জিনিষ নয়। লজ্জার জিনিষ স্বাধীনতার অভাব। নরনারীরা কর্ম্মকেন্দ্রে যখন ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তখনই তাহাদের মানুষোচিত সদ্‌গুণ লোপ পাইতে থাকে। আর একবার এই লোপের চিহ্ন সমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে প্রতিবেশীরাও তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক বিবেচনা করিতে সুরু করে নৈতিক আর আধ্যাত্মিক অধোগতি তাহারই পরের ধাপ।

বাংলার ইস্কুলমাষ্টার সেই ধাপে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই ধাপের নরনারী কখনো কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারে কি? এই ধাপেও নরনারী কখনো চিন্তাশীল লোকের মতন পরিবারের আর সমাজের সু-কু বিশ্লেষণ করিতে সাহসী হইবে কি? নির্জ্জীব, মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ ছাড়া এই সকল লোকের পক্ষে আর কিছুরূপে চলাফেরা করা সুকঠিন।

এত দুর্গতি সত্ত্বেও বাঙালী ইস্কুলমাষ্টারেরা বিগত বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পল্লীতে পল্লীতে নয়া বাংলা গড়িয়া তুলিতেছেন। যুবক বাংলার ইতিহাসে ইস্কুলমাষ্টারদের কৃতিত্ব অসীম। তাঁহাদের ভাবুকতা ও সাহসিকতা বাঙালী সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু দুচার দশ বিশজন ইস্কুলমাষ্টার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া দশ বার হাজার লোকের ইজ্জৎ রক্ষা পাইয়াছে এরূপ বিশ্বাস করা চলে না। এই দশ বার হাজার লোকের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিয়মিত আত্মকর্তৃত্ব ভোগের সুযোগ দিতে হইবে। চাই ইস্কুল-শাসনে স্বরাজ। যে কারখানায় সপ্তাহে ৩৩ ঘণ্টার গতর খাটানো মানুষগুলার স্বধর্ম্ম সেই কারখানার পরিচালনায় তাহাদের হাত চাই-ই চাই। একমাত্র অথবা প্রধানতঃ ইস্কুল কমিটির কর্ত্তামি কিম্বা সেক্রেটারী মহাশয়ের যথেচ্ছাচার হজম করা ইস্কুলমাষ্টারদের পক্ষে আর সহনীয় নয়। এই সম্মেলন ব্যবস্থা করুন যাহাতে অন্যান্য জেলার শিক্ষক-সম্মেলনের সঙ্গে একযোগে চেষ্টার ফলে সকল স্থলেই ইস্কুল-স্বরাজ কায়েম হইতে পারে।

আজ ১৯২৭ সন। দুনিয়ায় আত্মকর্তৃত্ব, স্বাধীনতা. স্বরাজ, ডেমোক্রেসি ইত্যাদি আধ্যাত্মিক শক্তির দিগ্‌বিজয় চলিতেছে। ফ্যাক্টরি কারখানায় মজুরেরা আর কেরাণীরা এক্ষণে মালিকদের সঙ্গে এক আসনে বসিয়া ফ্যাক্টরি কারখানাগুলির আয়ব্যয়, যন্ত্রপাতি, লাভ লোকসান, কেনাবেচা ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। অষ্ট্রিয়ায়, চেকো-শ্লোভাকিয়ায় আর জার্ম্মাণিতে আইনের জোরে শিল্প-কারখানায় মজুররাজ কায়েম হইয়া গিয়াছে। বিলাতে আর আমেরিকায় এই বিষয়ে এখনো আইন জারি হয় নাই বটে। কিন্তু অনেক কারবারেই মালিকেরা মজুর-কেরাণীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল কাজ চালাইতেছে। হুইট্‌লি সাহেবের তদন্তে ও মোসাবিদায় সমস্যা অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছে।

আমি অতদূর ধাওয়া করিবার জন্য বাংলার মাষ্টার অধ্যাপকদিগকে পরামর্শ দিতেছি না। সম্প্রতি দেশের সরকারী ইস্কুলগুলায় যে সকল নিয়ম কানুন জারি আছে অন্ততঃপক্ষে সেইগুলার যে যেটা যুক্তিসঙ্গত

সেই সব প্রত্যেক ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠশালায় কায়েম হইলেই অনেকটা চলিতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত ইস্কুলশাসন-বিধিতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষকের সম্বন্ধ, শিক্ষকদের ছুটির আইন, বেতনাদির কানুন, ছাত্রদের পাশ ফেলের নিয়ম ইত্যাদি দফা গুলা বোধ হয় সরকারী বিধানে সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া থাকে।

সরকারী প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিয়া বাঙালীরা বিদ্যাসাগর, রিপণ ইত্যাদি কলেজ কায়েম করিয়াছিল। কাজেই কলেজ শাসনের নিয়মটা ও সরকারী নিয়মকেই অনুকরণের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠশালাগুলাও সরকারী জেলা-স্কুলের ছাঁচেই ঢালা। তাহা ছাড়া নবীন বাংলার সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রীয় স্বরাজ আন্দোলন, লোকহিত প্রচেষ্টা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি জীবনের নানা অনুষ্ঠান প্রায়ই ইয়োরামেরিকান অর্থাৎ পাশ্চাত্য নজির অনুসারে চলিতেছে। কাজেই ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠশালার শাসন সম্বন্ধেও আমরা গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত ইস্কুলশাসন নীতিই অনেক পরিমাণে গ্রহণ যদি করি তাহা হইলে বাঙালার জাত মারা যাইবে না।

অবশ্য এই বিষয়টা আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা একত্রে কাজ করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু একদম কানার মতন গবর্ণমেণ্টের ইস্কুলশাসন সম্পর্কিত সকল নিয়মই হুবহু নকল করিতে হইবে আমি সেরূপ বলিতেছি না। সরকারী বিধিটাকে চোখের সম্মুখে রাখিলে ইস্কুল শাসনে স্বরাজ কায়েম করিবার পক্ষে খানিকটা সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে এইটুকু মাত্র বলিতেছি।

বিদেশে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা

নানা উপায়ে ইস্কুলমাষ্টারদের বিদ্যা বাড়াইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে,—যথার্থরূপে বিদ্যা বাড়াইবার সুযোগ ভারতে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই জন্য প্রত্যেক জেলা হইতে বাংলার ইস্কুলমাষ্টারদিগকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতি বৎসর বাংলার কী জেলা দুই জন ইস্কুল মাষ্টারকে বিদেশে পাঠাইবার আর্থিক ভার লইতে পারিবে কি? পারিলে ভাল হয় অন্ততঃপক্ষে তাহার জন্য চেষ্টা করা আর আন্দোলন চালানো আমি নিজ জীবনের এক বড় কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকি

স্বদেশে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার

কিন্তু দেশ শুদ্ধ লোককে,— অথবা শিক্ষাব্যবসায়ী প্রত্যেক বাঙালীকে, বিদেশে পাঠানো সম্ভবপর নয়. অতএব দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার জন্যই অধিকাংশ ইস্কুল মাষ্টারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে. চাই ঘরে বসিয়াই বাহিরের সকল শক্তি ও সুযোগ চুষিয়া লইবার আয়োজন বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে নিবিড় ভাবে দহরম মহরম চালাইবার একটা বড় অথচ সহজ উপায় হইতেছে বিদেশী পত্রিকাবলীর সদ্ব্যবহার সম্প্রতি ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, জাপানী, রুষ ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত কাগজপত্রের নাম করিয়া লাভ নাই ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত মার্কিণ-বৃটিশ পত্রিকা-গুলা হইতেই রস নিংড়াইয়া লইবার জন্য বাংলা দেশের শিক্ষক সংসারে একটা তুমুল আন্দোলন রুজু করিতে চাই। এদিকে সজ্ঞানে আমরা আজ পর্য্যন্ত বেশী কিছু করি নাই কিন্তু আর দেরী করা চলে না। ভারতের বাহিরে গিয়া দুনিয়ার সঙ্গে কোলাকুলি করিবার ক্ষমতা যখন আমাদের বেশী লোকের নাই তখন ভারতের ভিতরেই দুনিয়াকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে কুটুম্বিতা কায়েম করা বুদ্ধিমানের কাজ।

লণ্ডনের "নেচ্যর" (প্রকৃতি) আর নিউইয়র্কের "স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটী" (পাঠশালা ও সমাজ) নামক সাপ্তাহিক আমি বাংলা দেশের প্রত্যেক ম্যাট্রিকুলেশন ইস্কুলে দেখিতে ইচ্ছা করি। লণ্ডনের টাইম্‌স্‌ দৈনিক ফী সপ্তাহে সাহিত্য ক্রোড়পত্র বাহির করে "লিটরারি সাপ্লিমেণ্ট" নামে। এই কাগজেরই শিল্প-বাণিজ্য-পৃষ্ঠ-ক্রোড়পত্রটাও সাপ্তাহিক। মাঝে মাঝে শিক্ষা-সাপ্তাহিক ও বাহির হয়। এই গুলার সঙ্গে বেশী সংখ্যক বাঙালী মোলাকাৎ করে নাই। কিন্তু মোলাকাতের ব্যবস্থা করা দরকার। নিউ-ইয়র্কের "লিটরারি ডাইজেষ্ট" নামক সাপ্তাহিকেও বিশ্বশক্তির চৌবাচ্চা পাওয়া যায়। এই চৌবাচ্চায় ডুব দিলে জগতের গতিভঙ্গীর সঙ্গে বাঙালীর মাংসপেশীর মোলায়েম মিলন ঘটিতে পারিবে। মার্কিণ মুল্লুকের "জিও-গ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন," "কারেণ্ট ওপিনিয়ন," "ফরেন অ্যাফেয়ার্স" "জার্ণাল অব আর্ট এণ্ড আর্কিওলজি" পত্রিকা আর বিলাতের 'ডিস্‌কাভারি' "ফর্টনাইটলি রিভিউ" "নেশন", "এক্‌স্‌পোর্ট ওয়ার্লড" ইত্যাদি পত্রিকার সংগ্রহ ও প্রত্যেক জেলায়ই অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" কাগজের তথ্য আর ছবিগুলাও আমাদের চোখ খুলিয়া দিতে সমর্থ। সকল কাগজের নাম করিবার অবসর নাই।

বিদেশী গ্রন্থ-পত্রিকার চুম্বক-প্রচার

কাগজগুলা কিনিয়া আনিলেই বঙ্গপল্লীতে বিশ্বশক্তি হাজির হইবে এরূপ নয়, অথবা বাংলার নরনারী আন্তর্জাতিক জীবনের জোয়ারে সাঁতার কাটিতে পারিবে তাহা বলিতেছি না। তাহার জন্য চাই ইস্কুলমাষ্টারদের পরিচালিত বাঙলা মাসিক পত্রিকা। প্রত্যেক শিক্ষক বিদেশী কাগজগুলা পড়িয়া নিজ নিজ এলাকার অন্তর্গত জ্ঞানবিজ্ঞানের চুম্বক প্রকাশ করিবেন। কেহ দায়ী থাকিবেন উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে। কাহারও ঘাড়ে

ঝুঁকি থাকিবে যন্ত্রপাতির বিবরণ সম্বন্ধে। কেহ গণিতের নয়া আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্প লিখিবেন, কেহ বা নবীনতম সঙ্গীতজ্ঞের চরম কেরদানির কথা শুনাইয়া বাঙালা রসরাজদিগকে নয়া নয়া রসের ইঙ্গিত দিবেন। কিছু সংবাদ, কিছু প্রবন্ধ, কিছু গ্রন্থসমালোচনা—ইত্যাদি পাঁচ ফুলে সাজি হইয়া প্রত্যেক জেলার মাসিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় দুনিয়াকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এইরূপে দুনিয়ার সম্পদ লুটিবার মতলবে নয়া বাংলার ইস্কুলমাষ্টারদিগকে দিগ্‌বিজয়ীর বেশে হাজির হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি।

চার পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে "টিচার্স জর্ণ্যাল" নামক মাসিক পত্রিকা চলিতেছে। তাহার বাংলা অংশের নাম "শিক্ষা ও সাহিত্য"। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছু নাই। তবে আমি যে ধরণের কাগজ চালাইবার জন্য ইস্কুলমাষ্টার আর অধ্যাপক-দিগকে ডাকিতেছি তাহার মোসাবিদা অন্য ধরণের। ইস্কুলকলেজের শিক্ষক-অধ্যাপকদের নিজের বিদ্যা বাড়াইবার সহায় স্বরূপ নতুন ঢংয়ের কাগজ আমার লক্ষ্য। যতটুকু বিদ্যা আমাদের পেটে আছে সমাজের নানা স্তরে তাহার প্রচার করা ভালই। কিন্তু দুনিয়ার জ্ঞানমণ্ডলে ফী সপ্তাহে যে নতুন নতুন তথ্য বাহির হইতেছে আর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা হজম করাও সকল শিক্ষক-অধ্যাপক জাতীয় নরনারীর কর্ত্তব্য।

এই নতুন নতুন খোঁজ গবেষণা-পরীক্ষা-উদ্ভাবনের মাত্রা বাংলাদেশে অথবা গোটা ভারতে অতি অল্প মাত্র। ইয়োরামেরিকার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, ঔপন্যাসিক, গায়ক, যন্ত্রবিৎ, পূর্ত্তবিৎ ও অন্যান্য সুধীরাই দুনিয়ায় সকল প্রকার বিদ্যা ও কলা বাড়াইবার কাজে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নতুন নতুন চিন্তা ও কর্ম্মের বৃত্তান্ত দেশবিদেশের নানা দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে আর ত্রৈমাসিকে প্রচারিত হয়।

কাজেই বিদেশী গ্রন্থ-পত্রিকার চুম্বক প্রচার করিতে পারিলেই আমাদের ইস্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের বিদ্যাও বাড়িবে কর্ম্মদক্ষতাও পুষ্ট হইবে। এই ধরণের নতুন পত্রিকা বাংলা দেশে আজ কম্‌সে কম্‌ ছয়খানা চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমার এই অনুরোধ।

ইস্কুলমাষ্টারের কুস্তীকছরৎ

আমার চিন্তায় ও জীবনে,—কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য পালন, কর্ত্তব্যের তালিকা ছাড়া আর কিছু নাই। কাজেই আমি নেহাৎ আহাম্মকের মতন কর্ত্তব্যের পর কর্ত্তব্যের কথা আওড়াইয়া যাইতেছি। এইবার কর্ম্মক্ষেত্রের দুএকটা কর্ত্তব্যের কথা বলিব। মনে রাখিবেন, গোটা দেশের কথা বলিতেছি না। একমাত্র ইস্কুলমাষ্টারের ভালমন্দই সম্প্রতি আমার আলোচ্য বিষয়।

শিক্ষক মহলে কুস্তীকছরৎ আজকাল কতটা চলে জানিনা। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক জেলায়ই অনেকগুলা ব্যায়াম-কেন্দ্র, খেলার আখড়া কায়েম করা দরকার। পাড়ার লোক আর ইস্কুলের ছাত্রেরা আসুক বা না আসুক, মাষ্টাররা নিজেও ত মানুষ। তাহাদের শরীর পুষ্ট করা আর স্বাস্থ্যের উন্নতি করাও বাঙালীর জীবনীশক্তি বাড়াইবার উপায়। বাঙালী সোজা হাঁটিতে পারে না, সোজা বসিতে পারে না। আমাদের ছোঁড়াবুড়া ভদ্র অভদ্র সকলেই অসংখ্য মুদ্রাদোষের দাস। এই সকল দুর্ব্বলতার একটা বড় কারণ শারীরিক অসুস্থতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাব। কুস্তীকছরৎ খেলাধূলা দৌড়লাফ ইত্যাদি মেহনৎ কোনো বয়সেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা শৈশবে বা যৌবনে এই সবের দিকে ঝোঁক দেন নাই তাঁহারাও সুরু করুন। শারীরিক মঙ্গলের অনুষ্ঠান কোনো তিথিনক্ষত্রের উপর নির্ভর করে না। ৫৫।৫৬ বৎসরের লোকও এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে শেষজীবনটা সুখে সুন্দরভাবে কাটাইতে পারিবেন।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম-ভবনে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষকে একসঙ্গে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সাধনায় নিরত দেখিয়াছি। জার্ম্মাণির জগদ্‌বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডক্টর বিয়ার বার্লিন শহরে "ডায়চে হোখ্‌শুলে ফ্যির লাইবেস্‌-য়্যিবুঙ্গেন" (শরীরচর্য্যার জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়) কায়েম করিয়াছেন। এইখানেও স্ত্রীপুরুষ একত্রে চরম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে দুই তিন বৎসর ধরিয়া একমাত্র শারীরিক মঙ্গলের বিদ্যারই চর্চ্চা করে। এই কলেজে বুলগেরিয়া হইতে, আমেরিকা হইতে, জাপান হইতে লোকজন আসিয়া, ব্যায়ামশাস্ত্রের শেষ আবিষ্কারগুলা আত্মস্থ করিতেছে। বাঙালীর মতিগতি সেই দিকে যাইবে না কেন?

ভ্রমণ-সমিতি

ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ ও ইস্কুলমাষ্টারের জীবনে একটা বড় তথ্য হইলে সুখের হয়। পল্লী-ভ্রমণ বা সন্ধ্যার সময় পান চিবাইতে চিবাইতে হাওয়া খাওয়া মাত্রের কথা বলিতেছি না। দল বাঁধিয়া, প্রয়োজন হইলে পদব্রজেও--জেলা হইতে জেলায় গিয়া কিছুকাল কাটানো এই ভ্রমণ-কাণ্ডের সামিল মনে করিতেছি।

ভ্রমণের সামাজিক ও আত্মিক প্রভাব সম্প্রতি বিশ্লেষণ করিতেছি না। বিভিন্ন জেলায় অথবা প্রদেশে বসবাসের ফলে চরিত্র কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইতে পারে। সে কথাও সম্প্রতি তুলিতেছি না। তাহা ছাড়া এক জেলার বা প্রদেশের ইস্কুলমাষ্টারের সঙ্গে অন্য কোনো জেলার বা প্রদেশের ইস্কুলমাষ্টারের সাময়িক "বিনিময়" সাধিত হইলে শিক্ষা-সংসারে একটা নতুন-কিছুর উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই দিকেও এক্ষণে নজর ফেলিতেছি না। একমাত্র স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তিযোগের সাধনায়ই ভ্রমণকে ব্যায়ামের সহচর সমঝিতেছি। এই উদ্দেশ্যেই জেলায় জেলায় ইস্কুলমাষ্টারদের ভ্রমণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন

পূর্ব্বে বলিয়াছি আত্মিক উন্নতির উপায় স্বরূপ বিদেশী পত্রিকা-পাঠের আর বাংলা পত্রিকা চালাইবার ব্যবস্থার কথা। এইবার কর্ম্মক্ষেত্রের আর একটা কর্ত্তব্য হিসাবে সামান্য কিছু বলিব। বাংলার জনপদে জনপদে আন্তর্জ্জাতিকতার কেন্দ্র গড়িয়া তোলা দরকার। ইয়োরামেরিকার প্রায় সকল দেশেই আজকাল বহুসংখ্যক আন্তর্জ্জাতিক সমিতি, পরিষৎ, ক্লাব ইত্যাদির প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলার ইস্কুলমাষ্টারেরা বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার মতলবে স্থানে স্থানে লাইব্রেরী, গ্রন্থালয়, বা পাঠাগার কায়েম করিতে থাকুন। এই সকল জীবনকেন্দ্রের সঙ্গে প্যারিস, জেনেহবা, নিউইয়র্ক, তোকিও ইত্যাদি শহরের নানা আন্তর্জাতিক চিন্তা ও কর্ম্মকেন্দ্রের পত্র-ব্যবহার চলিতে পারিবে। তাহা হইলে বিদেশী কাগজ পত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী লোকজন আর আন্দোলনের সঙ্গে ভাব-বিনিময় আর কর্ম্ম-বিনিময়ের সুযোগও সৃষ্ট হইতে থাকিবে।

বাংলাদেশের লাইব্রেরী-আন্দোলনে ইস্কুলমাষ্টারদের ঘর খুব বড় বিবেচনা করি। আর লাইব্রেরীগুলার সাহায্যে বিশ্বশক্তি অতি সহজে বঙ্গ-পল্লীর স্তরে স্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে। ভারতীয় সমাজে আন্তর্জ্জাতিকতার বৃদ্ধিতে আর জাতীয় চেতনার প্রসারে সাহায্য করিবার জন্য নয়া বাংলার ইস্কুলমাষ্টারগণ প্রস্তুত হউন।

ইস্কুল-গণ্ডীর সীমানা

যাঁহারা যে ব্যবসার লোক তাঁহারা সেই ব্যবসার তারিফ করিতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের বিবেচনায় সেই ব্যবসাটাই হইতেছে দুনিয়ার সৃষ্টিস্থিতির কেন্দ্র স্বরূপ। এই খেয়ালেরই এক নমুনা দেখিতে পাই

শিক্ষা-ব্যবসায়ী মহলে। ইস্কুলমাষ্টার, গুরুমশাই, কলেজের অধ্যাপক ইত্যাদি যে নামেই তাহারা ব্যবসা চালান না কেন, তাঁহাদের মতে দুনিয়াখানা চলিতেছে তাঁহাদেরই কল্যাণে। পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজ ইত্যাদি বিদ্যার প্রতিষ্ঠানকে তাঁহারা মানব জাতির পুনর্গঠনের সর্ব্বপ্রধান বা এমন কি একমাত্র যন্ত্র সমঝিয়া থাকেন। অনেকে হয়ত খোলাখুলি শিক্ষা-ব্যবসার অথবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এতটা বাড়াবাড়ি করেন না। কিন্তু অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের চিন্তাপদ্ধতির ভিতর এই ধরণের একটা দর্শন কাজ করিয়া থাকে।

এই খানে আমি ইস্কুল জাতীয় ছোট বড় মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সীমানা সম্বন্ধে দেশের লোককে দুচার কথা বলিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে গুরুমশাই, ইস্কুলমাষ্টার বা অধ্যাপক জাতীয় বিদ্যাব্যবসায়ীর সীমানাও হাতে হাতে ধরা পড়িবে। আমার বিবেচনায় কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব দেশের কোনো এক কেন্দ্রের প্রভাবে গড়িয়া উঠে না। এক সঙ্গে বহু জীবনকেন্দ্রের প্রভাব প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন বিকাশে সাহায্য করে। এই গেল আমার ব্যক্তিত্ব-দর্শনের প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে এই যে, কোনো নরনারীরই এমন কোনো বয়স নাই যেটা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিত্ব বিকাশ তাহার পরে আর সম্ভবপর নয়। কি শৈশব কি যৌবন, কি প্রৌঢ়াবস্থা, কি বার্দ্ধক্য, জীবনের প্রত্যেক দশায়ই, প্রত্যেক "আশ্রমেই" মানুষ নতুন নতুন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে আর তাহার ফলে নতুন নতুন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতেছে।

ইস্কুল বনাম পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি

মানুষের জীবন গঠনে পরিবার বড় শক্তি, কি পাঠশালা বড় শক্তি? এই দুয়ের দাবী আলোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে

যে, কট্টর পরিবারবাদী পরিবারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, আর কট্টর পাঠশালাবাদী তাঁহার নিজ হাতিয়ারের মহত্ত্ব দেখাইতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত কোনো উকিলের কপালে ডিগ্রী জারি হয়ত ঘটিবে না। কিন্তু জুরির বিচারে এইটুকু অন্ততঃ বঝা যাইবে যে,—মানবগঠনে পাঠশালার অদ্বৈতশক্তি সমাজ-বিজ্ঞান স্বীকার করিতে অসমর্থ।

পুরুত ঠাকুরেরা অথবা পৌরোহিত্য-বাদীরা পরিবার ও পাঠশালা উভয়ের সঙ্গেই ধর্ম্মকর্ম্মের, দেবদেবীর, মন্দিরতীর্থের আসন দাবী করিতে অভ্যস্ত। এমন কি তাহাদের বিবেচনায় ধর্ম্মশক্তি মানবচিত্তকে এবং মানবের ভবিষ্যৎকে যত বেশী নিয়ন্ত্রিত করে তত বেশী আর কোনো শক্তি করে না। এই ধরণের বাড়াবাড়ি চালাইয়া থাকেন রাষ্ট্রবাদীরাও। তাঁহারা বলিবেন—"পুলিশ, জেলখানা, আদালত, তহশিলদার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরিবার, পাঠশালা, ধর্ম্মকর্ম্মের কোনোটার চেয়েই কম নয়।" আর যাঁহারা অর্থশাস্ত্রী তাঁহারা ত ধনদৌলতের প্রভাবে গোটা সমাজকে প্রভাবান্বিত দেখিবেনই। অন্নচিন্তা চমৎকারা— কথাটার মর্ম্ম কে না বুঝে? আজকালকার ফ্রয়েডপন্থী কামশাস্ত্রীরাও চরিত্রের উপর কামশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে অতি মাত্রায় আস্থাবান।

ধনের অদ্বৈতবাদ যে ধরণের বাড়াবাড়ি, ধর্ম্মের অদ্বৈতবাদও সেই ধরণেরই বাড়াবাড়ি। রাষ্ট্রের আর কামের বা অন্য কিছুর অদ্বৈতবাদও ঠিক তাহাই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশে, নর নারীর চরিত্র গঠনে, মানবাত্মার প্রকৃতি-পরিচালনায় আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আকারপ্রকার গড়িয়া তুলিবার কাজে ধনেরও ইজ্জৎ আছে, ধর্ম্মেরও ইজ্জৎ আছে, কামেরও ইজ্জৎ আছে, রাষ্ট্রেরও ইজ্জৎ আছে। এগুলার কোনোটাই ফেলিয়া দেওয়া চলে না।

কাজেই দাঁড়াইতেছে এই যে, ইস্কুলমাষ্টার নামক সমাজ-সেবকের

কর্মগণ্ডী প্রচুর পরিমাণে সীমাবদ্ধ। বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে অতি-কিছু ধারণা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইস্কুলমাষ্টারের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎকে, সমাজের ভাগ্যকে, জাতীয় চরিত্রকে পুনর্গঠিত করিবার কলযন্ত্র যতগুলা আছে বা থাকিতে পারে তাহা ছাড়াও বহুসংখ্যক কলযন্ত্র নরনারীর আবহাওয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর সেই সকল হাতিয়ার চালাইয়া দুনিয়া মেরামত করিবার বা ব্যক্তির আত্মা রূপান্তরিত করিবার মিস্ত্রী হইতেছে অন্যান্য বহুশ্রেণীর সমাজ-সেবক।

প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত একসঙ্গে বহু সমাজ-শক্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর সমাজ সেবকের তাবে টোল খাইতে খাইতে গড়িয়া উঠিতেছে। এই গেল প্রথম কথা। অপর কথা হইতেছে, নরনারীর প্রত্যেক বয়সেই আত্মবিকাশের, চিত্ত গঠনের ব্যক্তিত্ব পুষ্টির সুযোগ জুটিতে পারে। কোনো নির্দ্দিষ্ট বয়সে প্রায় কোনো ব্যক্তির জীবনী শক্তি ফুরাইয়া আসে না। কৈশোরে বা যৌবনে ব্যক্তির মগজে যে যে প্রবৃত্তি খেলিতেছে একমাত্র সেই সেই প্রবৃত্তিই তাহার কোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত করে না। এই কারণেই প্রৌঢ় বয়সের অভিজ্ঞতা আর কর্ম্মদক্ষতার সঙ্গে অনেক সময়েই ছাত্রাবস্থার পাশ-ফেলের যোগাযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃতী বাঙালীর ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ

কথাটা বাংলাদেশের যে-কোনো প্রসিদ্ধ লোকের জীবন বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিলেই অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিবে। এইরূপ চিত্ত-বিশ্লেষণ বা ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণের দিকে আমাদের সাহিত্য কতখানি অগ্রসর হইয়াছে জানি না। দু এক কথায় ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছি মাত্র। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ এই চারজন বাঙালী চার বিভিন্ন

পথের পথিক। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব চার রকমের। চিত্ত-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের সমস্যাটা নিম্নরূপ। এই চার জন যে যে লাইনে মহত্ত্ব বা কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহাদের ইস্কুল-জীবনের যোগ কত খানি? তাঁহারা হয়ত প্রত্যেকেই বিনয়ী ও নম্রতার অবতার। হয়ত তাঁহারা কেহ বা কোনো গুরুমশাইয়ের, কেহ বা কোনো নিকট-আত্মীয়ের প্রভাব অতিমাত্রায় স্বীকার করিয়া নিজ নিজ জীবন ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইবেন। তাহাদের আত্মজীবন-চরিত এবং আত্ম-ব্যাখ্যা ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ভাবে কোনো জীবনবৃত্তান্ত-লেখক বা ঐতিহাসিক যদি এই কয়জনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন তাহা হইলে আমার বিশ্বাস দেখা যাইবে যে, একমাত্র পাঠশালা বা একমাত্র পরিবার নামক প্রভাব-মণ্ডল তাঁহাদের জীবনের প্রকৃতি গঠিত করে নাই।

অধিকন্তু প্রশ্ন তুলিতে হইবে,—এই সকল কৃতী পুরুষ তাঁহাদের কোন্ বয়সে নিজ নিজ কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য সূত্রপাত অথবা উল্লেখযোগ্য পরিণতি দেখাইয়াছেন? এই প্রশ্নের জবাব পাইতে হইলে দেশের ভিতর-কার আর গোটা দুনিয়ার ভিতরকার অসংখ্য শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত চোখের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইবে। দেখিব যে, মানবাত্মা—বিশেষতঃ কৃতী পুরুষদের ব্যক্তিত্ব, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব শক্তির সাহায্যে নব নব মূর্ত্তি প্রকট করিতেছে।

আশুতোষ আর চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা চলে এই যে,—বাংলাদেশ তাঁহাদের কৃতিত্ব যে সময়ে ভোগ করিল সেই সময়ে তাহাদের বয়স ছিল কত? অরবিন্দ আর খদ্দরাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধেও এই সকল প্রশ্নই করা যাইতে পারে। কোনো এক প্রতিষ্ঠান সে পরিবারই হউক, বা পাঠশালাই হউক, কোনো এক ব্যক্তি,-- সে পুরুত ঠাকুরই হউক বা

পুলিশ প্রহরীই হউক—তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে কি? করিয়া থাকিলে, কতখানি বা কতটুকু?

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ইতিহাস-গবেষণায় যুবক ভারতের অন্যতম পথপ্রদর্শক। কোনো পাঠশালা বা গুরুমশাই তাঁহাকে এই পথে চালাইয়াছে কি? সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোথায় জীবন সুরু করিয়াছিলেন আর কোথায় আসিয়া ঠেকিতেছেন শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই তাহা জানা আছে। রামেন্দ্রসুন্দর পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন কোন্ লাইনে আর বাঙালী জাতি তাঁহার নিকট কোন্ কৃতিত্বের জন্য ঋণী? রমেশচন্দ্র দত্তের কীর্ত্তিও চিত্তবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে ফেলা যাইতে পারে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি যে, ইস্কুলমাষ্টারের আর ইস্কুলের দাবী বেশী চালানো চলে না।

আজকালকার যুবক বাংলায় দেখিতেছি ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অন্যতম সরকারী রসায়ন-দক্ষের চাকরি বর্জ্জন করিয়া পল্লীব্রতী হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র বসু ম্যাজিষ্ট্রেট-স্থানীয় চাকুরো না হইয়া ব্রহ্মদেশে জেল-বাসিন্দা-গিরি করিতেছেন। কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের মেথর-সেবায় বাহাল আছেন ক্যাপ্টেন-সার্জ্জন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অপর দিকে মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানরাজ্যের যে মুল্লুকে হাতযশ দেখাইতেছেন সেই মুল্লুকের প্রবেশ-পথ দেখাইবার মত কোনো লোক বোধ হয় বাংলার অধ্যাপকদের ভিতর ছিল না।

সমাজ-বনিয়াদের বহুত্ব

মানুষ মানুষের সঙ্গে স্নেহের টানে প্রেমের-মৈত্রীর-সহযোগিতার সম্বন্ধে মিশিতে পারে। এইরূপে দল সমাজ, জাতি ইত্যাদি জীবন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা

থাকিতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, টক্কর-প্রিয়তা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রেষারেষি দলে দলে কামড়াকামড়ি, শ্রেণী-বিবাদ, জাতি-লড়াই ইত্যাদি শক্তি ও সমাজ-কেন্দ্র গড়িয়া তুলে।

মানুষ কখনও বা অন্যান্য মানুষকে দেখিয়া অনুকরণ করিতেছে। নকল করিবার প্রবৃত্তি মানবের ব্যক্তিত্বকে ও আর সমাজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে কম নয়. অনুকরণটা সব সময়েই সজাগ না হইতেও পারে। কখনও কখনও অজ্ঞাতসারেই প্রতিবেশীর কর্ম্মকৌশল নকল করা মানব-চিত্তের পক্ষে সম্ভব।

আবার অপর দিকে অনুকরণই মানবজীবনের একমাত্র বিকোশোপায় নয়। মানুষ কিছু না দেখিয়া-শুনিয়াও নিজেই কিছু না কিছু ভাঙিতেছে গড়িতেছে আবার ভাঙিতেছে আবার গড়িতেছে। এইরূপ স্বাধীন সৃষ্টি-শক্তিও মানুষের সমাজ গড়িতে সমর্থ।

এই সকল শক্তির মতন আর একটা শক্তি হইতেছে শিক্ষাপ্রদান। লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলা লোককে কোনো নির্দ্দিষ্ট মতলব অনু-সারে কোনো নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে লাগিয়া যায়। তাহার জন্য জগতে দেখা দেয় গুরুগৃহ, ইস্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কখনই কোনো একটা মাত্র শক্তির জোরে সমাজের জীবন, ব্যক্তির আত্মা,দলবদ্ধ চিত্ত বিকাশ লাভ করিতেছে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। সমাজ-বনিয়াদের বহুত্ব সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান না থাকিলে ইস্কুলমাষ্টারেরা অতি-দাম্ভিক হইয়া পড়িতে পারেন। সেই দাম্ভিকতা হইতে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেক মাষ্টার-অধ্যাপকের কর্ত্তব্য।

সহস্রমুখী শক্তি-যোগ

ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজে,সমাজ-গঠনের কারবারে ইস্কুলমাষ্টারের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব একদম অস্বীকার করা হইতেছে না। কিন্তু স্বদেশ-সেবক এবং

সমাজ-বিজ্ঞানের সেবক হিসাবে সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, বিগত বিশ পচিশ ত্রিশ বৎসরের ভিতর বাংলাদেশে আর ভারতে অনেক নতুন আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল শক্তি নানাবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর আন্দোলনের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সেই সমুদয়ের ধাক্কা কখন কোন্ ছোকরার, কোন্ যুবার, কোন্ বুড়ার ঘাড়ে কপালে হাতপায়ে আসিয়া কতটা লাগিতেছে তাহার ঠিক নাই। এই সকল ধাক্কার কিম্মৎ অনেক ক্ষেত্রেই লাখ লাখ টাকা। তাহারই ফলে আশুতোষ-চিত্তরঞ্জনের বুকের পাটা আর গলার আওয়াজ।

শিক্ষা-দর্শন সম্বন্ধে এই ধরণের সমাজ-বিজ্ঞানই আমার প্রথম স্বীকার্য্য। আমি বহুত্বের উপাসক, একবগ্গা অদ্বৈতবাদের প্রচার করা আমার হাড়মাসে অসম্ভব। দেশের ভিতর অসংখ্য বিভিন্ন রংয়ের প্রতিষ্ঠান কায়েম হইলেই সমাজ ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। ক্লাব চাই, সমিতি চাই, মজুর-সঙ্ঘ চাই, বিজ্ঞান-পরিষৎ চাই, সঙ্গীতের আখড়া চাই। নাচগানের বারোয়ারীতলা চাই, সিনেমা চাই, গল্পগুজবের আড্ডা চাই। ল্যাবরেটারী চাই, ওয়ার্কশপ চাই, ফ্যাক্টরি চাই। বক্তৃতা চাই, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চাই। চাই খবরের কাগজ, চাই বিজ্ঞাপন-পত্রিকা, চাই প্রদর্শনী, চাই মেলা। এই ধরণের আরও লাখ লাখ জিনিষ চাই। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের বৈচিত্র্য যতই বাড়িতে থাকিবে ততই আমাদের ব্যক্তিত্বগুলা হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইতে থাকিবে।

জীবন-বিকাশের শক্তি ও সহায় নানাবিধ। এই সহস্রমুখা শক্তি-যোগের যে যে-দিকে পারে সে সেইদিকে সাধনা করিতেছে। যুবক বাংলায় জীবনের জোআর সুরু হইয়াছে। ইতি মধ্যেই যৌবন-শক্তি বাঙালী সমাজকে বহুসংখ্যক জ্যান্ত মানুষ উপহার দিতে পারিয়াছে। দিকে দিকে বাঙ্লা দেশ বাড়িতেছে। দিগ্বিজয়ী বাঙালীরা "বৃহত্তর বঙ্গ", "বৃহত্তর

ভারত” গড়িয়া তুলিতেছে। বৈচিত্র্যে, বহুত্বে, গভীরতায় বাঙলার নরনারী বাড়িয়া চলিয়াছে। বৈচিত্র্যে, বহুত্বে, গভীরতায় বাঙলার নরনারী বাড়িয়া চলিবে।

মগজ মেরামতের হাতিয়ার *

সত্য বনাম আহাম্মুকি

লোকের কানে যে সব কথা ভাল শুনায় সে সব কথা সাধারণতঃ আমার মুখে বাহির হয় না। মুখরোচক বোলচাল ঝাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

সত্য জিনিষটা সনাতনও নয় সার্ব্বজনিকও নয়। আমি সত্যকে ব্যক্তিগত প্যাটেণ্ট সমঝিতে অভ্যস্ত। এ চিজ হইতেছে যার যার নিজ রক্তমাংসের অভিজ্ঞতারই প্রতিমূর্ত্তি।

কাজেই আমার নিকট যে বস্তুটা চরম সত্য সে বস্তুটা আপনাদের নিকট পরম আহাম্মুকি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমি আপনাদেরকে আমার মতামতের স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য কোনো মতলব আঁটি নাই। আমি আমার নিজ বক্তব্য আওড়াইয়া যাইব মাত্র। আপনারা বিবেচক, পরীক্ষক ও সমজদার।

* শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলনের সাহিত্যশাখার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। এপ্রিল, ১৯২৭।

মাষ্টার মহলে দেশের কথা

ইস্কুলমাষ্টার আমরা কথার ব্যবসা করি। বাক্য-বীর হওয়া ইস্কুল-মাষ্টার মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। কাজেই এই বাক্য-পেশার অন্তর্গত দুচার কথাই আমি এই সাহিত্য-সম্মেলনে আলোচনা করিতে আসিয়াছি।

দেশটা বড় হইতেছে কি ছোট হইতেছে এই বিষয়ে আলোচনা চালাইতে দেশের যে কোনো লোকই অধিকারী। ইস্কুলমাষ্টারদের বাক্য-গণ্ডীর ভিতরও দেশচর্চ্চার একটা ঠাঁই আছেই আছে। একমাত্র উকীলের, একমাত্র সাংবাদিকের, একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রচারকের, একমাত্র মিউনিসিপ্যাল প্রতিনিধির জিম্মায় দেশচর্চ্চা চলিবে এরূপ কোনো আইনও নাই, দস্তুরও নাই। ইস্কুলমাষ্টারেরাও মানুষ। আর ইস্কুল-মাষ্টারদের হাজার কাজের ভিতরে দেশচর্চ্চাটাও থাকিতে বাধ্য। একথা-গুলি "অ্যাপ্‌লায়েড্‌ সোসিঅলজি" নামক প্রয়োগমূলক সমাজ-বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত।

বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলনের উদ্যোগে এই প্রথম সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কাজেই তাহার আওতায় দেশচর্চ্চার আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হইবে। অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকের মতন ইস্কুলমাষ্টারদেরও এই দিকে স্বার্থ আছে প্রচুর।

দেশ-চর্চ্চায় "নব্য-ন্যায়"

কিন্তু গোল বাধিতেছে একদম গোড়ায়ই। আমার বিবেচনায় দেশের ভিতর কয়েক বৎসর ধরিয়া একটা বিষম বুজরুকি চালানো হইতেছে। দেশের স্বার্থ, দেশের উন্নতি ইত্যাদি শব্দগুলা হরদম ঝাড়িয়া চলিয়াছি, অথচ এইগুলার বিশদ আলোচনা করা আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। অথবা যে সব আলোচনা বাজারে অতি প্রবল তাহার ভিতর বস্তুনিষ্ঠার অভাব বিস্তর।

আমি আলোচনা-প্রণালীর কথাই আপনাদের নিকট তুলিব। আমাদের মগজে অলীক চিন্তা অনেক প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল বাজে মালের দাসত্ব হইতে মাথার স্বাধীনতা কায়েম করা আমার অন্যতম লক্ষ্য। আমি যা কিছু আজ বলিয়া যাইব তার ভিতর "ধান ভানতে শিবের গীত" অনেক কিছু হয়ত থাকিবে কিন্তু আসল কথা হইতেছে মাথাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করার কথা।

দেশচর্চ্চায় বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিশাস্ত্র খাটানো আমার মতলব। মগজ মেরামতের হাতিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই আমি এখানে আসিয়াছি। বাংলার ইস্কুলমাষ্টারদের হাতে এই হাতিয়ারের ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। দেশোন্নতি সম্বন্ধে যে "নব্য-ন্যায়ের" কথা পাড়িতে যাইতেছি তার কিছু কিছু যদি বাঙালী ইস্কুলমাষ্টারের কোনো কোনো মহলে কথঞ্চিৎ গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে আমাদের সমাজে একটা বড় গোছের আধ্যাত্মিক বিপ্লব সুরু হইবে এইরূপ আমার বিশ্বাস। সেই বিপ্লবের ঝাণ্ডা যেখানে-সেখানে খাড়া করিবার জন্য আমি নিজ জীবনের বড় ধর্ম্ম বিবেচনা করি।

আগেই বলিয়া রাখিয়াছি আমার ধর্ম্মটা আপনাদের চিন্তায় হয়ত জবর অধর্ম্ম অথবা আহাম্মুকি। বাজারে আমার মালটা কাটিবেই এমন কোনো কথা বলিতেছি না। আর আপনাদেরকেও জোর জবরদস্তি করিয়া আমার মালের দালালি দিতে আসি নাই। আপনারা পূরাপূরি স্বাধীন। আমাকে আপনারা ডাকিয়া আনিয়াছেন এইজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে লোকপ্রিয় কথা যদি আমার হাড়মাসের দস্তুর না হয় তা হইলে মাপ করিবেন। এই আমার অনুরোধ।

আমার বক্তব্য অতি সোজা। আমি বলি আঙ্গুর ফল খাট্টা নয় আর তেতোও নয়, আঙ্গুর ফল মিঠে এবং মিঠেই বটে। এ ছাড়া আমার

আর কিছু বক্তব্য নাই। এই সোজা কথার যুক্তিও অতি সোজা। কোদাল যেটা সেটা করাতও নয়, চামচও নয়, কোদাল কোদালই বটে। এই পর্য্যন্তই আমার যুক্তি এবং দর্শন।

দেশোন্নতি বনাম স্বাধীনতা

এই সোজা কথা লইয়া আমাদের দেশে গোলমাল উপস্থিত। আমি আজ বলিতে যাইতেছি দেশোন্নতির সম্বন্ধে। এ কথাটাও তেমনি সোজা, বুঝিতে গোলমালের কারণ নাই। যদি বলিতাম দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তাহা হইলে বুঝিতে গোলমাল হইত। স্বাধীনতা বলিবা মাত্রই লোকে নানা রকম ব্যাখ্যা সুরু করিত। এই যে স্বাধীনতাটা বলিতেছি এটা কি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা? এই যে স্বরাজ বলিতেছি এর মানে অমুক অমুক? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং ঐ রকম গোলমেলে শব্দ আমি ব্যবহার করিতেছি না। বলিয়াছি কোদাল কোদালই বটে। তার জন্য যেমন কোনো বুজরুকি চালানো পোষায় না, তেমনি দেশোন্নতি শব্দ বুঝিতে কোনো প্রকার জটিলতা হাজির হয় না। আমার পেটের অসুখ হইয়াছে, আপনি দাওয়াইর ব্যবস্থা করিলেন। আমি সারিয়া উঠিলাম। এই রকম আর পাঁচ জনের দাওয়াইর ব্যবস্থা করা গেল হাসপাতাল উঠিল, মেডিক্যাল কলেজ খাড়া হইল হাকিমী আয়ুর্ব্বেদী চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। এভাবে পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পাঁচ লাখ, দশ লাখ লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ডাক্তার, হাসপাতাল, আরোগ্যশালা কায়েম হইল ইত্যাদি। আগে যেরূপ পেটের অসুখ হইত এখন হয় না। অথবা হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। অতএব দেশটা উন্নত হইয়াছে।

আবার ধরুন আমি খাইতে পাইতেছি না, আপনারা খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, আমি চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। আমার মত আট জন দশ জন, আট হাজার, দশ হাজার, আট লাখ, দশ লাখ লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁত তাঁতই সই, ফ্যাক্টরী ফ্যাক্টরাই সই। তাতে পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পাঁচ হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা আসে আসুক। যে যে রকমে পারেন আপনারা হয়ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। চোখের সামনে হয়ত দেখিতেছি, আগে যেখানে পাঁচ লাখ লোক দুবেলা খাইত, এখন সেখানে বিশ লাখ পঁচিশ লাখ, দুই কোটী, তিন কোটী, চার কোটী, পাঁচ কোটী লোক তিন বেলা করিয়া খাইতেছে। অতএব বোঝা গেল দেশটা উন্নত হইয়াছে।

সেই রকম আমি মূর্খ আছি, আহাম্মুক আছি। আমার মত আহাম্মুক-গুলোকে মানুষ করিতে পাঠানো হইল; বিদ্যালয় হইল, কলেজ হইল, টেকনিক্যাল ইস্কুল হইল, চতুষ্পাঠী হইল, গবেষণা-পরিষদ হইল, সাহিত্য-পরিষদ হইল। এই ধরণের অনেক কিছু হইল। এ সব আমার মত পাচ সাত দশ জনকে, হাজার জনকে পাঁচ-সাত-দশ লাখ জনকে চালাইয়া লইয়া পিটাইয়া দুরস্ত করিয়া লম্বা করিয়া দিয়া গেল। যারা আহাম্মুক ছিল, তারা আক্কেলওয়ালা হইল। আবার আগে যেখানে পাচ হাজার জন আক্কেলওয়ালা ছিল, এখন সেখানে পাঁচ লাখ, পাচ কোটী লোক আক্কেলওয়ালা হইল। বুঝিতে পারিতেছি দেশটা উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু দেশটা স্বাধীন হইয়াছে কিনা, দেশে স্বরাজ আসিল কিনা, এ প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিব কঠিন প্রশ্ন, এ আমি বুঝি না। স্বাধীনতা বুঝি না। স্বরাজ বুঝি না। কেননা স্বাধীনতা আর স্বরাজ বুঝিতে গেলে গোলমেলে বুজরুকিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। পাছে বুজরুকির ভিতর প্রবেশ করিতে হয় কিম্বা গোলমেলে গর্ত্তে পড়িয়া

হাবুডুবু খাইতে হয় সেই ভয়ে যে জিনিষটা বুঝি,—যেমন 'কোদাল' 'কোদাল', বটে—তারি আলোচনা করিতেছি।

আজকে আমার পরিভাষা দেশোন্নতি। জিনিষটি অতি সোজা, এ লইয়া গোলমালের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমি চারটি জিনিষের কথা বলিব। দেশোন্নতির চার খুঁটা বা খুঁটাচতুষ্টয়। যাঁরা শাস্ত্র জানেন তাঁরা বলিবেন "সত্য-চতুষ্টয়ং"। সম্প্রতি দেশোন্নতি নামক সত্যের চার খুঁটা ফেলিতেছি। যদি বলেন,—পাচ দশ খুঁটা নয় কেন? আমি বলিব,—আলবৎ পাচ লাখ, দশ লাখ খুঁটা আছে, থাকিতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি শুধু চার খুঁটার কথা বলিব মাত্র।

প্রথম নম্বর বলিতে চাই—দেশোন্নতি করিবার জন্য যত পথ দরকার সেই পথগুলোকে একেবারে নতুন আবিষ্কার করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। এই ১৯২৭ সনের বাংলা দেশে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে এখনই দেশকে আমরা বড় করিয়া তুলিতে পারিব. অর্থাৎ আজকে দেশে যে সব কর্ম্মকেন্দ্র আছে তার সদ্ব্যবহার আমরা করিতেছি না। করিলে যে বস্তুনিষ্ঠ দেশোন্নতির কথা বলিতেছি তার অনেক বস্তু পাওয়া যাইত। আগেই বলিয়া রাখি তাতে স্বরাজ স্বাধীনতা আসিবে কিনা জানি না। কিন্তু আহাম্মুকগুলোকে মানুষ করা, যারা খাইতে পাইতেছে না তাদের মুখে অন্ন দেওয়া, যারা মরিয়া যাইতেছে তাদিগকে চাঙ্গা করিয়া তোলা এই রকম ধরণের দেশোন্নতি সাধন করিবার অনেক প্রণালী, অনেক কেন্দ্র, অনেক প্রতিষ্ঠান ১৯২৭ সনের বাংলাদেশে আছে। কিন্তু গত বিশ বাইশ বৎসরের ভিতর সেদিকে আমরা বড় বেশী মনোযোগ দিই নাই।

চাউলের জাত পরিবর্ত্তন *

আপনারা জানেন কিনা বলিতে পারি না—আমরা আজকাল যে চাউল খাই এই চাউলটা ত্রিশ বৎসর আগে যে চাউল ছিল সে চাউল নয়। চাউলের জাতটা বদলিয়া গিয়াছে, আর দশ বৎসর পরে আরও বদলিয়া যাইবে। ত্রিশ বৎসর পরে হয়ত এমন বদলিয়া যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে চাউল খাইয়া 'বন্দেমাতরম্' লিখিয়াছেন, সে চাউল, আর ভবিষ্যৎ বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র যে চাউল খাইবে সে চাউল এক চাউল হইবে না। এই চাউলের ভিতর কি আছে? আছে এই,—আগে যে ধরণের চাউল এই বাংলাদেশে বা ভারতে পয়দা হইত তাকে ল্যাবরেটরীতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে চাউলের জাতটা বদলানো যায়। সে রকম চেষ্টা এই বাংলাদেশের কোনো কোনো জায়গায় হইতেছে। আগে যে রকম দানা ছিল এখন তার উন্নতি করা হইতেছে। তার ফলে আগে যেখানে এক বিঘা জমিতে অত মণ ধান চাউল গজাইয়া উঠিত এখন সেখানে তার চেয়ে বেশী ধান, চাউল, খড় কুড়ো উঠিতেছে। স্বাধীনতা আসে নাই স্বরাজ আসে নাই, দেশের আইন কানুন বদলায় নাই; ঘটনাটা এই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নতুন বীজের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে দশ বিঘা, পঁচিশ বিঘা, দশ হাজার বিঘা, পঁচিশ হাজার বিঘা জমিতে এই নূতন চাউলের সৃষ্টি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে চাউল এমন বদলিয়া যাইবে যে পুরাণা জাত আর থাকিবে না। এর সঙ্গে আর্থিক তত্ত্বের যোগও আছে। যে ধানটা দিয়া আগে পাঁচ টাকা রোজগার হইত এক বিঘা জমিতে, এখন সেখানে সাড়ে সাত টাকা আট টাকা রোজগার

---

* চাউল, গম, পাট, তুলা আখ ইত্যাদির জাত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রতি বৎসর যে সকল তথ্য ও অঙ্ক পাওয়া যায়, সবই বাড়্‌তির সাক্ষী।

হইতেছে। অবশ্য টাকার হিসাবে আজকাল সব জিনিষেরই দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু এ চাউলটা হইতে আয় মাত্র সেই হিসাবে বাড়িয়াছে তা নয়, তার বেশী বাড়িয়াছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ধরণে চাউল যদি বদলানো যায় তবে সেটা আমাদের দেশের উন্নতির সহায়ক কিনা।

গম-পাট-তুলার বংশোন্নতি

আরো দৃষ্টান্ত চাই? আজ পাঞ্জাবে বিশ লাখ বিঘা নতুন জমিতে নতুন ধরণের গম হইতেছে তেমনি ত্রিশ-চল্লিশ-সত্তর লাখ বিঘা জমিতে নতুন নতুন জাতের তুলা সৃষ্টি হইতেছে। এই ধরণে আখ, তামাক প্রভৃতি —যা বিদেশে বিক্রী করিয়া আমরা টাকা আনি, যা আমরা ঘরে ব্যবহার করি—প্রত্যেক জিনিষের জাত বদলাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। তার ফলে কি পাট, কি তুলা সব হইতে আমাদের ডবল তিন গুণ চার গুণ টাকা আমদানী হইতেছে। আপনারা জানেন পাট বিক্রী করিয়া বৎসরে আশী কোটী টাকা পাই, পাঞ্জাবের গম দিয়াও ঐ পরিমাণ টাকা বিদেশ হইতে আসে। পাটের বীজ, ধানের বীজ, তুলার বীজ উন্নত করা হইয়াছে বলিয়া যদি গত দশ বৎসরে পাঁচ-দশ-বিশ কোটী টাকা দেশে বাড়িয়া থাকে তাহা হইলে যুবক ভারতের পক্ষে এই জিনিষ সম্বন্ধে উদাসীন বা অনভিজ্ঞ থাকা সমীচীন হইবে কি?

আমি বলিতে চাই যে, স্বদেশসেবক হিসাবে কর্ত্তব্য পালনে আমরা ক্রটী করিতেছি। কি কি বিষয়ে ক্রটী করিতেছি? আপনারা জানেন— বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতে আজ কৃষি বিষয়ক পরীক্ষার কেন্দ্র আছে। উত্তর বঙ্গের, পশ্চিম বঙ্গের, পূর্ব্ব বঙ্গের দক্ষিণ বঙ্গের অনেক সাব-ডিভিসনে, জেলায় জেলায়, মফঃস্বলে মফঃস্বলে এক্‌সপেরিমেণ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশটী কেন্দ্র রহিয়াছে। কোন্ জমিতে

কি ফলিতে পারে, কোন্ চাষ হইলে পরে চাষীর উন্নতি হইতে পারে, কোন্ গরুকে কি রকম রাখিলে দুধ ভাল হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা হয়। পরে তার ফলগুলি এক জায়গায় জমা করিয়া রাখা হয়। অবশ্য জমা করিয়া রাখার জন্য এর সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি হইয়াছে চাষীদের মধ্যে পল্লীগ্রামের মধ্যে ছড়াইবার জন্য। এর নাম কৃষি-বিদ্যালয় বা কৃষি-বিষয়ক পরীক্ষাগার বা গবেষণাগার। নতুন নতুন তথ্যগুলাকে দেশের ভিতর ছড়াইবার যে কর্ত্তব্য এখন সেসব ঐ সকল গবেষণাগারের কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড়ে রহিয়াছে। কিন্তু স্বদেশসেবক হিসাবে এই জিনিষগুলিকে যদি আমরা দেশের মধ্যে ছড়াইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের কৃষির উন্নতি, গরুর উন্নতি, দুধের উন্নতি অনেক বেশী হইত। সে জ্ঞানের ফলে এখন যেখানে পাঁচটী লোক দশ টাকা বেশী রোজগার করিয়াছে সেখানে পাঁচশ' বা হাজার লোকের পক্ষে হয়ত বেশী রোজগার করিবার ক্ষমতা জন্মিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন হইতে আজ পর্য্যন্ত গত বিশ বাইশ বৎসরের মধ্যে এ লাইনে আমরা যথোচিত মনোযোগ দিই নাই।

সমবায়ে ক্রোর ক্রোর টাকা

এই ধরণের আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব। আজ সমবায় আন্দোলন বলিয়া একটা বিপুল আন্দোলন বাংলাদেশে চলিতেছে। প্রায় বার হাজার সমবায়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ কোন কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। ন্যাশন্যাল ইস্কুল হয়ত পঞ্চাশ-পঁচাত্তরটী হইয়াছিল। ছাত্র সেই স্বদেশীর চরম যুগে হাজার চারেক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ তার নাম গন্ধও নাই। অথচ এখন বাংলাদেশে বার হাজার শুধু সমবায়-সমিতি আছে। এই সমিতিগুলির পেছনে রুধির অর্থাৎ টঙ্কা আছে অনেক,—যা স্বদেশী আন্দোলনের সময়

কল্পনাতেও কেউ আনিতে পারে নাই। বাংলাদেশের নিরক্ষর চাষী সমাজের আবহাওয়ায় পল্লীগ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টায় এই বার হাজার কর্ম্মকেন্দ্র —যাতে প্রায় সাড়ে ছয় কোটী টাকার আদান প্রদান হয়,—গড়িয়া উঠিয়াছে। সাড়ে ছয় কোটী টাকা এই বাঙালী জাতি জমা করিয়া রাখিয়াছে—বিজ্ঞাপনের পাতায় নয়। এটা খবরের কাগজের ভূয়ো কথা নয়। এই সাড়ে ছয় কোটী টাকা তারা নগদ আনিয়াছে

রাষ্ট্র-নায়কদের কর্ত্তব্য-স্খলন

এ রকম দৃষ্টান্ত আরো দিতে পারি। দরকার নাই। এই যে তিন-চারটা দেখাইলাম এতে যুবক-ভারত মাতিয়াছে কি? আমি বাংলাদেশের লোক, আমি জানি এদিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। স্বদেশীর অগ্নি পরীক্ষার সময়ও নয়, আজও নয়। চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি পায়ের তলা দিয়া এত বড় গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। কোটী কোটী টাকার নতুন নতুন ধান চাউল পাট তুলো পয়দা করিবার জন্য কৃষিবিষয়ক পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এদিকে আমাদের মাথা খাটে নাই। জিজ্ঞাস করিতে পারেন—এসব আলোচনা কারা করিতেছে? সে জিনিষটার নাম করিলেই আপনারা চটিয়া উঠিবেন। কেননা বলিতে বাধ্য,—গভর্ণমেণ্টের আয়োজনে এসব হইতেছে। না সুরেন্দ্রনাথ, না বিপিন পাল, না অরবিন্দ, না রবীন্দ্রনাথ, না চিত্তরঞ্জন—একজন দেশ-নায়কও এ লাইনে ব্রতী হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। এঁদের কেহ এসব জানেন না তা বলিতেছি না। এই যে মহা মহা লোকের নাম করিলাম—আপনারা যত লোকের ইচ্ছা নাম করিতে পারেন আপত্তি নাই। তাঁরা যত বড়ই হউন না কেন—এই যে অনুষ্ঠান যা সমাজের ভিতর, দেশের ভিতর রহিয়াছে সে অনুষ্ঠান যে আমাদের স্বদেশ-

সেবকদেরই কর্ম্মক্ষেত্র একথা তাঁরা একপ্রকার কেহই বলেন নাই। যদি কেহ কিছু বলিয়া থাকেন আমি মত বদলাইতে প্রস্তুত আছি। হয়ত "স্বদেশী" বক্তৃতার সময় কথা উপলক্ষে দুচার লাইন কেহ বলিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের বা স্বদেশসেবার কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে এ জিনিষটা যুবক ভারতের সম্মুখে আন্তরিকভাবে কেহ উপস্থিত করেন নাই। এর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের ছোঁয়াছুয়ি আছে বলিয়াই কি এ সব অস্পৃশ্য? তাই বলিয়া কি মনে করিব গভর্ণমেণ্টের হাসপাতালে গেলে ব্যারাম সারিবে না? কৈ গভর্ণমেণ্টের ইস্কুলে যাওয়া কি বন্ধ করিয়াছি? আগে কেহ কেহ যাইত না বটে, এখন সবাই যাইতেছে। তেমনি গভর্ণমেণ্টের কতকগুলা কর্ম্মকেন্দ্র আছে, সেখানে রামা শ্যামা সকলেই চাকুরী করিতেছে, চাকুরী ত কেহ ছাড়িয়া দেয় নাই। যেখানে যেখানে স্বার্থ সেখানে সেখানে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগ দেখিতেছি অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু যে-যে জায়গায় দেশের কোনো উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে - সে সবের সঙ্গে চলিয়াছে অসহযোগ!

যুবক বাংলার স্বদেশ-সেবা

"অভয় আশ্রম" চলিতেছে। "খাদি প্রতিষ্ঠান" চলিতেছে। খাইয়া না খাইয়া কত রকম কষ্ট সহ্য করিয়া অন্ততঃ শ'পাচেক লোক এই সকল কাজে লাগিয়া রহিয়াছে! লোকেরা গাঁ হইতে সহরে, সহর হইতে গাঁয়ে যাইতেছে, স্বদেশ সেবার কাজ করিতে যাইতেছে। তেমনি চিত্তরঞ্জনের নামে পল্লী-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে। যুবারা খাটিতেছে, ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। অনেকে এই ধরণের স্বার্থত্যাগ পরোপকার করিতেছে। করিতেছে না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। চোখের সাম্‌নে দেখিতেছি যুবক বাংলায় চিন্তা, সাধনা, উদ্যোগ, মনোযোগ সব রহিয়াছে। আমার

বক্তব্য এই যে, শত শত লোকের সমবেত চেষ্টায় যদি এই সকল কাজ চলিতে পারে তবে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অন্যান্য পাঁচ সাত রকমের কাজ করা যাইতে পারে না কি? সমবায় সমিতির সরকারী চাকুর্‌য়েরাই কি সমবায়ের কাজ চালাইবে, তা ছাড়া আর কারো কি কর্ত্তব্য নাই? কিন্তু "স্বদেশ সেবকদের" ভিতর তেমন লোক পাওয়া যাইতেছে না। এখন যাহারা খাটিতেছে তাহারা সরকারী বিশেষজ্ঞ। একমাত্র তাদেরই কি এই মাথাব্যথা যে. কি করিয়া নতুন নতুন জাতের পাট, ধান, তামাক উৎপন্ন হইতে পারে তাহার আলোচনা করা? তাতে কি যুবক বাংলার কোনো কর্ত্তব্য নাই? জেলায় জেলায়, মফঃস্বলে, যতগুলি পরীক্ষা-ক্ষেত্র, কৃষি গবেষণাগার আছে. তাহাতে কি করিয়া ঐ সকল কারবারের উন্নতি হইতে পারে চাকর‍্যেরা তার ব্যবস্থা করিতেছে। সেগুলি মজুর. গোয়ালা, চাষীদের ভিতর ছড়ানো কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? আমার বিবেচনায় পায়ের কাছে যে শক্তি রহিয়াছে সে শক্তির সদ্‌ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয়াশ্রম, পল্লীসংগঠন খুব ভাল। কিন্তু এই যে অন্যান্য দশ বিশ পথ রহিয়াছে তার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের যোগ দেখিতেছি বলিয়া তা বর্জ্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গবর্ণমেণ্টের ছোঁয়া যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তার সাহায্য লইয়াও বাংলাদেশের উপকার করা সম্ভব। বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া স্বদেশী আন্দোলন চালাইবার পর আজ ১৯২৭ সনে এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করা দরকার। এই হইতেছে সত্য-চতুষ্টয়ের প্রথম খুঁটা।

দেশে পুঁজির অভাব

এ খুঁটা আপনাদের কি রকম মনে হইল বুঝিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় খুঁটার কথা বলা মাত্রই বোধ হয় আমার হাড় কখানা থাকিবে না।

কথাটা এই, চাষের উন্নতিই বলুন, কি ফ্যাক্টরী চালাইতেই যান, কি আর কোনো উপায়ে ব্যক্তিগত টাকা রোজগারের কথাই দেখুন,—একটা কিছু রোজগারের কথা যখন ভাবি তখনই মনে উঠে, মূলধন আমাদের দিবে কে? বিদেশ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি ডজন ডজন লোক এম-এ, এম-এস-সি পাশ। সে সব লোক যখন আমাদের কোনো দেশী আফিসে চাকরি করিতে যায় তখন তাকে ৫৫।৬৫৲ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। কিন্তু সে সব লোক যদি কোনো বিদেশীর আফিসে চাকরী করিতে যায় এবং তাদেরকে যদি তারা চাকরী দেয় তাহা হইলে ৫৫।৬৫৲ দিবে না, দিবে একেবারে ২০০৲ টঙ্কা। এই তথ্যের মানে এ নয় যে একটা কিছু পাশ করিয়া বিদেশীর কাছে গেলেই চাকরী জুটিয়া যাইবে। আসল কথা আমাদের দেশের লোকের টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। বিদেশীরা যখন একটা লোক লয়,—হয়ত প্রথমেই বলিবে "লইব না, দেশী লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিব না," কিন্তু যদি লোকটাকে লয়, তখন দেখিবে লোকটার যদি কর্ম্মের ক্ষমতা থাকে, তবে সেই ক্ষমতা বজায় রাখিয়া যেন কাজ করিতে পারে তদুপযোগী মাইনে তাকে দিতে হইবে। "কলিকাতায় যে বাজার দর দাঁড়াইতেছে তাতে দুশ' টাকা না দিলে আমার আফিসের অপমান করা হইবে"—এইরূপ হইতেছে বিদেশী মনিবদের চিন্তাপ্রণালী।

আমাদের দেশকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে। সকলেরই স্বার্থ দেশকে বড করিয়া তোলা। ধরিয়া লইতেছি, ছোট হউক বড় হউক প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু স্বদেশ ভক্তি আছে। কিন্তু দেশটাকে বড় করা যায় কি উপায়ে? ধরা যাক যেন,— লাগিয়া গেলাম চাষীকে ব্যবস্থা দিতে এই যে, ৩০৫ নম্বর পাটের বীজ লাগাইলে ঠিক বিঘা প্রতি আড়াই গুণ মাল উৎপন্ন হইবে। আর একজনকে বুঝাইলাম—"এতদিন পর্য্যন্ত যে খৈল ব্যবহার করিতেছ ওটাতে কিছু হইবে না, ভাল কিছু করিতে হইলে সার

দরকার।” আপনারা বলিবেন, “এসকল নতুন নতুন তথ্য চাষীরা বুঝিবে না; তাদের জ্ঞান নাই, তারা পাশ-করা নয়।” আমি বলিতে চাই একেবারে আহাম্মুক একেবারে মুখ্‌খু চাষারা কেউ নয়। তারা অনেক কিছুই বুঝে শুনে। হয়ত তারা বলিবে, “বাবু হে, কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি, নিমতলার ঘাটও চিনি, কেবল মরিয়া আছি তাই। এই যে সার, এই যে হাল, এই যে মোটা বলদ, এই যে বীজ এ সব কিনিতে যে কাচা টঙ্কার দরকার?” শেষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতে হয় আবার কিঞ্চিৎ পুঁজি-সমস্যায়।

আপনি বাংলাদেশের কোনো এক জেলায় চলিয়া যান। সেখানে কোনো একজন চাষাকে হয়ত টাকা দশেক দিয়া সাহায্য করিতে পারেন, বেশী লোককে পারেন না। তাতে দেশের বা পল্লীর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হইতে পারে কি? তার জন্য চাই বিপুল আয়োজন। একজন চাষীকে যদি বৎসরে ৩০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে পারেন এবং এভাবে দশ হাজার চাষীকে এক বৎসর টাকা যোগাইতে পারেন তাহা হইলে তিন লাখ টাকায় গিয়া দাঁড়াইল। এই তিন লাখ টাকা দিতে পারে বাংলাদেশে কে আছে? যার টাকা আছে সে বলিবে, “কেন আমি তিন লাখ টাকা দিব? আমি ত ধর্ম্ম করিতে বসি নাই।” কিন্তু এখানে যে ব্যবসার কথা আছে সে তা বুঝে না। ধরুন, এই দশ হাজার চাষী তিন লাখ টাকা খাটাইয়া এক বৎসরে অন্ততঃ সাত লাখ টাকা করিবে। কিসে বুঝা যাইবে করিবে? এটা ভাবা কিছু কঠিন নয়। এই দশ হাজার লোক “সমবেত” ভাবে জামসেদপুর হইতে নূতন যন্ত্রপাতি আনিবে, সমবেত ভাবে বাজারে মাল ফেলিবে,- যেই তিন লাখ টাকা খরচ করিবার মত ক্ষমতা তাদের জন্মিয়াছে। দুচার দশ জনকে দিয়া কিছু হইবে না। টাকা ঢালিতে হইলে দশ হাজার লোককে একদিনে তিন লাখ টাকা দিতে হইবে। একটী

বৎসরের মেহনৎ এই তিন লাখ টাকাকে হয়ত সাত লাখ টাকায় ঠেলিয়া তুলিবে। এমন লোক চাই যে লোকটী এক বৎসরে তিন লাখ টাকা ধার দিয়া দেড় বৎসর কি দু বৎসর বসিয়া থাকিতে পারে,—যতক্ষণ পর্যান্ত না চাষীরা তিন লাখের জায়গায় পাঁচ লাখ ফিরাইয়া দিবে এবং নিজেদের হাতে দু' লাখ রাখিবে। তিন লাখ টাকা দিতে পারে বাংলাদেশের কোন জেলায় কত লোক আছে? তার পর এ বিশ্বাস থাকা চাই যে,—লোক-গুলাকে টাকা দেওয়া যাইতে পারে, লোকগুলা চোর নয়, খাটিয়া লাভ করিয়া আসল টাকা মায় সুদ শুদ্ধ তারা পরিশোধ করিবে।

এখানে চাষের কথা বলিলাম। এইরূপ কারখানা-শিল্প ইত্যাদি লাইনের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। দেশ সম্বন্ধে যদি কোনো মত প্রচার করিতে চাহেন তখনও এই কথাই উঠিবে। সংবাদপত্র চালাইতে চান? তাতে কাগজ চাই, ছাপাখানা চাই, এডিটারের সঙ্গে চার পাঁচ জন লোক চাই। নানা ধরণের "আধ্যাত্মিক" আন্দোলন বাংলাদেশে চালানো অসম্ভব কি? যদি সম্ভব হয়, প্রশ্ন হইবে টাকা আসিতেছে কোথা হইতে? কখনও পুঁজির কথা বাদ দেওয়া চলে না।

গত বিশ বাইশ বৎসরের খবর আপনারা জানেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, হিন্দুস্থান ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি প্রত্যেকটার মূলধন টাকা পয়সা পুঁজি-পাটা কি আছে না আছে হিসাব করিয়া বাঙালীর পুঁজি-শক্তির দৌড়টা দেখা যাইতে পারে। সে শক্তি কতটুকু? যে 'রুধির' দিলে আমাদের দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্য চালান সম্ভব, যার সাহায্যে আমাদের দেশের লোকের আর্থিক উপকার হইতে পারে সেই রুধির যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। তখন উপায় কি? এখানে আমি আবার কোদালকে বলিতেছি কোদাল। বলিতেছি আঙ্গুর ফল খাট্টা নয়, মিঠেই বটে।

ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা

বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে যে কয়জন লোক মানুষ হইয়াছে তার অধিকাংশ কোথায় কাজ পাইয়াছে? তাদের ছেলে বা আত্মীয়, যারা আজকাল স্বদেশী আন্দোলন চালাইতেছে অথবা তাদের বাপ খুড়ো কোন্ কোন্ আফিসে কাজ করিতেছে? জবাব সোজা। রেল কোম্পানীতে,জাহাজ কোম্পানীতে,বিদেশী বীমাকেন্দ্রে ও ব্যাঙ্কে। কলিকাতা হইতে কাঁচড়াপাড়া, কলিকাতা হইতে বজবজ পর্য্যন্ত যত বিদেশী কারখানা আছে তাতে। কলিকাতায় আমদানি রপ্তানির যে সব বিদেশী আফিস আছে তাতেও তারা কাজ পাইয়াছে। আমরা এখন যারা কলিকাতায় আছি কেবল তারা নয়, আমাদের আগে যারা কলিকাতায় আসিয়াছে, গিয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে মানুষ বলিয়া যে কয়জন লোককে আমরা পাইয়াছি তাদের যদি তথ্য-তালিকা লইয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—পাশ্চাত্য "রুধির" এই সবের পিছনে কর্ম্ম করিয়াছে ও করিতেছে। এই রুধির হইতেছে বিদেশী পুঁজি। এই বিদেশী পুঁজি আমাদের যুবক বাংলার অনেক কিছুই গড়িয়া তুলিয়াছে। কোদালকে কোদাল বলিব। বলিতেছি, বিলাতী মূলধন যুবক বাংলাকে অনেকাংশে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা আজ যে অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছি সে অবস্থায় আমাদিগকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবে কে,—এ প্রশ্নটী গভীরভাবে খতাইয়া দেখা দরকার। যে মুহূর্ত্তে আমি বিদেশী মূলধনের কথা বলি, সকলে ভাবে —"লোকটা গোলামের বাচ্চা"। আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি গোলামের বাচ্চা। কোন প্রতিবাদ করিতে চাই না। গত ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশের মহা মহা পণ্ডিত, আর যাঁরা লক্ষপতি,

ক্রোরপতি, তাঁরা বলিয়া আসিতেছেন যে "বিদেশী মূলধন খারাপ, বিষস্বরূপ, না আনাই ভাল"। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, "আপনারা দেশকে বেশী ভালবাসেন, না কোনো একটা মতকে বেশী ভালবাসেন"? যদি বলেন "মতটাকে বেশী ভালবাসি" তাহা হইলে আমার বলিবার কিছু নাই। আর যদি বলেন "দেশকে বেশী ভালবাসি," তাহা হইলে আমার যুক্তি অতি সোজা। দেশকে ভালবাসার অর্থ, যেখানে পাঁচ জন লোক দুবেলা খায়, সেখানে পাঁচ হাজার লোকের তিন বেলার খাওয়ার বন্দো স্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে বলিব যে, যে প্রণালীগুলি আমাদেরকে কাজ যোগাইতেছে,—যার ফলে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর আমাদের বিপুল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই প্রণালীগুলাকেই আরও বাড়াইয়া দেওয়া চাই। আমাদের মধ্যবিত্তেরা অনেকাংশে যদি বিদেশী মূলধনে গঠিত, বিদেশী কর্ম্মকেন্দ্রের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিদেশী পুঁজির পরিমাণ বাড়াইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামানা আর ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করাই স্বদেশ-সেবার অন্যতম কাজ।

অবশ্য ভারতীয় লোকগুলাকে "পুঁজিপতি" করিয়া তুলিবার চেষ্টায়ও আমি প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছি। তার জন্য সহরে গাঁয়ে ছোট বড় মাঝারি ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা আমি আর্থিক উন্নতির একটা বড় উপায়ই বিবেচনা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদেশী পুঁজির প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন কতটা গড়িয়া উঠিয়াছে আর ভবিষ্যতেও কতটা গড়িয়া উঠিতে পারে সেই সম্বন্ধে চোখ কান বুঁজিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কোদালকে কোদালই বলিতেছি।

এখন বক্তব্য এই,—যে সুযোগ পাইয়া আমি, তুমি, যদু, মধু, আবদুল, ইসমাইল, রামা, শ্যামা মানুষ হইয়াছি সেই শক্তি ও সুযোগ-

গুলিকে লক্ষলক্ষ নরনারীর মধ্যে ছড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছি কিনা। স্বদেশসেবার কষ্টিপাথর একমাত্র তাই। আপনি যদি টেকনিক্যাল ইস্কুলে পড়িয়া নিজের মাথাটা খুলিতে পারেন এবং তার সাহায্যে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, মমতা ইত্যাদি শিখিয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে কি বলিবেন না যে, আপনার মত আরো তিন লক্ষ মানুষ যারা রহিয়াছে তাদের কাছেও সেই সব সুযোগ আসুক? শেকস্পীয়র-গ্যেটে পড়িয়া, নিউটনের অঙ্ক কষিয়া যদি আপনি এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কবি, লেখক হইয়া থাকিতে পারেন, এবং এভাবে পাচ-সাতশ' লোক যদি বিদেশের আওতায় মানুষ হইয়া থাকে তবে সেই সুযোগ পাচ-সাত-দশ লাখ, পাচ-সাত-দশ কোটী লোকের কাছে কেন লইয়া যাইবেন না? আমরা সে লাইনে চিন্তা করি না কেন? এই বিদেশী পুঁজি গেল আমার দ্বিতীয় খুঁটা।

ভারতে পুঁজির খতিয়ান

এইবার বস্তুনিষ্ঠভাবে ভারতে খাটানো পুঁজির খতিয়ান করা যাউক। ১৯২৮-২৯ সনের রিপোর্ট অনুসারে বৃটিশভারত এবং মহীশূর বড়োদা গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৬ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে।

নূতন রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানীর "অনুজ্ঞাত" (অথরাইজ্ড্) মূলধন শতকরা ৫৫·৮ ভাগ বাড়িয়াছে এবং অংশ-আদায়ী (পেড্আপ্) মূলধন ৯·৭ ভাগ কমিয়াছে। এই বৎসর রেজিষ্টারীকৃত প্রাইভেট কোম্পানীর সংখ্যা ২৭৭ কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১৯৪।

কোম্পানী রেজিষ্টারী করিবার আইন অনুসারে ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত যে-সব অংশদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাদের

মোট সংখ্যা ১৪,৫২৩। ইহাদের মধ্যে ৬,৩৩০টি কোম্পানী অর্থাৎ রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানীর মোট সমষ্টির শতকরা ৪৩'৬ ভাগ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে। অবশিষ্টগুলি হয় গুটানো হইয়াছে, নয় চলে নাই অথবা আদৌ কাজ আরম্ভ করে নাই। ভারতের সমস্ত রেজিষ্টারী-করা কোম্পানীরই মূলধন টাকায় পরিমিত হয়।

কার্য্যশীল কোম্পানীগুলির সংখ্যা এবং তাহাদের লাগান মূলধন ১৯২১-২২ আর ১৯২৮-২৯ সালে নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল :—

	১৯২১-২২	১৯২৮-২৯
কোম্পানীর সংখ্যা	৫,১৮৯	৬,৩৩০
অনুজ্ঞাত মূলধন	৭,৫৪,৫৪,৮২ হাজার টাকা	৬,৪১,৪০,১০ হাজার টাকা
অংশ-আদায়ী মূলধন	২,৩০,৫৪,৮৯ হাজার টাকা	২,৭৯,৩০,৮১ হাজার টাকা

১৯২৭-২৮ সনের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর সংখ্যা ৫০০টা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১১ কোটি অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ অনুজ্ঞাত মূলধন বাড়িয়াছে ও প্রায় ২ কোটি ৮৭ লক্ষ পেড্ আপ মূলধনের বৃদ্ধি হইয়াছে।

সাতাশ কোটি ৩৮ লক্ষ অনুজ্ঞাত মূলধন এবং ৭৮ লক্ষ অংশ-আদায়ী মূলধন-বিশিষ্ট ৭২৬টি নূতন কোম্পানী বৃটিশ ভারত এবং মহীশূর, বড়োদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ১১ লক্ষ অনুজ্ঞাত মূলধনবিশিষ্ট এবং ২৮ হাজার টাকা পেড্-আপ পুঁজিশীল তিনটি কোম্পানী আদালতের আদেশ-অনুসারে পুনর্ব্বার কাজে নামিয়াছে।

বৃটিশভারত এবং মহীশূর, বড়োদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর

ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১৩,৭২ লক্ষ টাকার অনুজ্ঞাত মূলধন এবং ৫,৪৯ লক্ষ টাকার অংশ-আদায়ী মূলধন-বিশিষ্ট ২২৯টি কোম্পানী কাজ বন্ধ করিয়াছে।

চল্লিশটি কোম্পানীর অনুজ্ঞাত মূলধন ৩,০৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে এবং ১৪টি কোম্পানীর ৬,০৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ১২৪৯টি কোম্পানীর অংশ-আদায়ী মূলধন ১০,৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং ১৬৫টি কোম্পানীর ৩,০৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

অংশ-আদায়ী মূলধনের খরচখরচাবাদে বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ২,৮৬ লক্ষ টাকা। সমগ্র অংশ-আদায়ী মূলধনের শতকরা ৭৪ ৫৮ ভাগ বাংলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে বিভক্ত।

ব্যাঙ্কিং, লোন, ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট, এবং বীমা কোম্পানীগুলিতে খাটানো অংশ-আদায়ী মূলধনের সমষ্টি ২৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ বাংলা প্রেসিডেন্সির রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানীতে এবং ৩১ ভাগ বোম্বাইয়ে, ১২ মাদ্রাজে এবং ৭ গোয়ালিয়রে। বীমা কোম্পানী-গুলির অনুজ্ঞাত মূলধন ও অংশ-আদায়ী মূলধনের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

যান বাহন বিষয়ক কোম্পানীগুলির অংশ-আদায়ী মূলধন ২১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৫ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৭৪ ভাগ রেলওয়ে ও ট্রামওয়েতে খাটে। শেষোক্তগুলিতে যে মূলধন খাটিয়াছে তাহার সমষ্টির মধ্যে বোম্বাইয়ে উঠিয়াছে প্রায় ৮,৪৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৫৬ ভাগ এবং বাংলায় উঠিয়াছে ৬,৬০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৪ ভাগ।

ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীগুলির অংশ-আদায়ী মূলধন ৯০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৪,৯৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ পাবলিক সার্ভিস কোম্পানীতে খাটানো হইয়াছে। ৬,৭৯ লক্ষ টাকা

এজেন্সিতে, ৪,৩২ লক্ষ টাকা লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ-নির্ম্মাণে, ৩,৮৩ লক্ষ টাকা মাটি সিমেণ্ট ও বাড়ী-নির্ম্মাণের অন্যান্য মশলায় এবং ৩,১০ লক্ষ টাকা এঞ্জিনিয়ারিংএ খাটিতেছে।

সমগ্র অংশ-আদায়া মূলধনের এক-চতুর্থ (৭১,৯৮ লক্ষ টাকা খাটিয়াছে মিল ও প্রেসে,—তূলা, পাট, পশম ও রেশম চাপ দেওয়ার কাজে। বোম্বাইয়ের অনেকগুলি মিল ও প্রেস রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। তাহাদের মূলধন সমগ্রের প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ (৩১,৭৩ লক্ষ টাকা)। এই টাকার অধিকাংশ কাপড়ের কল, রেশম ও পশমের কল এবং প্রেসে খাটিতেছে। বাংলার রেজিষ্টারী-করা কল ও প্রেসের (প্রধানতঃ পাটের) মূলধন বোম্বাইয়ের প্রেস ও কলে খাটানো মূলধনের শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ (২৩,৪২ লক্ষ টাকা)।

চা, কাফি ও অন্যান্য কোম্পানী-শাসিত "বাগানে" ১৩,৫০ লক্ষ টাকা অংশ-আদায়ী মূলধন খাটে। ইহার মধ্যে ১০,৪৪ লক্ষ টাকা বাংলায়। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতবর্ষে যে সব চায়ের বাগান আছে, তাহাদের স্বত্বাধিকারী কোম্পানীগুলির অধিকাংশই কলিকাতায় রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

পাথর ও কয়লা প্রভৃতি খনির কোম্পানীগুলির অংশ আদায়ী মূলধন ৪০,২১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ (১০ কোটি টাকা) বাংলায় রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানীগুলিতে খাটানো হইয়াছে। তাহার অধিকাংশই খাটিয়াছে কয়লার খনিতে। ১০,৭৫ লক্ষ টাকার অংশ-আদায়ী মূলধন খাটিয়াছে লোহার খনিতে এবং ২,৬৭ লক্ষ টাকা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীতে। শেষোক্তগুলি প্রধানতঃ বর্ম্মাতেই কাজ করে।

ভারতের পুঁজির দৌড় এই পর্য্যন্ত। কোন্ পুঁজিটা স্বদেশী-মার্কা আর কোন্ পুঁজিটা বিদেশী-মার্কা তাহা কোনো কোনো কোম্পানীর নাম শুনিলেই অনেকটা বুঝা সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই পুঁজির

"জাতি" আন্দাজ করা কঠিন। তবে একটা কথা অতি সোজা। পুঁজিটা যে জাতেরই হউক না কেন,—তাহার দৌলতে অন্নবস্ত্র জুটিতেছে বহু-সংখ্যক ভারতীয় নরনারীর। পুঁজি-নিষ্ঠার "জাতিহীনতা" এই হিসাবে অতি জবর। তাহার অন্যান্য আর্থিক এবং সামাজিক প্রভাবও আছে। সে কথা সম্প্রতি তুলিব না।

মুসলমানের বিদ্রোহ

তৃতীয় খুঁটা লইয়া দাঁড়াইলে আমাকে আপনারা রাখিবেন না। কথাটা এই,—আপনারা আজ যে সময় ভাবিতেছেন মুসলমান আর হিন্দু দুজন দুপথে চলিতে বাধ্য, মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে এক মতলবে, অবিকল ঠিক তার উল্টা মতলবে হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে—আমি ঠিক সেই সময়ে বলিতেছি হিন্দু এবং মুসলমানের মিলন অবশ্যম্ভাবী। এই ধরণের হেঁয়ালী এর আগেও ঝাড়িয়াছি। ১৯০৫।৭ সনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে হিন্দু-মুসলমানে ঠিক এই রকম মারামারি চলিত। আজকাল যখন-তখন যেখানে-সেখানে ছোরা বসাইয়া দেওয়ার রেওয়াজ দেখিতেছি, তখন এ রকম ছিল না। তবে আক্রমণ-লড়াই ঠিকই চলিত। সে সময় বলিয়াছি —ছাপার হরপে খোদা আছে—এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিবে—এমন কি অমুক অমুক ঘটনা ঘটিবে তাও আমি বলিয়াছিলাম, হিন্দু-মুসলমান একে অন্যের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বাধ্য হইবে। সেই যুগের রচনা "নব্য ভারত" মাসিকে বাহির হইয়াছে। আজ ১৯২৭ সনে যে গণ্ডগোল চলিতেছে তাকে ফেনাইয়া তুলিয়া আমাদের জননায়কেরা সকলে নিজ নিজ দর্শন গড়িয়া তুলিতেছেন। আমার দর্শনও আমি গড়িয়া তুলিতে অধিকারী। আমার বিবেচনায় এই মুসলমান, আর এই হিন্দু, এক ভারতসন্তান বলিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবে। কাজেই মুসলমানের বিদ্রোহ-ঘটিত ভারতীয় অনৈক্যে আমি ভয় পাই না।

অনৈক্যের লাভালাভ

যুক্তির একটা কথা শুধু বলিব। সেটা এই। রামা আর শ্যামা লোকের সামনে গলাগলি করিয়া চলে। লোকেরা মনে করে দুজনে খুব ভাব। কিন্তু বাহির হইতে যখন তারা ঘরে আসে, তখন দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ঘটনায় তাদের ঝগড়া ঝাঁটি ধরা পড়ে। আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলি। যৌথ-পরিবার নামে একটা বস্তু আছে। আমাদের দেশে মামা, খুড়া, বাপ, দাদা, মাসতুত ভাইয়ের স্ত্রী, খুড়তুতো ভাই, শালা শালী, মেসো, পিসে, নানান রকম সম্বন্ধের নরনারী এই পরিবারে জটলা করে। বাহিরের লোকেরা সকলে ভাবে বাঙালী পরিবারগুলো মহাসুখে আছে, আহা কি মধুর সম্বন্ধ! ভিতরে যখন প্রবেশ করি তখন কি দেখিতে পাই? সকাল ৫টা হইতে রাত ১১।১২ টা পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে খাওয়া-খাওয়ি আর চুলোচুলি। সত্য কথা কিনা? কেবল বাংলাদেশে নয়, অনেক দেশেই এই দৃশ্য দেখিয়াছি। মামা মামী মেসো খুড়ো ভাই দাদা যার সঙ্গে এক গৃহস্থালাতে লোকেরা রহিয়াছে, বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের যখন আলাপ হয় তখন তারা এক, ঠিক যেন পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডব! কিন্তু অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কি পর্য্যন্ত ঝগড়া বিবাদ তাদের মধ্যে হয় তার কেবল একটা দৃষ্টান্ত দিব।

মায়ে আর ছেলেতে সম্বন্ধ, তার চেয়ে সোজা জিনিষ আর হইতে পারে না। বিদেশের এক জজ-পরিবারের কথা বলিতেছি। দুই ছেলে, এক মেয়ে, কর্ত্রী বিধবা, তাদের বাড়ীতে একটা কুকুর আছে। আমরা বাঙালী যেমন তুতু করিয়া ডাকিলে কুকুরটা কাছে আসে ঠিক তেমনি এরাও কুকুরকে ডাকে। মেয়ে ডাকে, ছেলে ডাকে, মা ডাকে। ঘটনা চক্রে এমন হইয়াছে ছেলেটী যখন ডাকে কুকুরটা তার কাছে যায় আগে। সে সময় যদি মা কি আর কেহ ডাকে তার কাছে না গিয়া ছেলের কাছেই

যায়। কাণ্ডটা এইরূপ সামান্য। এটা মায়ের কাছে ভয়ানক হিংসার কারণ হইয়া উঠিল। তার ফলে কুকুরকে ডাকাডাকি লইয়াই যে রাগের কারণ শেষ হইয়া যায়, তা নয়। পাড়ায় যখন বেড়াইতে যায় তখন মা বলে "কি আর বল্‌ব? আমার কি আর ইজ্জৎ আছে? এই দেখুন কুকুরটা পর্য্যন্ত আমাকে সম্মান করে না, ছেলেকে সম্মান করে।" অতি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলাম, এ সম্বন্ধে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চাই না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে দেখিতে পাই সকল দেশেই, বাইরে খুব ভাব, ভিতরে গিয়া দেখুন, সদ্ভাব বলিয়া কোনো বস্তু নাই। একদম ভাব নাই তা বলিতেছি না। বলিতেছি প্রায়ই ভাবের যথেষ্ট খাঁকৃতি আছে। আসল কথা,—যেখানে মনে করি খুব ভাব সেখানে ভাবের খুব অভাব থাকিতে পারে। সে অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া যায় আর বলিয়া দেওয়া হয় "তুই থাক্ এখানে, আর তুই ওখানে থাক্, দুয়ের এক জায়গায় থাকার দরকার নাই" তাহা হইলে বিবাদের কারণ অনেকটা ঘুচিয়া যায়। তাই বলিতেছি এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটু ভাগাভাগি হইলে সেটা ভবিষ্যতে হয়ত মিলনেরই সোপান হইয়া দাঁড়াইবে। হিন্দুও দোষেগুণে মানুষ, মুসলমানও দোষেগুণে মানুষ। যতটা আমরা ভাবি হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য ছিল বা আছে ঠিক ততটা সত্য না হইতে পারে। অন্ততঃ বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান খাওয়া-খাওয়ি করিতেছে। সেটা আজ বাজনা লইয়া, কাল এ জিনিষ, পরশু ও জিনিষ লইয়া দেখা দিয়াছে,—যার ফলে এখন খুনোখুনি পর্য্যন্ত চলিতেছে। এখন কি কিছু কালের জন্য তাদের ভাগাভাগি হইয়া থাকা মন্দ নয়? ঐক্য ঐক্য করিয়া চেঁচাইলেই ঐক্য পয়দা হইবে না।

আত্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশ

তাদের মধ্যে বাস্তবিক বন্ধুত্বের যখন অভাব, ভাগাভাগির কোন না কোন কারণ যখন আছেই, তখন ভাগাভাগি করিয়া দেওয়াই ভাল। ঘা কাটিয়া তার দূষিত অংশ বাহির করিয়া দেওয়া দরকার। এর ফল কি হইবে? যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান দুজনেই আত্মচৈতন্যশীল হইতে সুরু করিবে। হিন্দু বুঝিবে "আমার দৌড় এ পর্য্যন্ত, এর বেশী আমি যাইতে পারিব না"। মুসলমানও জানিবে "আমার দৌড় এ পর্য্যন্ত, তার বেশী আমি যাইতে পারি না"। যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান প্রত্যেকে নিজের কর্ম্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের দৌড় বুঝিবে। তখন এ আসিয়া বলিবে "সেলাম আলেকুম," আর জবাবে ও বলিবে "আলেকুম সেলাম।"

দুজনে আসল বুঝা-পড়ার মিল সুরু হইবে। যদি সন্ধি করিতে হয়, আত্মচৈতন্যশীল হিসাবে ব্যক্তিত্বপূর্ণ হিসাবে করা উচিত। তার আগে নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ঐক্যের ব্যবস্থা এক প্রকার অসম্ভব। জোর জবরদস্তি করিয়া ঐক্যের সভা কায়েম করিলে ভিতরে খুঁত থাকিয়া যাইতে পারে। তুমি ভাবিবে তুমি বুঝি ঠকিতেছ, সে ভাবিবে সে বুঝি ঠকিতেছে। এই ঝকমারির ঐক্যে লাভ নাই। কিন্তু বিরোধ আর অনৈক্যের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এ বুঝুক যে তার দৌড় এ পর্য্যন্ত, ও বুঝুক যে তার দৌড় ও পর্য্যন্ত। ব্যস! পরস্পর হাড়ে হাড়ে বুঝুক, "ওকে না পাইলে আমার চলে না, আমাকে না হইলে ওর চলে না।" এইরূপ অনৈক্যের ভিতর দিয়া যে ঐক্য আসে সেটা নিবিড় হইয়া আসে। সেই জন্যই বলিতেছি যারা ঐক্য ঐক্য বলিয়া বক্তৃতা করে তারা ঐক্য আনিতে পারে না। অনৈক্যকে যারা পরিষ্কার করিয়া দেখিয়াছে তারা ঐক্যের পথ গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

সমাজ-গঠনে চুক্তি-যোগ

এখানে আর একটা কথা বলিতে চাই। এই পৃথিবীতে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক জায়গায় সংসার সমাজ জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোনো জায়গায় জিনিষটা নিবিড় ভাবে গড়িয়া উঠে না,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগুলা স্বাতন্ত্র্যশীল, নিজ নিজ অভাব সম্বন্ধে জ্ঞানশীল না হয়। আপনারা রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি পড়িয়াছেন, হেগেল কঁৎ মিল ইত্যাদির ফিলজফি পড়িয়াছেন। তাঁরা কেউ কেউ শিখাইতেছেন সমাজ জিনিষটা ঠিক যেন গাছের মত বা জানোয়ারের মত একটা জৈবিক বস্তু,—আপনাআপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। গাছ গাছড়া জীব-জন্তু ইত্যাদির অঙ্গে অঙ্গে স্বাভাবিক যেমন যোগ আছে, সমাজেও যেন ঠিক তেমন। পৃথিবীতে যত জাতি আছে,—যেমন ইংরেজ জাতি, ফরাসী জাতি, সবই এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের জোরে জমাট হইয়া বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ মত আমরা সকলেই আওড়াইতে শিখিয়াছি।

আমি বলি এ ধারণাটা প্রায় সম্পূর্ণ ভুল। এ মতটাকে আমি বড় জোর একটা "হাইপথেসিস" বা আন্দাজ বলিয়া মনে করি। কিন্তু বিজ্ঞান-রাজ্যের অনেক হাইপথেসিস যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে টেঁকসই হয় না এটাও ঠিক তেমনি। এই ক্ষেত্রে আমার মতে টেঁকসই হইবে সেই চিন্তা-প্রণালী যে চিন্তা-প্রণালী বলে—এই যে মানুষ পাঁচজন এক জায়গায় জমা হইয়াছে এরা কোনো একটা সূক্ষ্ম বা গভীর "মিষ্টিসিজম"এর টানে আসে নাই, তথাকথিত গূঢ় রহস্যের বা আত্মিক সম্বন্ধের জোরে আসে নাই। এরা আসিয়াছে প্রধানতঃ পরস্পর-পরস্পরের অভাবমোচনের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিয়া। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ যে মুহূর্ত্তে একটা "চুক্তির" উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেই মুহূর্ত্তে সম্বন্ধটা নিবিড় হইয়া উঠে। সেই

সম্বন্ধ যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমাজের বনিয়াদ যথার্থ নিরেট। এমন কি স্ত্রী-স্বামীর সম্বন্ধটাও আসলে চুক্তির সম্বন্ধ। ভিতরের কথা এই, "আমার তোকে না হইলে চলে না, তোরও আমাকে না হইলে চলে না। অতএব বহুত আচ্ছা, লাগিয়া যা জোড়া"। এইটুকুই হইতেছে বিবাহ-বন্ধনের আসল দর্শন। এই যে যোগ এর নাম আইনে কন্‌ট্রাক্ট, যাকে বলে চুক্তি।

মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্যান্ত এই ধরণের চুক্তি সমাজে সমাজে, দেশে দেশে চলিয়া আসিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিগুলি ঐতিহাসিক তথ্য নয়। জার্ম্মাণরা আসিয়া বলিল—"আয় এখন সমাজ গড়া যাউক" কিংবা ঋগ্‌বেদের ঋষি সিন্ধু তীরে আসিয়া বলিল—"আয় এখানে সমাজ গড়িয়া তুলি" ইত্যাদি সমাজ-বন্ধনের তেমন সনতারিখ-ওয়ালা দলিল নাই। কিন্তু ওই ধরণের চুক্তি-মূলক সম্বন্ধ যেখানে যেখানে রহিয়াছে সেখানে সেখানে সমাজ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে প্রত্যেক সমাজ-বন্ধনের ভিতর চুক্তি অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু কাজ করে।

মুসলমান দুনিয়া সম্বন্ধে চাই হিন্দু বিশেষজ্ঞ

এখন, হিন্দু-মুসলমানে ভাগাভাগি হওয়ার পর তারা যখন তাদের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্ম-চৈতন্যশীল হইতে থাকিবে তখন তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলনের অভাব বেশ করিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিবে। যখন আবার তারা দুজনে এক হইতে চাহিবে, তখন আমি বলিব, এই যে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে, এটা নিবিড় এটা টেঁকসই। ধরা যাউক,—কোনো দেশে কয়েকজনে মিলিয়া একটা কোম্পানী খাড়া করিল, একত্র হইয়া জার্ম্মানি হইতে যন্ত্রপাতি আনিল,

এর ভিতর দর্শন কতটুকু? চুক্তি ছাড়া আর কিছু আছে কি? নাই। কোম্পানী গঠনই হউক, কি বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক, কি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট কায়েম করাই হউক, কি কারখানা হউক, কি সমাজ, কি রাষ্ট্র হউক, দার্শনিক হিসাবে সব কিছু কায়েম করাই এক। সবই পরস্পর বুঝাপড়ার উপর, সমঝৌতার উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে ঐক্য আসিবে,—যখন মুসলমানেরা নিজের চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর হিন্দুও নিজের চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে মুসলমানের কর্ত্তব্য কি এখানে বলিতে চাহি না। আমি হিন্দু হিসাবে হিন্দুর কর্ত্তব্য আলোচনা করিতেছি। শুধু এইটুকু বলিতে চাই,—হিন্দুর পক্ষে আজ বিশেষ দরকার, মুসলমানের সাহিত্য ও মুসলমানের ভাষা ভাল করিয়া আলোচনা করা। এই কথাটা হয়ত অনেকে অতিমাত্রায় খারাপ ভাবিবেন। যে সময় মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া চরমে উঠিয়াছে সে সময় বলিতেছি কিনা তাদের ভাষাটা পড়;—আরবী, ফার্শী আর উর্দ্দু এই তিন ভাষা বাংলার হিন্দুকে নিজ কব্জায় আনিতে বলিতেছি। আমার মতে, মুসলমানদের সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একমাত্র মুসলমানই থাকিবে, এটা বাঙালী হিন্দুর পক্ষে ঘোরতর লজ্জার কথা। যুবক ভারত ফরাসী শেখে, জার্ম্মান শেখে, জাপানী শেখে, এটা করে ওটা ধরে, দুনিয়ার নানাদেশে কিছু না কিছু করিতেছে। এই যে বিশাল মুসলমান দুনিয়া, মধ্য এশিয়া, রুশিয়া, চীন, মরক্কো, ঈজিপ্ট, তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে ছড়াইয়া রহিয়াছে—এ ছোট দুনিয়া নয়। এ দুনিয়ার খবর যুবক হিন্দু রাখিবে না? এর খবর দিবার অধিকার একমাত্র মুসলমানের হাতে থাকিবে? বাঙালীর মগজটা এই দিক হইতে মেরামত করা দরকার।

বিষয়টা তলাইয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে, হিন্দুর পক্ষে আর

মুসলমানের পক্ষে ও। একটা বিপুল মুসলমান দুনিয়া আছে। তার ভিতর ঐক্য মোটেই নাই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ধারণা, মুসলমানেরা ভয়ানক ঐক্যগ্রথিত। যে মুহূর্ত্তে আমরা আরবী, ফার্শী আর উর্দ্দু পড়িতে আরম্ভ করিব সেই মুহূর্ত্তে বুঝিব মুসলমান-ঐক্য বলিয়া সংসারে যে একটা কথা রটিয়াছে তাতে কোনো বস্তু নাই। এই বস্তু-জ্ঞান বাঙ্গালীর ভিতর ছড়াইবার জন্য বাংলাদেশের জেলায় জেলায় অন্ততঃ পাঁচ সাত জন করিয়া মুসলমান-দুনিয়া সম্বন্ধে হিন্দু বিশেষজ্ঞ কায়েম করা উচিত। এর ফলাফল সম্প্রতি আলোচনা করিতে চাই না। আমার বিশ্বাস, ভারতীয় মুসলমান সমাজে মোস্‌লেম জগতের অনৈক্য সম্বন্ধে জ্ঞানটা বাড়িতে থাকিলে মুসলমানদেরও উপকার বিস্তর।

ঈজিপ্টের মুসলমান, তুর্কীর মুসলমান, পারস্যের মুসলমান, আফগানিস্থানের মুসলমান, আর চীনের মুসলমান,—ইত্যাদি দুনিয়ার নানা দেশের মুসলমানের সঙ্গে দহরম মহরম আমার কিছু কিছু চলিয়াছে। তাদের হৃদয় আমার খানিকটা জানা আছে। তারা অনেকে আমায় বলিয়াছে—"ভাই হিন্দু, দেশে গিয়া তোদের মুসলমানকে ভারত-মুখো হইতে বলিস। আমরা ঈজিপ্টের কথাই ভাবি, আমরা তুর্কী-মুখো মুসলমান" ইত্যাদি। এই অনৈক্য-নীতি ভারতীয় মুসলমানের ভাল করিয়া বুঝা দরকার।

যুবক-ভারতে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতা

এইবার দেশোন্নতির চতুর্থ খুঁটা। আমি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বহুত্ববাদী, কিন্তু যে জায়গায় প্রায় পুরাপুরি ঐক্যবাদী সেটা হইতেছে এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যুবক ভারতের একমাত্র দীক্ষাগুরু। খোলাখুলি একথা বলিতে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়, শুনিতে আরো বিশ্রী লাগে। কিন্তু আমাদের বাংলায় সকলের চাইতে বেশী যিনি হিন্দুত্বের প্রতিনিধি

ছিলেন,—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি,—তাঁর বই খুলিয়া দেখিবেন। তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আসল কাজ,—যদিও বাহির থেকে সেটা তত স্পষ্ট নয়। তিনি লিখিয়াছেন "গ্রীসের ইতিহাস"। তিনি লিখিয়াছেন "রোমের ইতিহাস"। তিনি লিখিয়াছেন "ইংলণ্ডের ইতিহাস"। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে আনিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, যে কোনো শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথাই বলুন যাঁদের লইয়া আমরা গৌরব করি, তাঁরা মানুষ হইয়াছেন পোণে ষোল আনা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে।

একথাটা খোলাখুলি স্বীকার করা অনেকের চিন্তায় কিছু অপমান-জনক। সেইজন্য আজ পর্য্যন্ত বাজারে দাঁড়াইয়া কেহ একথা বলিতে চাহেন নাই। বরং আমাদের লোকেরা বলিয়াছেন যে, আমাদের ভারতীয় সভ্যতার দ্বারাই আমরা মানুষ হইয়াছি। কথাটা তলাইয়া দেখা দরকার। এই বিষয়েও মগজ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলিতেছি এই ত? মাঝে মাঝে সংস্কৃতও পড়িতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তার তর্জ্জমাও চালাইতেছি এবং তর্জ্জমার জন্য নানা সোসাইটী বা পরিষৎ বা প্রকাশক-ভবনও খাড়া হইয়াছে। এই ত? তাতে কি হইল? একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা বিবেকানন্দকে পূজা করি। তিনি বেদান্তবাদী, কিন্তু বেদান্ত কি বাংলাদেশে আর কেহ জানিত না? এক বিবেকানন্দই কি বেদান্ত জানিত? দেখিতে হইবে বিবেকানন্দের মধ্যে আরো কি জিনিষ ছিল যার ফলে মরিয়া যাইবার দশ বৎসরের ভিতর লোকে তাঁকে অবতার বলিতেছে। বিবেকানন্দের চেয়ে বেশী সংস্কৃত-জানা বেদান্তবাগীশ পণ্ডিত ভারতে আছে এবং ছিল। কিন্তু তিনি

সংস্কৃত জানেন বা বেদান্ত জানেন সেইজন্য লোকের পূজা পান নাই। তাঁর জীবনে একটা দস্তুল ছিল,—যা না থাকিলে বিবেকানন্দের ব ও থাকিত না আনন্দও থাকিত না। সেই দস্তুলটী কি? উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতা। খোলাখুলি একথা স্বীকার করা আমি মনে করি দেশোন্নতির একটি মস্ত খুঁটা।

তুর্ক-জাপানী কায়দা

তা যদি সত্য হয় তা হইলে দেখিতে হইবে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা আনিতেছে কে? আমরা ত আনি নাই। এখানেই তফাৎ জাপানীতে আর ভারতবাসীতে,—তুর্কে আর ভারতবাসীতে। তফাৎটা কোথায়? জাপান বুঝিয়াছিল, সূর্য্য পূবদিকে উঠে না, সূর্য্য ওঠে পশ্চিমে। চোখের ঠুলি খুলিয়া এ সত্য তারা বুঝিয়াছে। আমরা ভারতে বুঝিয়াছি তার ঠিক উল্টা। তুর্কী ঠিক জানিয়াছে সূর্য্য যদি উঠে, ত উঠে ভূমধ্য আর আটলান্টিক সাগরের পারে, প্রশান্ত সাগর বা আরবসাগরের পারে উঠে না। ভূমধ্য বা আটলান্টিক সাগর যে পাড়ি দিতে পারিবে সে সূর্য্যরশ্মি কিছু কিছু দেখিবে, এটা তুর্ক বুঝিয়াছে—বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বুঝিয়াছে। কোদালকে কোদাল বলিয়া বুঝিয়াছে। তারা বলে, "এই পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের গুরু। একে যদি হজম করিতে পারি, পাশ্চাত্যের সঙ্গে সেলাম আলেকুম ঠুকিতে পারি, ওদেরকে কুর্ণিশ করিতে পারি, ত ওরাও একদিন আমাদের কুর্ণিশ করিবে, আলেকুম সেলাম করিবে এবং আমরা তাদের সমানে সমানে চলিতে পারিব, তা ছাড়া উপায় নাই।

এখানে বক্তব্য, জাপান আর তুর্কীর প্রণালী যা, আমাদের প্রণালী তার উল্টা। জাপান আর তুর্কী যখন দেখে—ফরাসী বা মার্কিণ আজ

এরোপ্লেন চালাইতেছে, যেই টেলিগ্রামে খবর আসিল, অমনি তারা পাঁচ জনকে পাঠাইল। বলিয়া দিল, "দেখিয়া আয় ব্যাপার কি?" তারা চলিয়া গেল নিউইয়র্কে বা প্যারিসে। সেখানে গিয়া কেউ এরোপ্লেন খুঁজিতেছে, কেউ নক্সা আঁকিতেছে, ছবি তুলিতেছে। ক্রমশঃ কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সব দল বাঁধিয়া আসিয়া হাজির। আমরা কি করিতেছি? একশ' দেড়শ' বৎসর ইংরেজের অধীন রহিয়াছি। আমরা ত তা করি নাই। ইংরেজ আমাদের দেশে মেডিক্যাল ইস্কুল করিল। আমাদের মেজাজ, কে যাইবে মেডিক্যাল ইস্কুলে? গেলে ধর্ম্ম যাইবে যে! অনেক কষ্টে-সৃষ্টে আমাদেরকে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকানো হইল। এমন কি যেই সেখানে ঢুকিলাম, তোপ পর্য্যন্ত নাকি পড়িয়াছিল। জলের কল আসিল, আমরা আনি নাই, আনিয়াছে ওরা। এক্ষেত্রেও মেজাজ আমাদের বিচিত্র,—জলের কল স্পর্শ করিব না, জাত যাইবে।

হিন্দু ধর্ম্মের যারা গোঁড়া তাঁরাই কি কেবল এই মেজাজ দেখাইয়াছেন? তা নয়। যাঁরা চরম সংস্কারক তাঁরাও অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে "অস্পৃশ্য" করিয়া রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাঁরাও বলিয়াছেন, "খবরদার, ছুঁসনি। পশ্চিমারা পাশবিক, অধার্ম্মিক। আমরা আধ্যাত্মিক। ছুয়ে বনিবে না।" কেবল গোঁড়া হিন্দুরা বকে তা নয়, ভারতের হিন্দু মুসলমান সকল সংস্কারকই সমানভাবে এ গোঁড়ামি চালাইয়াছে। জাপানের প্রণালী কি? ধরুন অটোমোবিল। জাপানীরা এটা বিদেশ থেকে নিজেই লইয়া আসিল। এরা বুঝিয়াছে, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেল গাড়ী ইত্যাদির পরের ধাপ হইল অটোমোবিল। এই ধরণের ধাপে যেই উঠিল তখন নিজ বিদ্যায় যদি না কুলায় তা হইলে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ইত্যাদিকে ভাড়া করিয়া লইয়া

আসে। বলে, "এখানে আসিয়া কাজ কর, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-সাত-দশ জন জাপানীকে শেখাও। না শিখাইলে তাড়াইয়া দিব।"

এই যে শ' দেড়েক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে আসিয়াছে, বিষ হউক অমৃত হউক, এ খাইয়া আমরা মানুষ হইয়াছি। এ প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। যে প্রণালীতে আমরা মানুষ হইয়াছি সে প্রণালী কি ছাড়িয়া দিব? আজ ১৯২৭ সনে তা করিলে চলিবে না। নিউটনের অঙ্ক কষিব না, হ্বিটম্যানের কাব্য কিছু নয়. ফরাসী ডাক্তারের কৌশল ছুইব না, আমেরিকান এঞ্জিনিয়ারের বিদ্যা শিখিব না, ইত্যাদি বদখেয়াল ছাড়িতে হইবে। চাই ভারতে আজ জাপানী তুর্ক মেজাজ।

বিদেশী সভ্যতার স্বদেশী বেপারী

প্রতি মুহূর্ত্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় ভাবে কায়েম করা আবশ্যক। অর্থাৎ যতগুলি জাহাজ বিদেশে যায় প্রত্যেক জাহাজে বাংলাদেশের ফি জেলা হইতে লোক যাওয়া চাই। কেন যাইবে? ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবে, মাষ্টার হইয়া আসিবে, ডাক্তার হইয়া আসিবে, দেশ বিদেশ হইতে ডিগ্রী লইয়া আসিবে ইত্যাদি লোভে সকলকে যাইতে বলিতেছি না। পাশ ফেল ডিগ্রী ডিপ্লোমার ধার আমি নিজে ধারি না। যারা এজন্য যাইতে চায় যাউক। তাদেরকে বাধা দিতে চাই না।

আমার মগজ কিন্তু অন্য ধরণের। আমাদের যারা এঞ্জিনিয়ারের ব্যবসাতে লাগিয়া রহিয়াছে, যারা ওকালতী করে, ডাক্তারী করে, যারা খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা করে, যারা ছবি আঁকে, গান গায়,- যারা পাঁচ-সাত বৎসর ধরিয়া নিজ নিজ ব্যবসায় কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তারা বাংলাদেশ হইতে বিদেশে যাক এই আমার ইচ্ছা। তারা যাইবে, ইয়োরামেরিকার নানা দেশে গিয়া দেখিবে। কি দেখিবে?

যে-ব্যবসায় যে পণ্ডিত সেই ব্যবসায় সে দেখিবে ঐ সকল দেশ কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং কি উপায়ে সে সব ব্যবসাতে বেশী লাভ করার সম্ভাবনা আছে। বিদেশে গিয়া ইস্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ছাত্রবৃত্তি বা অন্য কোনো পাশের দরকার নাই। পাঁচ-সাত বৎসর বিদেশে বসবাস করিয়া নিজ নিজ লাইনে কাজ চালাইতে হইবে। তার পর তারা নতুন নতুন জিনিষ-গুলিকে যদি আমদানী করিয়া আনিতে পারে তা হইলে বলিব যে—রামমোহন রায় হইতে আশুতোষ পর্য্যন্ত যে যুগ চলিয়া আসিয়াছে সেই যুগকে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ বিবেচনা করিয়া একটা নয়া যুগ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে।

নব যুগ গড়িয়া তুলিতে হইলে সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা হইতে দশ জন করিয়া লোক বাছাই করা দরকার। এঞ্জিনিয়ার, গায়ক, লেখক, উকিল, ডাক্তার, এই রকম ধরণের দশ জন লোক প্রত্যেক জেলা হইতে বাছাই করা দরকার। বয়স বেশী হইলে চলিবে না,—২৮ হইতে ৩২ এর মধ্যে হওয়া চাই—৩০ই ধরা যাউক। ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠাইবার জন্য যদি এই ধরণের একটা ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় তা হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতখানি আমদানী করা আবশ্যক সে কথা বলার মত বাঙালী আগামী পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যে অনেক মিলিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন যা ভারতে আমদানী হইতেছে তা বিদেশীর মারফতে আসিতেছে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের হাতে নাই। বিদেশীরা অটোমোবিল আনিয়া হাজির করে। তারপর চলে রাস্তায় বিজ্ঞাপন। এতে এ হইতেছে, ও হইতেছে ইত্যাদি ব্যাখ্যা সুরু হয়। অটোমোবিল যন্ত্রটা কিন্তু আমরা বুঝি না। জাপানের অবস্থা তা নয়। তারা প্যারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিনে গিয়া ছোট বড়

মাঝারা সব সমঝিয়া, সস্তা দেখিয়া মজবুত দেখিয়া বলে, "এ জিনিষ লইব, ও জিনিষ লইব না।" সে রকম নিজে বাছাই করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাংলাদেশে আমদানী করা দরকার। যা লইয়া আমাদের দেশের রামা শ্যামা পণ্ডিত হইয়াছে,—আবদুল ইসমাইল মানুষ হইয়াছে,—যাদের লইয়া বাংলাদেশ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে, তারা বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিয়াছে। তাতে যদি তারা এত বড় হইয়া থাকিতে পারে তবে সেই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এখন নিজেদের লোক পাঠাইয়া নিজ হাতে বাছাই করিয়া আনিলে তার দ্বারা কি না সম্ভব হইতে পারে?

সোজা কথা এই,—কমসে কম দশ জন লোক প্রত্যেক জেলা হইতে পাঠানো দরকার। ব্যাপারটা গুরুতর। যাইতে আসিতে লাগে হাজার দুই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তারা একবারে নেহাৎ ছাত্র ভাবে যাইবে না, —বিদেশে গিয়া লোকজনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। আলাপ পরিচয় করিতে হইবে। তাদের সঙ্গে খাইতে হইবে, তাদেরকে খাওয়াইতে হইবে। অন্ততঃ সাড়ে তিন চার বৎসর যদি থাকিতে হয়, থাকিবে। এখন যে রকম খরচ ওসব দেশে, গড়পড়তা তাতে লোক প্রতি দশ হাজার করিয়া টাকা লাগিবার কথা। তা হইলে এই দশ জন লোকের জন্য প্রতি জেলা হইতে এক লাখ করিয়া টাকা তোলা চাই।

কলিকাতার আধিপত্য আমি পছন্দ করি না। মফঃস্বলই আসল জীবন কেন্দ্র। প্রত্যেক জেলার দশজনের ভিতর শূদ্র বৈশ্য যত রকম জাত আছে সব থাকিবে। বামুন টামুন বুঝি না। এঞ্জিনিয়ার উকিল ডাক্তার প্রত্যেক জেলা হইতে এই ধরণের দশ জনের জন্য যদি একটা লাখ করিয়া টাকা খরচ করা যায়, তা হইলে "আঙ্গুর ফল খাট্টা নয়, আঙ্গুর ফল মিঠেই বটে," এই কথার পেছনে যে যুক্তি, যে তর্ক-বিজ্ঞান আছে বাংলাদেশের ভিতর সেই যুক্তিশাস্ত্র সেই বস্তুনিষ্ঠা আমাদের একটা জাতীয় সম্পদ হইয়া

উঠিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চিন্তা প্রণালী না গজাইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের দেশোন্নতি এক প্রকার অসম্ভব।

সেই নব্যন্যায়ের কচকচানিতে আপনাদের যার যেরূপ মর্জ্জি তাঁরা সেরূপ যোগ দিন। যুবক বাংলার সকল ইস্কুলমাষ্টারকেই অবশ্য আমি বস্তুনিষ্ঠার এই দেশচর্চ্চায় মগজ খেলাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমার কর্ত্তব্য সম্প্রতি এইখানেই খতম। এইবার আপনাদের পালা।

স্বদেশ-সেবার নব্য-ন্যায় *

মানুষের মুড়োর বেপারী

কলিকাতার বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়ানো আমার কিছু কিছু অভ্যাস আছে। আপনারা দেখিয়াছেন কিনা জানি না, আমি দেখিয়াছি কোনো কোনো মেছুনি মাছের মুড়োর কারবার করে, মুড়ো সাজাইয়া রাখে, কোনোটা কাতলা, কোনোটা বোয়াল, কোনোটা রুই ইত্যাদি। কারো ইচ্ছা হয় দাঁড়াইয়া দেখে, কারো ইচ্ছা হয় কিনে, কেহ বা ওদিকে তাকায়ও না। ঘটনাচক্রে এই মেছুনির ব্যবসার সঙ্গে আমার ব্যবসার কিছু সাম্য আছে। আমার ব্যবসাও মুড়োর ব্যবসা, তবে সে মুড়ো মাছেরও নয়, পাঁঠারও নয়, ভেড়ারও নয়। এ হইতেছে মানুষের মুড়োর কারবার। অবশ্য মুড়োগুলোকে রক্ষাকালীর বাচ্চার মতন থালায় সাজাইয়া রাখিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো অথবা মা জগদম্বার মতন মুণ্ডমালা পরিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচা আমার কারবার নয়।

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বিবরণ (আগষ্ট ১৯২৭)। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

আমার কারবার মুড়োগুলিকে জরীপ করা। প্রথমেই দেখি মাথার ভিতর ঘি কতটা আছে, কোন্ দিকে মাথাটা চলিতেছে ডাইনে কি বাঁয়ে। পুরাণো মগজগুলিতে কি রকম চিন্তা কিলবিল করিত, এখনকার গুলিতেই বা কি রকম করে। দ্বিতীয় নম্বর কারবার হইতেছে মানুষের মুড়োগুলির বাড়া-কমা তদ্‌বির করিয়া বেড়ানো। কে বড় হইল, —কে ছোট হইল, কোন্ মুড়োটা পচিয়া গিয়াছে, কোন্ মুড়োটা নতুন কিছু করিয়া ছাড়িবে এই সব খোঁজ করা আমার মুড়ো-তদবির করার সামিল। তৃতীয় নম্বর হইতেছে—মানুষের মুড়োর চাষ চালানো। মগজগুলিকে ঘাড়ের উপর ঠিক খাড়া রাখিয়াই তার আবাদ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এই ব্যবসার অন্তর্গত।

ন্যায়-শাস্ত্রের জন্ম,—জীবনের অভিজ্ঞতায়

আজ যে কথা বলিতেছি তাতে কাজের কথা পাইবেন না, কোনো কাজের ফন্দ লইয়া এখানে দাঁড়াই নাই। নতুন ঢঙের কতকগুলি মুড়ো আবাদ করা যায় কিনা তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আজকার কাজ। অর্থাৎ নতুন রংএর চিন্তাপ্রণালী বা নতুন ধরণের খেয়াল আজকার আলোচ্য বস্তু। এরই নাম নব্য-ন্যায়।

আমরা সকলেই ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেই নৈয়ায়িক। কিন্তু মামুলি ন্যায়শাস্ত্রে আর আমি যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা করি তাতে আকাশপাতাল প্রভেদ। আপনাদের ন্যায়শাস্ত্র থাকে কেতাবে, বিশ্বকোষে—আলমারীতে টেবিল চেয়ারে, ইস্কুল মাষ্টারের দপ্তরে, বড় বড় পণ্ডিতের ঘরে। আর আমি যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা চালাইয়া থাকি সেটা বিরাজ করে রামা-শ্যামার হাঁড়িকুঁড়ির ভিতর, মুড়িমুড়কির ভিতর, প্রতিদিনকার খাওয়াদাওয়ার ভিতর, প্রত্যেক মানুষের উঠাবসার ভিতর।

যখন দেখিতে পাই মজুরের সঙ্গে মনিবের কিছু কোন্দল চলিতেছে তখনই বুঝি কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র চুয়াইয়া পড়িতেছে। আবার যখন মেথরের সঙ্গে মোলাকাৎ হয় তখন কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র দখল করি। রিক্‌শওয়ালার সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা বলিয়া তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হই তখন দেখি যে খানিকটা ন্যায়শাস্ত্র আমার প্রাণে পদার্পণ করিতেছে। যখন স্বামা-স্ত্রার ঝগড়া চলিতে থাকে তখনও আবার নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া খানিকটা ন্যায়শাস্ত্র আমি পাকড়াও করিতে পারি।

এই ধরণে যখন যেখানে মানুষের প্রাণ, মানুষের ছায়া, মানুষের আশা, মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখিতে পাই, তখন সেখানে কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র আমার সঙ্গে দেখা করে। দেখিতেই পাইতেছেন—ঝালে ঝোলে অম্বলে, ছেলেছোকরাদের হষ্টেলে-মেসে, ষ্টীমার-খালাসাদের ইউনিয়নে, কেরাণীদের ঘোটমঙ্গলে,—যত রাজ্যের জায়গায় হইতে পারে,—সর্ব্বত্র চলিতেছে আমার ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা। প্রত্যেক বিন্দু মাথার ঘাম আর প্রত্যেক মাংসপেশীর নড়নচড়ন এক একটা ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিমূর্ত্তি। অর্থাৎ এই যে মানব-জীবন, মানুষের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, এর কোথাও ন্যায়শাস্ত্র বাদ পড়ে না। কাজেই বুঝা যাইতেছে মামুলি ন্যায়শাস্ত্রে আর আমার ন্যায়শাস্ত্রে প্রভেদ কত বড়।

স্বদেশ-সেবা ও স্বরাজ-সাধনা

আমি আজকে স্বদেশ-সেবার কথা বলিতেছি, স্বরাজ-সাধনা বা স্বরাজ-সেবার কথা বলিতেছি না। এখানে মামুলি ন্যায়শাস্ত্রে আর নব্য-ন্যায়ে একটা বড় প্রভেদ। মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তায় স্বরাজ-সাধনা ও স্বদেশ-সেবা প্রায় এক বস্তু। আলজেব্রায় "ইকুয়েশন" বা সাম্যের চিহ্ন ব্যবহার করা দস্তুর। তেমনি মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের বিধানে স্বরাজ-সেবা আর স্বদেশ-সেবা ঠিক যেন একই সাম্য-সংযোগের দুই তরফ মাত্র।

কিন্তু নব্য-ন্যায় বলিতেছে—এই "ইকুয়েশন" বা সাম্য-সম্বন্ধটা সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কিনা সন্দেহ। এই দুই জিনিষে কমসে কম তিন চার রকম পরস্পর সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া সম্ভব, যথা—(১) স্বদেশ সেবা যে করিতেছে সে হয়ত স্বরাজ কোনো দিন নাও আনিতে পারে (২) যে লোকটা স্বরাজ স্বরাজ করিয়া বেড়ায় সে লোকটা হয়ত একদম স্বদেশ-সেবক নয়। (৩) স্বদেশ সেবা করিতে করিতেই স্বরাজটাকে আনিয়া হাজির করা হয়ত একদম অসম্ভব নয়। (৪) স্বরাজ-সেবকেরা কেহ কেহ হয়ত স্বদেশ-সেবকও বটে।

দেখাই যাইতেছে যে, আমি তর্কশাস্ত্রের কচকচানির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। মোটের উপর যখন-তখন যেখানে-সেখানে স্বরাজসাধনা আর স্বদেশ-সেবাকে একার্থক বিবেচনা করার বিরুদ্ধে একটা সন্দেহ সৃষ্টি করা নব্য-ন্যায়ের বিপুল কাজ। এই সংশয়-বাদ যদি জাগিয়া উঠে তা হইলে বুঝিব নব্য-ন্যায়ের কাজটা চলিতেছে ভাল।

বিদেশ-দক্ষতা ও স্বদেশ-সেবা

আগেই বলিয়াছি যে, আমার ন্যায়-শাস্ত্র যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়—ইস্তক জেলখানা পর্য্যন্ত। সুভাষ বাহির হইয়া আসিল জেলখানা হইতে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের লোক আসিয়া হাজির আমার কাছে। বলিল "নানা লোকে নানা প্রকার মত দিতেছে। তোর কি বক্তব্য?" জবাব দিলাম,—"সুভাষ, যাও চলিয়া ইয়োরোপে, যাও চলিয়া আমেরিকায়, যাও চলিয়া জাপানে" ইত্যাদি। মজার কথা, সেই সময়ে দেশের লোকে সকলে বলিতেছে—টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম, চিঠির পর চিঠি আসিতেছে, সকলে বলিতেছে—"যাক বাঁচা গেল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল।" অতএব বুঝুন নব্য-ন্যায়ে আর মামুলি ন্যায়ে তফাৎ

কতটা। তারপর দেশের লোক সকলে সুভাষকে পরামর্শ দিতেছে, বলিতেছে, "সুভাষ, লাগিয়া যা আবার দেশের কাজে।" নব্য ন্যায় অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফতে বলিয়াছিল,—"সুভাষ, থাকো ভুলিয়া দেশটাকে ২।৪।৫।৭ বৎসরের জন্য।" অবশ্য আমার কথাটা শুনিবার জন্য তার মাথা ব্যথা পড়ে নাই। বুঝুন মামুলি ন্যায়ে আর নব্য-ন্যায়ে ফারাক কি মারাত্মক রকমের।

সরকারী তদন্তগুলার ধরণ-ধারণ

প্রশ্ন হইতেছে—নব্য-ন্যায় এতটা বিদেশী-আন্দোলন, দুনিয়া-দক্ষতা, বিশ্ব-নিষ্ঠা প্রচার করিতেছে কেন? কথাটা অতি সোজা। একটা দৃষ্টান্তে পরিষ্কার হইবে। ১৯১৫ হইতে ১৯২৭ সন এই এগার-বার বৎসরের ভিতর আপনারা দেখিয়াছেন গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি কমিশন বসাইয়াছে। একটার নাম শিল্প (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল) কমিশন আর একটার নাম খাজনা তদন্ত সমিতি (ট্যাক্সেশ্যন এন্কোয়ারী কমিটি), আর একটার নাম আর্থিক অনুসন্ধান সমিতি (ইকনমিক এন্কোয়ারী কমিটি), একটার নাম শুল্ক তদন্ত সমিতি আর একটার নাম কারেন্সী কমিশন। এই সবগুলা আমার বিদেশে থাকার সময় বসিয়াছিল। আসিয়া দেখিতেছি কৃষি-কমিশন বসিল। কালকে হয়ত বসিবে শাসনপ্রণালী সম্পর্কীয় (কনষ্টিটিউশন্যাল) কমিশন। এই পাচ সাতটা কমিশন আপনারা চোখের সাম্নে দেখিতেছেন বসিয়াছে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই কমিশনগুলির কার্য্য প্রণালী কিরূপ? প্রথমতঃ, এই কমিশনের সভায় দুই ধরণের লোক বসে:— (১) ইংরেজ, সাদা চামড়াওয়ালা, (২) ভারত সন্তান। এই কমিশন-গুলির ভিতর দেখিতে পাইতেছেন—বিদেশী আদমি রহিয়াছে। আপনারা

বলিতে পারেন—দেশটা যখন সাদা চামড়াওয়ালাদের তখন কমিশনগুলির ভিতর বিদেশী মুড়ো থাকিবে তাতে আশ্চর্য্য কি ? এখানে বলিতে চাই কারণটা কি তার আলোচনার প্রয়োজন নাই, দেখিতেই পাইতেছেন—বর্ত্তমান ভারতটাকে চালাইবার জন্য যে-কয়টা অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছে, তার ভিতর কতকগুলি বিদেশী মুড়ো আছেই আছে। এই গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ এই কমিশনগুলির কাজকর্ম্ম কিছু বিচিত্র রকমের। ওরা ভারতবর্ষের এক একটা সহরে আসিয়া কতকগুলি লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে, সাক্ষীর জবানবন্দী লয়। কিন্তু মাত্র এতে সানায় না। কমিশন ভারতের অনুসন্ধান খতম করিয়া ইংরেজ সমাজে যায়। সেখানে গিয়া ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-যম সকলকে ডাকিয়া বলে, "ভারতবর্ষে একটা কিছু করা হইতেছে, তোদের কি মতামত ? কি করিলে দেশটা উন্নত হইবে মনে করিস ?" তার পর মাসতুত ভাই মার্কিণকে ডাকিয়া পাঠায়। ফরাসী জার্ম্মাণ ইতালিয়ানদের এখনো বড় একটা ডাকে না। তবে দুনিয়ার মাথাওয়ালা লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলানো একটা প্রধান দস্তুর বেশ বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে উন্নত করিবার জন্য যতগুলি প্রণালী আছে তার ভিতর একটা প্রণালী হইতেছে বিদেশী মুড়োগুলির মতামত গ্রহণ করা।

তার পর কমিশনের রিপোর্ট ছাপা হইয়া বাহির হয়। সেই রিপোর্টে কি থাকে ? বাঙ্গালীরা কয়জন সেই রিপোর্ট পড়িয়া দেখেন জানিনা। তবে আমাদের খবরের কাগজওয়ালারা অবশ্য সে সব পড়িতে বাধ্য। সূচাপত্র খুলিলে দেখা যায় যে, ভারত বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এ কথা ত থাকেই, তার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের রিপোর্ট-গুলোয় আর একটা নতুন জিনিষ থাকে কিছু কিছু। সেটা হইতেছে

ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, আমেরিকান, জাপানী ইত্যাদি সমাজ ট্যাক্স সম্বন্ধে, শিক্ষা সম্বন্ধে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে, কবে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল ও তার ফলাফল কি হইয়াছে। আর আজকাল তারা বর্ত্তমানযুগের উপযোগী কোন্ আইন চালাইতেছে তারও একটা চুম্বক দেওয়া থাকে। দেখুন দেশটা হইতেছে ভারতবর্ষ। কিন্তু কমিশন বসিতেছে "ঘরে বাইরে।" তার পর প্রকাশ করা হইতেছে দুনিয়ার আর্থিক, রাষ্ট্রিক কিম্বা সামাজিক উন্নতি-অবনতির ইতিহাসের এক ছটাক। এইরূপ দেশী বিদেশী তথ্য-পঞ্জিকা রূপে রিপোর্টগুলা আমাদের সকলের কাছে আসিয়া হাজির হয়।

রামচন্দ্র মল্লিক, হরিহর পোদ্দার, ইস্‌মাইল, আবদুল ইত্যাদি লেখক-পাঠক-সম্পাদক সাংবাদিক-উকিল-বক্তা সকলকেই বইগুলার খতিয়ান করা দরকার হয়। প্রশ্ন হইতেছে এই বইগুলা আমরা ভালরকম বুঝি কি? খবরের কাগজওয়ালাদের যখন জিজ্ঞাসা করি "ট্যাক্স সম্বন্ধে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কি মত দিতেছ ভায়া?" তখন সাধারণতঃ তারা বলিয়া থাকে, "আরে ভাই, এ সব আমরা বুঝি টুঝি না। এসব বিশেষজ্ঞের জিনিষ। আমরা খবরের কাগজ চালাই, এ বিষয়ে আমরা এক্স্‌পার্ট নই।" খবরের কাগজওয়ালারা হয়ত বা অতিমাত্রায় বিনয়ী। এই জন্যই হয়ত এতটা নম্রতা। তবে আমি আমাদের কাগজগুলা পড়ি, বিদেশেও এগুলো পড়িয়াছি। এই সব কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে দেখিতেছি যে, বাঙ্গালী লেখক নিজ নাম সই করিয়া "স্বাধীন" সমালোচনা ছাপে নাই। পাঁচ-সাত কমিশন হইয়া গেল। কিন্তু কোনো সমালোচনা, স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক—বাঙ্গালীর কলমে বাহির হইয়াছে কি? হয়ত বা কিছু কিছু বাঙ্গালীর লেখা স্বাধীন সমালোচনা বাহির হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমার নজরে বড় একটা পড়ে নাই।

যাক্ সে কথা। রিপোর্টগুলার সমালোচনা করা কিরূপ কাজ?

ধরা যাক্ একখানি বই আছে। তার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে বলিবার অধিকার হয় কখন? বইএর ভিতর যে মাল আছে তা যখন দখল করিতে পারি তখন: স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলিতে হয় বইএর মালটা আগে হজম করিতে হইবে। পাঠকদের ভিতর যারা স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিতেছে তাদের হয়ত বা এই বইএর মাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, তা নইলে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। এ অতি সোজা কথা। বইটা বুঝিতে হইলে কিকি জানা দরকার? অনেক কিছু; কিন্তু প্রধানতঃ দুনিয়া, কেননা ইংরেজেরা, ফরাসীরা, জার্ম্মানরা, মার্কিণরা, জাপানীরা ১৯১৮ সন হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত এই এই করিয়াছে, ১৯২৬।২৭ সনে এই এই কাজ করিতে চাহিতেছে এ সব কথা রিপোর্টগুলায় লেখা থাকে। এ সম্বন্ধে সমালোচনা হইতে পারে কখন? আমি যদি জানি যে জার্ম্মানি ১৯১৮ সনে বাস্তবিক পক্ষে অমুক অমুক কাজ করিয়াছে, জাপান ১৯২৫ সনে এই এই করিয়াছে, ১৯২৫ সনে ইংরেজেরা অমুক ধরণের কাজ করিয়াছে তবেই এই সকল তথ্যবিষয়ক বইয়ের সমালোচনা করা সম্ভব।

থাকো ভুলে' দেশটাকে কয়েক বৎসর

যখন সুভাষকে বল্লাম—"থাকো ভুলিয়া দেশকে বছর কয়েক, আর যাও চলিয়া ইয়োরোপে আমেরিকায় জাপানে" তখন গোটা ভারতের অনেককেই একথা বলিয়াছি। ভারতের নরনারীকে ঠেলিয়া তুলিবার কলই হইতেছে বিদেশ-নিষ্ঠা। এই দুনিয়া-নিষ্ঠার যুক্তিশাস্ত্রটা আরও তলাইয়া বুঝা যাক। মামুলি ছাত্রের মতন বিদেশ হইতে ডিগ্রী আনিবার কথা বলিতেছি না। যে লোকটা দেশেই এল এ, বি-এ, পাশ-ফেল করিয়াছে, অথবা যে লোকটা বিদেশ হইতে ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছে, যে লোকটা

এম. বি,এল, এল ডি,পাশ টাশ করিবার পর দুচার বৎসর কাজ করিয়াছে উকিল ভাবে, ডাক্তার ভাবে, ব্যাঙ্কার ভাবে, গবেষক ভাবে, খবরের কাগজের সম্পাদক ভাবে, লেখক ভাবে,—যে ভাবেই হউক কাজ করিয়াছে—বলা হইতেছে তাকে বিদেশে যাইতে। দেশে-বিদেশে লেখাপড়া করিবার পর কাজকম্ম করিয়াছে—তারপর জেল খাটিয়াছে—সেটাও কাজের মত কাজ—যতগুলি গুণ বা অভিজ্ঞতা থাকা দরকার দেখিতে পাইতেছি সুভাষের আছে সব। তার উপর আর একটা চীজ তার আছে যা অন্যান্য অনেক গুণবানের নাই—সে হইতেছে ট্যাকে পয়সা। এর মতন লোক যদি তিনচার বৎসর বিদেশে থাকিতে চায় অথবা দু' দু' বছর পর কয়েক মাসের জন্য বিদেশে ভবঘুরেগিরি করিতে চায় ত পরের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের মতন গরীবের বেলায় সব কাজেই প্রথম প্রশ্ন হইতেছে "রূপচাঁদ"।

রূপচাঁদ যদি থাকিত তা হইলে যুবক বাংলায় অন্ততঃ পাঁচশ' জন "গুণবান্" আছে যারা বিদেশে গিয়া নানা অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়া আসিলে দেশটাকে ঠেলিয়া অনেক উঁচুতে তুলিতে পারিত। জাপানের জাহাজ, ফরাসী বিজলী, বিলাতী টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল, আমেরিকার কৃষি এই সব কর্ম্মক্ষেত্রের ধুরন্ধরদের সঙ্গে কাজ করিয়া দুতিন বৎসর পর পর যদি বাঙালীরা ফিরিয়া আসিতে পারিত তা হইলে গোটা বাংলা দেশ বুঝিত,—এর নাম আমেরিকা, তার নাম ফ্রান্স, ওর নাম জার্ম্মাণি ইত্যাদি। এই রকম পাকা লোক যদি বাংলা দেশে শ পাচেক থাকে তা হইলে তারা ঐযে পাঁচসাতটি কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে সে সব দেখিবামাত্র টকাটক বলিয়া দিবে,—"লেখকেরা এখানে জুয়াচুরী চালাইয়াছে, ওখানে ঠিক আছে। ১৯০৯ সনে বাস্তবিক জার্ম্মাণরা এ কাজটা করিয়াছিল, ফরাসী ঠিক সেইদিন অন্য পথে চলিয়াছিল ইত্যাদি।

কথা হইতেছে, বিদেশ-দক্ষতা আর বিশ্বনিষ্ঠা আমাদের ভারতে দেশোন্নতির একটা মস্ত বড় কর্ম্মশক্তি।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জার্ম্মাণি বনাম ইংল্যাণ্ড

আজকাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কয়জন বাঙালী বা ভারতবাসী এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছে? রামচন্দ্র মল্লিক আর হরিহর পোদ্দার, হরিহর পোদ্দার আর রামচন্দ্র মল্লিক, ইসমাইল আর আবতুল, আবতুল আর ইসমাইল। ব্যস্। এই পর্য্যন্ত। কজনের নাম করা হইল? তুজন, চারজন না আটজনের? যে কজনেরই হউক,—এই কয়টা নামও বাস্তবিক পক্ষে গোটা বাঙলায় টুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোনো বাঙালী "স্বাধীনভাবে" এ পর্য্যন্ত কিছু বলিয়াছে কিনা সন্দেহ। যদি ভারতে কেহ কিছু বলিয়া থাকে তারা বোধ হয় সকলেই অ-বাঙালী। গুনতিতেও তারা তুচারজনমাত্র। তবে একথাও জানা আবশ্যক যে, তারাও যা কিছু বলিয়াছে সবই বিদেশ সম্বন্ধে তাদের যতটুকু জ্ঞান আছে তারই জোরে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ভারতে স্বদেশ-সেবক হিসাবে পাকা লোক মাত্র সেই কয়জন যাদের বিদেশী ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী আর ধরণ-ধারণ অল্পবিস্তর জানা আছে,—বই পড়িয়াই হউক বা বিদেশে গিয়াই হউক।

যাক্, এই ব্যাঙ্কটা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে তু-একটা কথা বলিয়া যাইতেছি। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" নামটা আসিয়াছে আমেরিকা হইতে। কিন্তু এর যা-কিছু কাম—সে সমস্ত আসিয়াছে জার্ম্মাণি থেকে। অথচ রিপোর্টের ভিতর কোনো জায়গায় জার্ম্মানির নাম পর্য্যন্ত আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু রগড়ের কথা জার্ম্মানি এই প্রণালীটা পাইল কোথায়?

১৮৭৫ সনে জার্ম্মানি একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করে। তারা দেখিল ইংরেজ ১৮৪৪ সনে ঐ রকম কারবার করিয়াছিল। সেটা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া

চলিয়া আসিতেছে। তার সঙ্গে ফরাসীদের অভিজ্ঞতা তুলনা করিয়া জার্ম্মাণি বুঝিল যে, ব্যাঙ্ক খাড়া করিতে হইলে ইংরেজকে নজীর করিতে হইবে। ইংরেজকে নজীর করিয়া জার্ম্মাণি এমন কতকগুলি নতুন প্রণালী চালাইয়া দিল যার সঙ্গে ইংরেজের কোনো সম্বন্ধ নাই। সোজা কথায়,—ইংরেজের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতেছে অতিমাত্রায় স্থিতিশীল, আর ব্যাঙ্ককে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা দরকার ইংরেজ সে সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সতর্ক। জার্ম্মাণি সে সব ত অবলম্বন করিয়াছেই, তাছাড়া স্থিতিশীলতা বদলাইয়া তারা ব্যাঙ্কটাকে গতিশীল করিয়াছে। ইংরেজ যা করিয়াছে সমস্ত হজম করিয়া তার পরের ধাপে গিয়া জার্ম্মাণি পৌঁছিয়াছে।

তার বৎসর দশেক পর জাপান ঐ রকম একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করিয়াছে। জাপান দেখিল, জার্ম্মাণির উপর যাওয়া সম্ভব নয়। তারা একেবারে হুবহু নকল করিয়া বসাইয়া দিল জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক জাপানী নামে। তার প্রায় বৎসর আঠাশেক পর, ১৯১৩ সনে আমেরিকা যখন ব্যাঙ্ক খাড়া করিতে গেল সে দেখিল ফরাসী প্রণালী চলিবে না আর ইংরেজের প্রণালীটা ঠিক তার উল্টা। ফরাসীরা অতিমাত্রায় গতিশীল, আর ইংরেজ তার একদম অপর পিঠ, অতিমাত্রায় বাঁধাবাঁধির দাস। মার্কিণরা জার্ম্মাণির ঘাড়ে গিয়া পড়িল, কেন না জার্ম্মাণি একটা মাঝামাঝির পথ আবিষ্কার করিয়াছে। আমাদের কমিশনে যে দেশী-বিদেশী মুড়ো ছিল তারা জার্ম্মাণির নামও করে নাই। তারা আমেরিকার মতামত লইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত নাম দিয়াছে মার্কিণ ধাঁচে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কিন্তু কর্ম্মপ্রণালীটা লইয়াছে জার্ম্মাণি থেকে,—বোধ হয় বা অজ্ঞাতসারেই!

আগেই বলিয়াছি—জাপানী, মার্কিণ আর জার্ম্মাণের প্রণালী হইতেছে ইংরেজ প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত,—সেটা হইতে উন্নত। আমি বলিতে

চাহিতেছি—ভারতের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন বসাইয়াছে তাতে এক্তিয়ার থাকা সত্ত্বেও তারা ইংরেজ প্রণালীটা লয় নাই। যে প্রণালীটা আজ দুনিয়ায় টেকসই বলিয়া জগতের লোক স্বীকার করে—গতিশীল ব্যাঙ্ক —সেই প্রণালী তারা ভারতবর্ষে আনিয়া হাজির করিতে চায়। কোনো বাঙালী বোধ হয় "স্বাধীন" ভাবে তার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে সমালোচনা করে নাই। তবে বাঙ্‌লাদেশে আর ভারতে এমন লোক আছে যারা গবর্ণমেণ্ট যা করিতেছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেই বলিবে। বাঙ্‌লার বাইরে যারা আলোচনা করিতেছে তারা বলিয়াছে "এই কমিশন থেকে যখন একটা গতিপন্থী ব্যাঙ্কের মেসোবিদা বাহির হইয়াছে তখন এর ভিতর ইংরেজদের নিশ্চয়ই শয়তানি বুদ্ধি আছে। আমরা ঐ প্রণালী চাই না। আমরা চাই স্থিতিশীল বিলাতী প্রথার ব্যাঙ্ক!" যাচ্‌চলে' ১৮৪৪ খ্রীঃএর মান্ধাতার আমলের যে ব্যাঙ্ক প্রণালী তাকে নতুন গড়ন দিয়া জার্ম্মাণি জাপান আমেরিকা একটা ভাল কিছু খাড়া করিল, আর আমাদের স্বদেশ-সেবকগণ স্থির করিলেন তার বিরুদ্ধে বলিতেই হইবে। এর ফলাফল আমার আলোচ্য নয়। আমি কাজের কথা কিছু বলিতেছি না, বলিয়াছি স্বদেশসেবার শুধু আলোচনা-প্রণালীটা বিশ্লেষণ করিতে চাই।

বিশ্ব-নিষ্ঠার যুক্তিশাস্ত্র

সেটা হইতেছে এই। ভারতবর্ষে যে সব কাজ চলিতেছে তার যদি সমালোচক হইতে চাহেন, তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলিতে চাহেন অথবা দেশটাকে যদি হিড় হিড় করিয়া চিন্তাক্ষেত্রে আর কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহেন তা হইলে আপনাকে বিশ্ব-দক্ষতায় পাকিয়া উঠিতে হইবে। কোন্ মতটা ভাল, কোন্ মতটা খারাপ আর কোন্ প্রণালীতেই বা কাজ করিতে হইবে সে কথা সম্প্রতি বলিতেছি না।

বলিতেছি—স্বদেশ-সেবকের পক্ষে চাই বিশ্ব-দক্ষতা। নব্য-ন্যায় বিশ্ব-নিষ্ঠার সূত্র প্রচার করিতেছে নিম্নরূপ :—

শত সহস্র শক্ত মাথা যে চাহিছে এই দুনিয়া,
হৃদয় যাদের হেলায় টানিবে সারা বিশ্বের হিয়া।
চুম্বক লাগাবে পুরোণো গ্রীসেতে মিশরে ও এশিয়ায়,
জাপ-জার্ম্মাণ-ইংরেজে আর ইয়োরামেরিকায়।
স্বদেশের মাপকাঠিতে বিচার চাহে না শক্তিধরে,
তার বিদ্যাবুদ্ধি হবে নিরূপিত বিংশ শতাব্দী করে।
হজম করে যে বিদেশকে বেশী সেই তো স্বদেশী খাঁটি,
দেশের বোলচাল ছেড়ে' দেখাবে সে শত কাজ পরিপাটি।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন

এইবার দেখাইতেছি নব্য-ন্যায়ের আর এক মূর্ত্তি। ফেল মারিয়াছে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের আড়কাটী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাঙ্কের দরজায় ত খিল দেওয়া হইয়াছে। এখন কি বলিতে চাহিস্?" দেশের লোক তখন হায় হায় করিতেছে, হা হুতাশ ছাড়া কথা নাই। আমি বলিয়া দিলাম, "আজ এই মুহূর্ত্তে আমাদের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাত।" নব্য-ন্যায়ে আর মামূলী ন্যায়ে বামুন-শূদ্দুর ফারাক।

এতদিন আমাদের দেশে যে কেহ যা কিছু স্বদেশী করিয়াছে তাকেই আমরা মনে করিয়াছি পাড়। "অমুক লোক নামজাদা, বাপরে! তার সমালোচনা করিস না," এই ছিল আমাদের চিন্তার ঢং। ঢাক ঢাক গুড় গুড়। "অমুক ফণ্ডে অমুক লোক একবার তিনশ টাকা দিয়াছে। ভবিষ্যতেও হয়ত আবার দুচার পয়সা দিবে। অতএব যা চাপিয়া। তার

দোষগুলা বাজারে নাই বাহির হইল।" এই রকম কেবল চাপিয়া যাওয়া আর চাপিয়া যাওয়া।

যখন একজন কেহ স্বদেশী-মার্কা হইলেন এবং তিনি কংগ্রেস টংগ্রেসে একটা বক্তৃতা করিলেন, আর যাইবে কোথায়? "দেশের নেতা" বনিয়া গেলেন! "নামজাদা লোক! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবি? আরে তা হইলে দেশের মুখে চুণ কালি পড়িবে যে!" এই চিন্তাপ্রণালী চলিতেছিল। সকলেই চাহেন তোয়াজ, প্রশংসা, গুণকীর্ত্তন আর পদলেহন। সমালোচনা বিশ্লেষণ, তুলনাসাধন, এ সবের ধার কেহই ধারিতেন না।

এহেন স্বর্ণযুগে,—যুবক বাঙ্‌লার জন্মকালে বিশ একুশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইয়াছিল সেটা একেবারে হাতে হাতে আত্ম-সমালোচনা লইয়া হাজির হইল। বাঙালীর সাধের এই স্বদেশী ব্যাঙ্ক বলিয়া দিল, "মধুর বহিবে বায়ু বেয়ে যাব রঙ্গে, মানব জীবন তা না। যে জিনিষটা নিজের হাতে গড়া তাকেও নিষ্ঠুরভাবে ভাঙ্গিতে শিখা দরকার। ভাঙ্গিয়া আর একটা কিছু গড়িতে হইবে। তার জন্য আবশ্যক এক প্রকার আধ্যাত্মিক চরিত্র-বল। যখন-তখন যাকে-তাকে স্বদেশ-নিষ্ঠ বলিয়া গড়াগড়ি করিয়াছিস! আহাম্মুক তোরা।" ইত্যাদি।

যখন সকলে বলিতেছে, "হায় বাংলা দেশের কি হইবে? বাংলাদেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য একদিনে ধূলিসাৎ হইল" নব্য-ন্যায় তখন বলিয়া দিল, "এই মুহূর্ত্তে বাংলাদেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য নিরেট বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল—শুধু বোলচালের উপর নয়। কেননা বাঙালীর গলদ খোলাখুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী আর নামজাদা লোক মাত্রের পা চাটিতে ঝুঁকিবে না, অথবা স্বদেশী শব্দে আহ্লাদে আটখানা হইবে না।"

মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-মাহাত্ম্য

আমরা মনে করি ১৯০৫ কিংবা ১৯১৫।২৫ সনে যে কয়টা লোক সভা-সমিতেতে বক্তৃতা করিয়াছে সেই কয়টা লোকই বাংলাদেশে একমাত্র "ন্যাশনাল"। যে লোকটা নিজের ঢাক পিটিতে পারে সেই লোকটাকেই দেশের লোক কর্ম্মবীর ও স্বদেশী নেতা বলিয়া থাকে। কিন্তু বিপদ হইতেছে, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মত শ'তিনেক কি সাড়ে তিন শ' ব্যাঙ্ক বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মজুত আছে।

একটা চরম কথা বলিতেছি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই ধরণের একশ' ব্যাঙ্কও যদি আজ পটল তুলে, তব্ বাঙ্গালীর ট্যাঁকে দু'শ আড়াইশ ব্যাঙ্ক থাকিবেই থাকিবে। আপনারা জানেন—মফঃস্বলে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে ১৩,০০০। এই যে শ'তিনেক ব্যাঙ্কের কথা বলিতেছি সে সব আলাদা, —খাঁটি জয়েণ্ট ষ্টক প্রণালীতে শাসিত। কাজেই আপনি যদি বলেন "হায়, সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, বাঙালীর মুখে চুণকালী পড়িল", আমি বলিব "এসব হইতেছে অতিরঞ্জিত কথা, —অবুঝের মত আবল-তাবল বকা।"

"মাড়োয়াড়ীরা" বলিতেছে "আহা, বাঙালীরা একটা ব্যাঙ্ক দাঁড় করাইয়াছিল, নষ্ট হইয়া গেল, দুঃখের কথা।" তারা সমবেদনা দেখাইতেছে। ইংরেজ বলিতেছে—"যুবক বাংলা ইংরেজের সঙ্গে, পার্শীর সঙ্গে টক্কর দিবে, যুবক বাংলা আপন পায়ে দাঁড়াইয়া আমাদের সঙ্গে সমানে সমানে চলিবে—সে জন্য একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করিয়াছিল। হায়, গেল। বড়ই আপশোষের কথা" ইত্যাদি। এই যে ইংরেজের ও মাড়োয়াড়ীর সমবেদনা —এতে যদি কোনো বাঙালী বিচলিত হন তা হইলে বুঝিব তিনি পুরোণো ন্যায়-শাস্ত্রের উপাসক।

নব্য-ন্যায়ের উপাসক যে হইবে সে বলিবে "বহিয়া গিয়াছে, যেটা গড়িয়াছিলাম সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি—তার কবরের উপর দাঁড়াইয়া

নতুন কিছু খাড়া করিয়া দেখাইব। এখন আমাদের যা কিছু আছে তারই জোরে বলিতে পারি বাঙালী জাতের ইজ্জৎ যায় নাই, বরং ১৯০৫ সনের তুলনায় ১৯২৭ সন স্বর্গের জিনিষ। ফরাসী জার্ম্মাণ ইংরেজ জাপানীর তুলনায় ১৯২৭ সনের বাংলা অতি সামান্য বটে, তবে ১৯০৫।১৯১৫ সনের বাংলায় যে কর্ম্মদক্ষতা শক্তিযোগ বা শিল্পনিষ্ঠা ছিল তার তুলনায় ১৯২৭ সনের বাংলা অনেক উঁচু।”

১৯১৪ সনের গোড়ায় আমি যে বাংলাদেশ ছাড়িয়া গিয়াছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় ও উঁচু বাংলা দেখিতেছি আজ বিদেশ থেকে ফিরিয়া আসিয়া,—সকল কর্ম্মক্ষেত্রে আর চিন্তাক্ষেত্রে। কাজেই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হইয়া গেল বলিয়া চীৎকার করা আর মাড়োয়াড়ী ও ইংরেজের “হায় বাঙালী জাতি, তোদের কি হইবে?”—ইত্যাদি কথা শুনিয়া ভীমরতি খাওয়া নব্য-ন্যায়ের দস্তুর নয়।

দেখিতে পাইতেছেন আগে আমি দুনিয়া নিষ্ঠার কথা, বিদেশ দক্ষতার, বিশ্ব-নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। এখন বলিতেছি মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-কৃতিত্ব, পল্লীর কীর্ত্তি। আমার নব্য-ন্যায়ের এক হাতে দুনিয়া,—আমেরিকা, জার্ম্মাণি, জাপান, আর এক হাতে পাড়াগাঁ, মফঃস্বল, পল্লী। আমি চাই রামপুরহাটের সঙ্গে প্যারিসের যোগাযোগ, বজবজের সঙ্গে নিউইয়র্কের আত্মীয়তা, বার্লিনের সঙ্গে নবাবগঞ্জের দহরম মহরম। বাংলার পল্লী-গ্রামের সঙ্গে দুনিয়ার, আর দুনিয়ার সঙ্গে বাঙালীর পল্লীগ্রামের নিবিড়তম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কায়েম করিতে পারিলে বুঝিতে পারিব দস্তুর মতন নব্য-ন্যায়ের কাজ চলিতেছে।

স্বাস্থ্য-নিষ্ঠা বনাম আর্থিক অবস্থা

এখন দফায় দফায় নব্য-ন্যায়ের প্রয়োগ দেখাইতেছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিংবা সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সম্বন্ধে যখন আমাদের কোনো গলদ বাহির হইয়া

পড়ে তখন কথায় কথায় আমরা আমাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলিয়া থাকি। "এত ম্যালেরিয়া কেন?" "খাইতে পাইতেছি না বলিয়া।" "এত পেটের অসুখ কেন?" "আমি গরীব মানুষ বলিয়া।" "তুই বিকাল বেলা ফুটবল খেলা দেখিতে যাসনা কেন?" "আমার অবস্থা খারাপ।" এ সব জবাব আমাদের ঠোঁটস্থ। যা কিছু আমাদের দূষণীয় কিংবা অন্য লোকের চক্ষে খারাপ তার সম্বন্ধেই একমাত্র বুলি আওড়াইতে থাকি। সোজা ওজর হইতেছে "দরিদ্র দেশ।" নব্য-ন্যায় বলিতেছে -"হয়ত এই ওজরে কিছু সত্য থাকিতে পারে—কিন্তু আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা সকল ক্ষেত্রে আমার স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য-কৌন্দর্য্যের একমাত্র কারণ নয়।"

আব্দুল খাইতে পায় না, হরিহর পোদ্দারও খাইতে পায় না। দুজনেই এক অফিসে চাকুরী করে, দুইয়েরই মাহিনা এক। কিন্তু দেখিতে পাই—আব্দুল তার ঘরটা যেমন সাজাইয়া রাখে হরিহর পোদ্দার তেমন সাজায় না। আব্দুল রোজ জল গরম করিয়া ফুটাইয়া খায়, কারণ বেণ্টলী সাহেব বা ডাক্তার অমূল্য উকিল বলিয়াছে জল ফুটাইয়া না খাইলে অসুখ হইবেই হইবে। স্বাস্থ্যজ্ঞদের কথা শুনিতেছে আব্দুল, কিন্তু শুনিতেছে না হরিহর পোদ্দার। দুজনেরই সমান আর্থিক অবস্থা। আর্থিক অবস্থা যদি ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েডের একমাত্র অথবা প্রধান কারণ হয় তবে দুজনেরই এক সময়ে এক দিনে পেটের অসুখ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নাই।

অথবা হয়ত দেখিতেছি দুই বন্ধু এক হষ্টেলে বসবাস করে। একজন বিকালে খাবার খাইয়া চলিয়া গেল শিস্ দিতে দিতে বেড়াইতে আড়াই মাইল, আর একজন চিৎ হইয়া শুইয়া রহিল খাটীয়ার উপর। দুজনের টাকা পয়সা এক রকম, এক ইস্কুলে পড়ে, এক মাষ্টারের কাছে লেখা পড়া করে। কিন্তু প্রভেদ বিস্তর। একজন লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে

আড়াই মাইল ঘুরিয়া আসিল আর একজন সে সময় হাত পা ছড়াইয়া দুয়ার বন্ধ-করা ঘরে ঘুমাইয়া পড়িল। আর্থিক সু-কু যদি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রধান শক্তি হয় তা হইলে এই দুটী লোক সমান অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও একজন চৌকিতে পড়িয়া চিৎ হইয়া থাকে কেন, আর একজন বা বেড়াইতে যায় কেন ? দুজনের এক-সঙ্গে ফুটবল দেখিতে যাওয়া উচিত ছিল অথবা এক সঙ্গে বিছানায় পড়িয়া থাকা উচিত ছিল।

আর এক কথা। আমাদের দেশে গরীব লোক আছে বটে, কিন্তু ধনী লোক-ও আছে। হাজার হাজার অটোমোবিল বাঙালীরা খরিদ করিতেছে। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তিওয়ালা বাড়ীঘরের মালিক বাঙালী আছে অনেক। কিন্তু তাদের আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যজ্ঞান সৌন্দর্য্য-জ্ঞান মালুম হয় কি ? কলিকাতায় যতগুলি বাড়ী আছে সে সব বাড়ীর উঠানে গিয়া কোন্ লোক বলিবে যে এখানে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে ? উঠানের সম্মুখে, সিঁড়িতে, সিঁড়ির গায়ে, ঘরের কোণে, ছাদে দেয়ালে সর্ব্বত্র থুথু, পানের পিক, ঝুল আর যুগযুগান্তরের ধূলাময়লা জড় হইয়াছে। কিন্তু বাড়ীর মালিকেরা বা ভাড়াটিয়ারা সকলেই গরীব কি ? অনেকেই ধনী। কিন্তু যাদের ধন আছে তাদের ভিতরও সাধারণতঃ না আছে স্বাস্থ্যনিষ্ঠা, না আছে সৌন্দর্য্য-নিষ্ঠা। আমি গরীব, আমার বাড়ী যেমন নোংরা, লক্ষপতি যে, বড়লোক যে, তার বাড়ীর ফরাস, দেওয়াল ইত্যাদিও ঠিক সেই সুরে গাঁথা, আমারই নোংরামির জুড়িদার! অর্থাৎ বড়লোক হইলেই যে মানুষ স্বাস্থ্য-নিষ্ঠ বা সৌন্দর্য্যজ্ঞানশীল হইবে একথা স্বতঃসিদ্ধ রূপে স্বীকার করা চলে না।

১৯০৫ সনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

আমি এখানে কাজের কথা বলিতেছি না, শুধু আলোচনাপ্রণালীর কথা বলিতেছি। আমার বক্তব্য হইতেছে,—আর্থিক অবস্থা উন্নত

হইলে পর যদি আমরা স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা সুরু করি তা হইলে বাঙালী জাত কোন দিন স্বাস্থ্যশীল বা সৌন্দর্য্যজ্ঞানশীল হইতে পারিবে না। এই যে বিশ বাইশ বৎসর চলিয়া গেল এর ভিতর আমাদের আথিক অবস্থা আকাশপাতাল বদলিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। আগেও ঠিক আমরা মোটের উপর এই রকম দরিদ্রই ছিলাম। তা সত্ত্বেও যুবক বাংলা কোনো কোনো বিষয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

কিসের জোরে করিয়াছে? যদি দৈন্য-দারিদ্র্য ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একমাত্র বা প্রধান বাধা হয়—তা হইলে ১৯০৫ সনের আগে যুবক বাংলা যা ছিল ১৯২৭ সনে তার ঠিক সেই রকমই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি আর্থিক অবস্থা প্রায় এক রকমই রহিয়াছে। অথচ যুবক বাংলার কার্য্যশক্তি নানাদিকে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আর্থিক অবস্থার উপর মানুষের ব্যক্তিত্বটা আগাগোড়া নির্ভর করে না। অতএব আজ যদি মনে করেন যে স্বাস্থ্যরক্ষা করা উচিত, টাইফয়েড যক্ষ্মা ইত্যাদি ব্যারাম থেকে কলিকাতাকে আর বাংলাদেশকে বাঁচাইতে হইবে, তা হইলে ১৯০৫ সনে যুবক বাংলা দরিদ্র থাকা স্বত্ত্বেও যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল "আমরা বাংলায় নতুন জীবন আনিয়া ছাড়িবই ছাড়িব" তেমনি ১৯২৭ সনে অন্য দিককার কথা সম্প্রতি বলিতেছি না, —স্বাস্থ্যজ্ঞান সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধে সেইরূপই এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা উচিত। যুবক বাংলা জোরের সহিত স্বাস্থ্যধর্ম্ম জারী করুক আর বলুক—"নিজের চৌকিটা নিজে ঝাড়িব, ধূলা সমেত জুতা লইয়া ঘরে ঢুকিব না, পায়খানার গামলা নর্দ্দমা নিজে সাফ করিব, ঘর দুয়ার নিজে পরিষ্কার করিব, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলিব না বা কুলকুচো করিব না, দেখি টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যারাম কেমন করিয়া আসে?"

এসব সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া গরীব বা বড়লোক হওয়ার উপর নির্ভর করে

না। আমাদের পয়সাওয়ালা লোকেরা সাধারণতঃ এ সব বিষয়ে উন্নত নয়। যে কোনো বাঙালী বড় লোকের বাড়ীতে গিয়া তার রান্নাঘর, পায়খানা, বসিবার ঘর, লেখাপড়া করিবার ঘর, শুইবার ঘর দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, স্বাস্থ্যের জন্য সৌন্দর্য্যের জন্য বাঙালী সমাজের অলিতে গলিতে স্বতন্ত্র নতুন আন্দোলন চালানো আবশ্যক। দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটিলেই বাঙালীরা আপনা-আপনি স্বাস্থ্যনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যনিষ্ঠ হইতে শিখিবে, একথা নব্য-ন্যায় স্বীকার করিতে অসমর্থ। ধনী-নির্দ্ধন সকল মহলেই এখন চাই সমানভাবে কতকগুলা স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের আন্দোলন, সঙ্ঘ, প্রচারক, পত্রিকা।

সাম্য বনাম ধর্ম্ম

তারপর আমাদের দেশে এবং অনেক দেশেই সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আন্দোলন চলিতেছে এবং আছে। মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা হইতেছে—"নীতি, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মের উপর সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মানুষের নৈতিক উন্নতি হউক, সাম্য আপনা-আপনিই আসিবে।" নব্য-ন্যায় বলে—"সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি চিজ ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবনের উপর কতটা নির্ভর করে জানি না। হয়ত কিছু কিছু করে। কিন্তু নীতিশিক্ষা ধর্ম্মকথা একদম জলাঞ্জলি দিয়াও এই পৃথিবীতে সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি আসিয়া হাজির করা অসম্ভব নয়।" একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। পৃথিবীতে ধর্ম্ম জন্মিয়াছে অনেক। মান্ধাতার আমলের গ্রীস রোমের ধর্ম্ম—যেটাকে খৃষ্টানরা ধর্ম্মই বলে না, তারপর ইয়োরোপের খৃষ্টান ধর্ম্ম। অপর দিকে মুসলমান ধর্ম্ম আর আমাদের দেশে হিন্দুধর্ম্ম। পাঁচসাতটা নামজাদা ধর্ম্ম রহিয়াছে। এতগুলি সভ্যতা পৃথিবীতে আসিয়াছে, কিন্তু এতে যদি কেহ দেখাইতে

পারেন যে ভ্রাতৃত্ব সাম্য কোনো দিন কোন জায়গায় ছিল সামাজিক "বস্তু" হিসাবে, তা হইলে বলিব যে একটা সত্যিকার নতুন কথা শুনা হইল। ধৰ্ম্ম কোথাও আভিজাত্য ভাঙ্গিতে পারে নাই।

আসুন গ্রীসে, লম্বা চওড়া বোলচালওয়ালা গ্রীক সমাজের আসল ভিত্তি হইতেছে কেনা গোলামের মেহনৎ আর মজুরে-অভিজাতে প্রভেদ। ওদের যে মস্ত মস্ত মুড়ো,—জেনোফোন আর আরিস্তুতল—তারা আগাগোড়া বলিতেছে "গোলামী হইতেছে সমাজের ভিত হাত-পার কাজে তারা বাহাল, ভদ্রলোক সেই সব কাজে যায় না।" এই রকম জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রাসের সমাজ চলিয়াছে। রোম যখন খ্রীষ্টান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তখন কারখানায় ছুতারগিরি তাঁতিগিরি করিলে জাত যাইত। বাদশা আউগুস্তুস একজন সেনেটরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, কেননা এই ব্যক্তি জাতির ইজ্জত নষ্ট করিয়া একটা কারখানার মালিক হইয়াছিল। কারখানায় নিজের হাতে কাজ করে নাই,—মাত্র একটা কারখানা কায়েম করিয়াছিল এই অপরাধ! হাত-পার কাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা জিনিষটা কতবড় নিবিড়। ষ্টোইকদের নাম শুনিয়াছেন। ঋষি সন্ন্যাসী বলিতে যা বুঝা যায় তারা সেই ধরণের লোক তাদের সাহিত্যে সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির বোলচাল আছে, যেমন আছে অশোকের অনুশাসনে। তারপর গির্জ্জার বাবারা, "চার্চ্চ-ফাদারেরা" আমাদের দেশের ঋষি সন্ন্যাসী ইত্যাদিরই জুড়িদার। তারা হাজার বৎসর ধরিয়া আধ্যাত্মিক ধৰ্ম্মপ্রচার করিয়াছে। বলিয়াছে—"গোলামী বাঞ্ছনীয় নয়, চাই ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য।" কিন্তু যে সময় এই গির্জ্জার ধৰ্ম্ম জাহির ছিল, সেই সময় ইয়োরোপে চলিয়াছে রোমান আইন। আপনাদের অনেকেরই হয়ত রোমান আইন জানা আছে তার ভিতটা হইতেছে গোলামী আর চাষী-নির্য্যাতন, জমিদারের প্রভুত্ব ও ধনী-নির্দ্ধনের অনৈক্য। অর্থাৎ

প্রাচীন গ্রীক রোমান ধর্ম্ম ও মধ্যযুগের আধুনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্মের কোনোটাই সমাজের ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য আনিতে পারে নাই।

আসুন মুসলমান ধর্ম্মে। আমরা মনে করি ভ্রাতৃত্বে আর প্রেমে মুসলমান একেবারে গলাগলি, মুসলমানে মুসলমানে কোনো তফাৎ নাই। কেন না মুসলমানের বয়ান হইতেছে—কোরাণে লেখা আছে—"যে কোনো মুসলমান আমার ভাই।" ভিতরকার কথা হইতেছে স্বতন্ত্র। কোনোদিন দুটি মুসলমান সমাজ, দুটি মুসলমান রাষ্ট্র একত্রে তিন দিনের বেশী কাজ করিতে পারে নাই। মহম্মদের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান দুনিয়ায় দেখিতেছি—অনৈক্য, অসাম্য, অ-ভ্রাতৃত্ব, মারামারি, কাটাকাটি। আর মুসলমান আইনে ত বড়লোক গরীবলোক ওমরাহ বাদসাহ ইত্যাদি সব ভেদই আছে,—যেমন আছে খৃষ্টান আইনে ও সমাজে। তা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মের ডাকে সমাজ ভ্রাতৃত্ব কায়েম করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টান-মুসলমানদের দৌড় এই। এখন আসুন ভারতবর্ষে। আমাদের বিষ্ণুপুরাণে আছে—

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত সমত্ব মারাধনমচ্যুতস্য।

"সকলকে সমান ভাবে দেখিবি, এই সাম্যভাবই হইতেছে ভগবানের আরাধনা।" খৃষ্টান সমাজে সেণ্টপল, রোমান সাম্রাজ্যের সেনেকা ও সিসেরো যা বলিয়া আসিয়াছেন, "গির্জ্জার বাবারা" যা বলিয়া থাকেন, আমাদের হিন্দু "হিতোপদেশে"ও আছে তাই। অথচ মানবজীবনটা আর নরনারীর সমাজ মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতে আর দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রতিমুহূর্ত্ত আভিজাত্যের আর অভ্রাতৃত্বের লীলাভূমি হইয়া রহিয়াছে। কাজেই ধর্ম্মের সঙ্গে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে, ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের যোগাযোগ আছে কিনা নব্য-ন্যায় সে সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী।

নব্য-ন্যায় বলিতেছে—"ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য বস্তু হিসাবে সংসারে যদি আজ কিছু আসিয়া থাকে তবে সে সব আসিয়াছে প্রধানতঃ বা একমাত্র মজুর আন্দোলনের দৌলতে। যেদিন ইয়োরোপে প্রথম যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ফ্যাক্টরী ও লোকবহুল নগর প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই দিন তার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লম্বা লম্বা কুলীর বাথান কায়েম হইল। সেদিন নতুন ধরণের এক গোলামী প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গোলামীর যে দাওয়াই মনিবের সঙ্গে সমানে কথা বলা, "আমি আমার জীবন শাসন করিব" এই নীতিটাও প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ মজুরেরা সংঘবদ্ধ হইয়া মনিবের সঙ্গে সমানে সমানে কারবার চালাইতেছে আর বলিতেছে:— "আমিও মানুষ, আমাকেও সেলাম ঠুকিয়া চল।" আজ দুনিয়ায় আসিয়াছে যথার্থ সাম্যের যুগ, যথার্থ ভ্রাতৃত্বের যুগ। যে সাম্য, যে ভ্রাতৃত্ব খ্রীষ্টানধর্ম্ম পূর্ব্বে কখনও স্থাপন করে নাই, কল্পনাও করে নাই, গ্রাস কখনো চাখে নাই, হিন্দু-মুসলমানের কায়দায় কখনও আসে নাই, সেই ভ্রাতৃত্ব, সেই সাম্য আজ আসিয়াছে, বাড়িয়া চলিয়াছে, বাড়িয়া চলিবে। এমনি করিয়া এই ভারতেও সে সব আসিয়া হাজির হইবে। যে শক্তির জোরে এই সাম্য আসিতেছে যে শক্তিটা মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের কল্পনায় আসে নাই। সেই শক্তি হইতেছে মজুরের সংঘশক্তি। অতএব যদি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য বাঞ্ছনীয় জিনিষ হয় তা হইলে তাকে ধর্ম্ম গীর্জ্জা বা নীতির ঘাড়ে ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। যেমন স্বাধীনভাবে স্বাস্থ্যের আন্দোলন, স্বাস্থ্যের কার্য্য চাই, স্বাধীনভাবে সৌন্দর্য্যের আন্দোলন, সৌন্দর্য্যের কার্য্য চাই, তেমনি স্বাধীনভাবে একনিষ্ঠ মজুর আন্দোলন চাই, মজুরসংঘ কায়েম করা আবশ্যক। আভিজাত্যের প্রবল দুস্মন হইতেছে মজুর।

চাই মজুর-নিষ্ঠা

একশ' বছরের মজুর-আন্দোলন দুনিয়ায় কিছু কিছু সাম্য আনিয়াছে, ভ্রাতৃত্ব আনিয়াছে, ডেমক্রেসী আনিয়াছে। কিন্তু আপনারা প্রশ্ন করিতেছেন, "তাতে মানুষের সুখ বাড়িয়াছে কি?" বাড়িয়াছে—চরম বাড়িয়াছে।

পৃথিবীতে যে সকল সুখ কখনো কোনোদিন কেহ কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই, মানুষের শাস্ত্রে, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের আধ্যাত্মিকতায় যে-সব আনন্দের নাম পর্য্যন্ত ছিল না তা আজ ১৯২৭ সনে এক সঙ্গে দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক ভোগ করিতেছে। গ্রীস লাখ লাখ লোককে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল, ভারতে এবং ভারতের বাহিরে এক এক জন জমীদার, এক এক জন রাজা, লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নির্য্যাতন করিয়া এক একটা পল্লী সহর বা জেলার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করিয়াছে। এক একটা অট্টালিকা খাড়া করিয়াছে, তার পাশে রহিয়াছে শত শত কুঁড়ে ঘর। কত লোক যে মহামারীতে মরিয়াছে তার পাত্তা পাওয়া যায় না। আজ একশ দেড়শ বৎসর ধরিয়া শিল্পবিপ্লবের দৌলতে প্রতিদিন সজ্ঞানে সুখের সীমানা বাড়ানো হইতেছে, আনন্দের চৌহদ্দি বাড়ানো হইতেছে। সজ্ঞানে আলোক বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সীমানা কমিয়া কমিয়া আসিতেছে। মজুরের সংঘশক্তি দুনিয়াকে ধীরে ধীরে অমৃতের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। সমাজ-ব্যাপী এই অন্ধকার-নিবারণের সজ্ঞান চেষ্টা, অমৃত-সন্ধানের সজ্ঞান আন্দোলন বড় লোকেরা করেন নাই। তাদের হাড়ে-মাসে সে চেষ্টা আসে নাই। কখনো কখনো কোনো শিক্ষিত লোকের মাথায় আসিয়াছে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ এই অমৃতের সন্ধান আসিয়াছে

অশিক্ষিত পদদলিত নির্য্যাতিত মজুর শ্রেণীর চেষ্টায়। এখনও যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। সাম্য-লড়াইয়ের ফৌজেরা কেহ কোনোদিন ধারণা করে না যে দুনিয়া স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে অথবা এইখানেই স্বর্গের শেষ ধাপ। পৃথিবীর সভ্যতা ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইবে কেহ জানে না। সুখ-বিজয়ের সিপাহীরা সর্ব্বদাই অন্ধকার খর্ব্ব করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত। মজুর-আন্দোলন বলিতেছে—"যখন যেখানে ধনী-নির্দ্ধনে কোনো প্রকার বিরোধ আর সামাজিক দুঃখ ও অবিচার দেখিতে পাই তখন সেখানে সেই সমস্যা সমাধান করিবার জন্যই আমার আবির্ভাব।" তাই নব্য-ন্যায়ের বাণী হইতেছে এই যে, ধর্ম্ম থাক বা না থাক, সাম্য ভ্রাতৃত্বের জন্য দেশশুদ্ধ লোকের মঙ্গলের জন্য, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, মজুর-নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।

চরিত্রবত্তা বনাম স্বাধীনতা

নব্য-ন্যায়ের আর এক প্রয়োগ-ক্ষেত্র খুলিয়া ধরিতেছি। আমরা সব সময় বলিয়া থাকি যে, আমরা অনেক কিছু ভাল কাজ করিতে পারিতাম, আমাদের নরনারীরা চরিত্রে উন্নত হইতে পারিত, দেশটা যদি স্বাধীন হইত। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের আর ব্যক্তিত্বের নিবিড় যোগ একটা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ স্বীকার করা আমাদের রেওয়াজ। আমি বলিতে চাই না যে, স্বাধীনতার সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের সম্বন্ধ নাই। সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে যে, স্বরাজ থাকিলে, জাগতিক আত্ম-কর্তৃত্ব থাকিলে বড় বড় কাজ করা সহজ হয়, অনেক সদ্‌গুণেরও বিকাশ সম্ভবপর হয়। কাজেই স্বাধীনতার আন্দোলন চাইই চাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি যা কিছু দুনিয়াতে ঘটে সবই একমাত্র গোলামীর ফলে ঘটে না। তা যদি

হইত তা হইলে বিলাতে, আমেরিকায়, জাপানে জুয়াচুরি থাকিত না, জার্ম্মাণি-ফ্রান্সের লোক বাটপাড়ি করিত না, আমেরিকার যুবক টাকা আত্মসাৎ করিত না। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, আমরা গোলাম হইয়া যে সব কুকর্ম্ম করিতেছি ওরা স্বাধীন হইয়াও তাই করিতেছে। চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি বদমায়েসির যতগুলি তথ্যতালিকা আছে তাতে ইংরেজ ফরাসী জার্ম্মাণ কেহ আমাদের চাইতে ছোট নয়। "ক্রিমিনলজি"তে, অপরাধবিজ্ঞানে হাতেখড়ি হইবা মাত্রই যে-কোনো লোক এইরূপ রায় দিতে সমর্থ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে কোনো লোকের ব্যক্তিত্বে একমাত্র খুঁটা বিবেচনা করা নব্য-ন্যায়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

উল্টো দিকে বলিতেছি যে পরাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে দশ বিশ জন এমন লোক আছে, এমন চরিত্রবান নরনারী আছে যার সমকক্ষ ফ্রান্স ইংলণ্ড জার্ম্মাণি আমেরিকা জাপান ইত্যাদি ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ারে হয়ত নাই। আগে বলিয়াছি দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও যুবক বাংলা বিশ-বাইশ বৎসরে যা করিয়াছে তার কিম্মৎ খুব বেশী। অতটা কাজ জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী যুবারা কখনো করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এখন ঠিক সেই রকম বলিতেছি যে পরাধীন থাকা সত্ত্বেও ভারতে অনেক লোক আছে, যুবক বাংলায় অনেক লোক আছে, যারা এমন কিছু কাজ করিয়াছে যা বিভিন্ন স্বাধীন দেশের যুবারা নিজ প্রয়াসে করিতে পারে নাই। তাদেরকে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছে, আমরা গভর্ণমেণ্টের কোনো সাহায্য পাই নাই। না পাওয়া সত্ত্বেও বিশ বাইশ বৎসরের ভিতর বাঙ্গালী আর অন্যান্য ভারতবাসী অনেক কিছু করিয়াছে। তা যদি হইয়া থাকে তা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই জাতীয় উন্নতির, ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রবত্তার একমাত্র কারণ?

মনে রাখিবেন, পরাধীনতা বাঞ্ছনীয় এমন কিছু আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য অতি সহজ সরল। যতই আর্থিক উন্নতির আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন চালাই না কেন, এখনও বহুকাল আমরা দরিদ্র থাকিতে বাধ্য, ১৯২৭ সনের পরেও অনেকদিন আমরা পরাধীন থাকিতে বাধ্য। প্রশ্ন হইতেছে, আমরা এই অবস্থায় মানুষের মতন নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে রাজি আছি কিনা। পরাধীনতা আজ, কাল বা পরশু যাইবে না, স্বরাজ সাত মাসে আসিবে না, পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর আমরা প্রত্যেকে মস্ত মস্ত পয়সাওয়ালা লোক হইব না। তবু আমার তোমার কর্ত্তব্য কিছু আছে কিনা, মানুষের মতন বাঁচিয়া থাকাও চাই কিনা তাহাই আমার ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান সমস্যা। আমি বলিতেছি যে, বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া যুবক বাংলা দারিদ্র্য পরাধীনতা পদদলিত করিয়া নিজ জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে। আজ আবার মোরিয়া ভাবে একাগ্রতার সঙ্গে এই চিন্তাই পুষ্ট করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও যুবক বাংলাকে এমন কিছু করিতে হইবে যাতে ১৯০৫ হইতে ১৯২৭ সনের সকল প্রকার কর্ম্মরাশিকে ডুবাইয়া দিতে পারা যায়। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কি ভাবে চালাইতে হইবে তার আলোচনা আলাদা। অধিকন্তু চিন্তাপ্রণালীর কথা মাত্র বলিতেছি, কর্ম্মপ্রণালীর কথা কিছু বলিতেছি না।

অদ্বৈতবাদের মুগুর

আপনারা বলিতে পারেন,—"তুমি ধন-বিজ্ঞানের তোয়াক্কা রাখ না, ধর্ম্মতত্ত্বকেও কলা দেখাইতেছ, আর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ধার ত তুমি ধারই না। তা হইলে তোমার ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্ কোথায়, বাবা?" আমি এই সকল শাস্ত্রকে কলা দেখাইতেছি এরূপ বলা ঠিক নয়। আসল

কথা, আমার নব্য-ন্যায় কোনো এক গর্ত্তে গিয়া ধরা দিতে চায় না, কোনো এক মিঞার দাড়ীর ভিতর অথবা টিকির আগায় গোটা দুনিয়া-টাকে দেখিতে অভ্যস্ত নহে। কোনো একটা শক্তিকে মানবজীবনের দেবতা বিবেচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার তর্কশাস্ত্র অদ্বৈতবাদের মুগুর। এক সঙ্গে এক হাজার শক্তির উপাসনা হইতেছে আমার স্বধর্ম্ম। আমি একেশ্বরবাদী নহি। কোনো এক ব্যক্তিকে ঋষি মহর্ষি পীর পীড় ইত্যাদি ঠাওরানো আমায় হাড়মাসে কুলাইবে না। অদ্বৈতবাদ আমার চিন্তায় চরম মারাত্মক বিষ বিশেষ। এক সঙ্গে হাজার ঋষির, হাজার দেবতার, হাজার ধর্ম্মের, হাজার বিজ্ঞানের উপাসক আমি। সোজা কথায় বলিয়া দিতেছি আমার ঋষি কারা।

ডন-কছরত করবার সময় ভাব্ছ ভাঙ্বে বাড়ী-ঘর গাছ-পাহাড়,
অমনি তোমায় ভাবি রামের গুরু বিশ্বামিত্রের অবতার।
কোদ্‌লিয়ে একবার বীজ ছড়িয়ে কড়া মাটিকে করলে উর্ব্বর,
তখনি তুমি বিন্ধ্যগিরির মুগুর, বীর অগস্ত্য মুনিবর।
কুয়া খুঁড়ে খাল কেটে জল ডেকে আন্‌লে যেই মরুমাঠে,
তপস্বী সগরের বাচ্চা তুমি তৎক্ষণাৎ লোকের বাজার হাটে।
গানে বক্তৃতায় বা কথার জোরে সাহস আশা বাড়ালে আমার,
অগ্নিহোতা মধুচ্ছন্দার আগুন-মূর্ত্তি দেখি তোমার।
হরদম তুমি হটাচ্ছ দুস্‌মন আর চাখ্‌ছ মুক্তি স্বাধীনতা,
তোমার কুড়ালে শির দিচ্ছে হাজার আঁধার দুর্ব্বলতা।
মাথার জোরে হাতের জোরে অমৃতস্য পুত্রাঃ সব মানুষ,—
ব্রহ্মচারী, অকথ্য মাতাল, বিলাসী, গৃহস্থ, স্ত্রীপুরুষ।
হৃদয় তোমার পাগল করে যে আর তাতিয়ে তোলে তোমার মাথা,
ঋষি ভগবান তারে না বল্‌লে কেউ লাগিয়ে দিও পাঁচ জুতা।

সূত্রটায় নৃতত্ত্ব বা অ্যান্থ্রপলজি গুলিয়া রাখা হইয়াছে মনে হইবে। কিন্তু নব্য-ন্যায়ের একটা বড় আধ্যাত্মিক বনিয়াদ এইখানে।

চাই অনৈক্যের রাষ্ট্রনীতি

অবশেষে নব্য-ন্যায়ের রাষ্ট্রনীতি যৎকিঞ্চিৎ চর্চ্চা করা যাউক। আপনারা জানেন ভারতে বুলি চলিতেছে মাত্র এক। "চাই ঐক্য, চাই ঐক্য, চাই ঐক্য,—রাষ্ট্রীয় ঐক্য আর হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য।" ১৮৮৬ সনে কংগ্রেস হইল, ৪১ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। হামেসা আমরা তোতা পাখীর মত আওড়াইতেছি গোটা ভারতকে এক করিতে হইবে আর ভারতের হিন্দু মুসলমানকে এক করিতে হইবে। নব্য-ন্যায়ের রাষ্ট্রনীতি কিছু কুচুটে রকমের। প্রথমতঃ এ বলিতেছে, "ভারতের ঐক্য হয়ত চাই না। গোটা ভারতের ঐক্য সাধিত না হইলেও মহাভারত অশুদ্ধ হইবে কি না সন্দেহ।" দ্বিতীয়তঃ বলিতেছে, "হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হয়ত চাই না। ঐক্য ঘটে ঘটুক, না ঘটে বহিয়া গেল।" তৃতীয়তঃ বলিতেছে, "হিন্দুতে হিন্দুতেও ঐক্য হয়ত চাই না। অনৈক্যে ক্ষতি বেশী কি লাভ বেশী খতাইয়া দেখা আবশ্যক।" এক কথায় নব্য-ন্যায় অনৈক্যবাদী। যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আর সমাজের আভ্যন্তরিক ডেমক্রেসী বা স্বরাজ এই দুই বস্তু ভারতসন্তানের আকাঙ্ক্ষিত চিজ হয় তা হইলে অনৈক্যে লাভ ছাড়া হয়ত লোকসান নাই।

আপনি অ্যাসেম্বলি-কাউন্সিলের মেম্বর হইবেন, মিউনিসিপ্যালিটির ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তা হইবেন, কর্পোরেশনের কেহ-কিছু হইবেন, ভাল কথা। চাহিতেছেন আমার ভোট। ভোট দিতে আমি অরাজি নহি। কিন্তু ভোট দিব কেন? এ পর্য্যন্ত দিয়াছি ইসমাইলকে অথবা রাম পোদ্দারকে। সে নিজেকে বড় করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেকে, ভাগ্নেকে, মাসতুতো

ভাইয়ের খুড়তুতো ভাইকে বড় করিতেছে। ব্যস্। তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই,—দেশের কতকগুলা লোক নামজাদা হইয়াছে, পয়সা করিয়াছে। তাতে সুখী আছি। সুখের কথা, তাদের নাম যশ গাড়ী ঘোড়া হইল, খবরের কাগজে তাদের লেখা বাহির হইতেছে, যখন যেখানে যায় খবরের কাগজে নাম বাহির হয়। আমার ভোটে তাদেরকে আমি বড় করিয়া দিয়াছি। বেশ। আজ কিন্তু যদু মল্লিক বা আবদুল গনি আসিয়া বলিতেছে, "ভাই আমাকে ভোট দে। এবার দাড়াইতেছি আমি।" ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছি, কেন ভোট দিব? রাম পোদ্দার বা ইসমাইলকে ভোট দিয়াছিলাম। দেশকে সে বড় করিয়াছে কি না জানি না। তবে সে তার চাচাকে মাসতুতো ভাইকে পেয়াদাগিরি, দারোগাগিরি চাকরী দিয়াছে। কেউ রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি হইয়াছে। আজ আবদুল গনি আর যদু মল্লিকও তাই করিতে চাহিতেছে। তাই বা মন্দ কি? এদেরকেই বা কেন ভোট দিব না? কেন তাদেরকে আমার ভোট দিয়া দেশের ভিতর নামজাদা করিয়া তুলিব না? কোনো সম্প্রদায়ের লোক যদি বিবেচনা করে যে তাদের ভাইয়েরা, পাড়ার লোকেরা আত্ম-কর্তৃত্ব ভোগ করিতে পারিতেছে না, তা হইলে অন্য লোক যারা আত্ম-কর্তৃত্ব ভোগ করিতেছে তাদের বিরুদ্ধে এই লোকগুলা যদি ক্ষেপিয়া উঠে তাতে দুঃখ কিসের? রামা শ্যামা আত্ম-কর্তৃত্ব ভোগ করিয়া যদি উন্নত হইয়া যায় তা হইলে হরিহর পোদ্দার, অমুক চন্দ্র অমুক ইত্যাদি যাদের কোনো দিন কোনো জায়গায় নাম শোনা যায় নাই তাদেরকে সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিব কেন? তারা নামজাদা হইলে দেশের ক্ষতি হইবে, কে বলিল?

বাংলাদেশে আজ আমি এক সঙ্গে পাঁচ হাজার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র দেখিতে চাহি, পাঁচ হাজার দল, পাঁচ হাজার কাগজ, পাঁচ হাজার আত্ম-

কর্তৃত্বশীল নরনারী, পাঁচ হাজার পরস্পর-টক্করশীল প্রতিষ্ঠান দেখিতে চাহি। নব্য-ন্যায় চাহে ব্যক্তিমাত্রের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিত্ব,— কাজেই লক্ষ লক্ষ দলাদলি আর সঙ্ঘ-গঠন। নতুন কোনো জাত, ব্যক্তি, কাগজ বা দল খাড়া হইলে পুরোণো কোনো কোনো জাত, ব্যক্তি কাগজ বা দলের কিছু কিছু ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পুরোণো জাত ব্যক্তি, কাগজ আর দলগুলাকে সর্ব্বদা বিনা বাক ব্যয়ে বড় থাকিতে দেওয়া বা মাথায় করিয়া রাখা কোনো দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না। নতুন নতুন লোক বড় হইতে চাহে, নতুন নতুন জাত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে। পুরোণো দল বা জাত বা ব্যক্তিগুলার পা চাটিতে গেলে "ঐক্য" রক্ষা হইতে পারে বটে। কিন্তু তাতে নতুন নতুন উন্নতি-প্রয়াসী জাতের বা সম্প্রদায়ের জীবনবস্তু নষ্ট হইবে মাত্র।

নমঃশূদ্রেরা তাই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতেছে। পোদ হাড়ি চামার ইত্যাদি লোকেরা স্বাধীন হইতেছে, ইস্কুল পাঠশালা করিতেছে, রাজ-দরবারে খ্যাতি চাহিতেছে। এই সব বিদ্রোহ ও স্বাধীন জীবনের আন্দোলন আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতির প্রধান সহায়। চলুক এ সব স্বতন্ত্রতার আন্দোলন। আমিই এক মাত্র বা তুমিই এক মাত্র স্বাধীনতা আর আত্ম-কর্তৃত্ব ভোগ করিবে কেন? একজন লোক আসিয়া বলিল, "আমি দেশের বাণীমূর্ত্তি, দেশের আত্মা।" নব্যন্যায় বলিবে, "বাণীমূর্ত্তি বা প্রতিনিধি তুই কার? তোর নিজের? তোর জাতের? তোর পাড়ার? কজন লোকের? ইস্কুলমাষ্টার, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি শ্রেণীর দুচার শ' বা দুচার হাজার লোকের বাণীমূর্ত্তি হয়ত তুই হইতে পারিস।" আমি ডাক্তার হওয়াতে বড় জোর হাজারখানেক ডাক্তারের মতামত প্রচার করিতেছি। তার ফলে হয়ত ডাক্তারদেরকে নামজাদা করিলাম, তাদের কথা প্রচার করিলাম, তাদের উপকার

করিলাম। এ বেশ স্বাভাবিক কথা। অপর পক্ষে হয়ত আমি খাইতে পাইতেছি না, লেখাপড়া শিখিতে পাইতেছি না, দুনিয়ায় আমার কেহ নাই। আমি যদি বলিতে চাই যে, আমাদেরকে নামজাদা করিয়া দাও, আমাদের জন্য খবরের কাগজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, আমাদেরকে টাকা পয়সায় বড় লোক হইবার সুযোগ তৈরি করিয়া দাও, আমরাও একটা দল গড়িয়া তুলি, তা হইলে একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিবে কি ?

নব্য ন্যায় তাই প্রশ্ন করিতেছে, "মজুরের সঙ্গে মনিবের হৃদয়ের যোগাযোগ কোথায় ? উকিলের সঙ্গে হাটুয়ার হৃদয়ের যোগাযোগ কোথায় ? পয়সাওয়ালা মুসলমানের সঙ্গে গরীব মুসলমানের হামদর্দ্দি কোথায় ? যে মাঝি নৌকা চালাইতেছে সে যে-কথা বলিতেছে তার সঙ্গে ডাক্তারের স্বার্থের যোগাযোগ কোথায় ?" ইত্যাদি। এই যোগাযোগ আর হামদর্দ্দি যখন নব্য-ন্যায় দেখিতে পাইতেছে না, তখন উকিল, ইস্কুলমাষ্টার, ডাক্তার আর তথাকথিত ভদ্রলোক এবং পয়সাওয়ালা লোকের ধাপ্পাবাজিতে কেন অন্যেরা ভুলিয়া থাকিবে ? অতএব বাংলা-দেশের যে ব্যক্তি যেখানে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অভাব দেখিতে পাইতেছে —বিদ্যার অভাবে, স্বাধীনতার অভাবে, পদমর্য্যাদার অভাবে, টাকা-কড়ির অভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সেই ব্যক্তি সেখানে নতুন দেশ, নতুন সমাজ, নতুন বাংলা গড়িয়া তুলিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাতে যদি পুরোণো "বাবু-ভায়া", "ভদ্রলোক", "জন-নায়ক", "মিঞা ছাহেব" ইত্যাদির সঙ্গে নতুনের ঝগড়া বাঁধে, বাঁধুক। এই ঝগড়ায় দেশ বড় ছাড়া ছোট হইতে পারে না। আমি ভারতীয় ঐক্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, মুসলমানে-মুসলমানে ঐক্য, অথবা হিন্দুতে হিন্দুতে ঐক্য ইত্যাদির বুখ্‌নি বুঝি না। আমি চিনি মাত্র হাজার হাজার বাংলাদেশ আর

হাজার হাজার ভারত, অর্থাৎ হাজার হাজার আত্মকর্তৃত্বশীল, আত্ম-সম্মানশীল, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট, ভবিষ্যতের পথ-পরিষ্কারকারী হাজার হাজার ব্যক্তি, হাজার হাজার দল, হাজার হাজার সম্প্রদায়। তার নাম বহুত্ববিশিষ্ট ভারতবর্ষ,—বহুত্বময় বাঙ্‌লা দেশ।

বর্ত্তমান-নিষ্ঠার বয়েৎ

নব্য-ন্যায়ে আর পুরোণো ন্যায়ে আর একটা গভীর প্রভেদ আছে। মামুলি ন্যায় সাধারণতঃ সুদূর অতীতের স্মৃতিতে আর মহা ভবিষ্যতের স্বপ্নে মসগুল হইয়া থাকে। নব্য-ন্যায় প্রাচীন ভারত, প্রাচীন দুনিয়া অথবা সুদূর ভবিষ্যতের বোলচালে নিশ্চিন্ত থাকে না। এর প্রধান বা একমাত্র কথা,—বর্ত্তমান-নিষ্ঠা। বর্ত্তমান জগতের জন্য হরেক মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য পালন তার একমাত্র সত্য।

মহা অতীতে কি ছিল, মৌর্য্য-মারাঠা-মোগল আমলে কি ছিল তার কথায় আমি মাতি না। মাঝে মাঝে একটু আধটু ঐতিহাসিক চর্চ্চা চালাইয়া থাকি বটে। তাতে কিছু লাভও হয়ত আছে। কিন্তু এমন কি ১৯০৫, ১৯১৫, ১৯২৫ সনকেই আমি "সেকেলে" যুগ বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। প্রত্নতত্ত্বের বাসি মালে মসগুল থাকা এই নব্যন্যায়ের স্বধর্ম্মোচিত নয়। অপরদিকে নব্য-ন্যায় কল্পনার আকাশ-কুসুম দেখিয়া অথবা মহাভবিষ্যের বিপুল ভারত সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতে চাহে না। বর্ত্তমান যুগের সকল প্রকার বৃহত্তর ভারতই তার আরাধ্য দেবতা। জীবন-বেদের বেপারীরা কট্টর বর্ত্তমান-নিষ্ঠ। তাদের বয়েৎ শুনাইতেছি :—

কৃপণের মতন ভবিষ্যের ব্যাঙ্কে জমা রাখ্‌তে পারিনা (আমার) জীবন,
লক্ষগুণ মূল্যবান বেশী (আমার) বর্ত্তমানের ছোটখাটো দিনক্ষণ।

ভবিষ্যৎ কি আছে পৃথিবীতে? অতীত ত ভূত হয়েছে মরে',
ছিনিয়া লুটতে চাই আমি এখনি এই মুহূর্তে প্রাণ ভরে।
নিশীথের আশা স্বপ্ন সুখ হ'তে না হ'তে সকাল যায় মুস্‌ড়ে',
কালকে মিঠাই খেয়ে থাকলেও আজকে কুইনিন ফেলে দিই ছুঁড়ে।
বর্ত্তমানই আমি,— আমার জীবন, এইক্ষণের কর্ত্তৃত্ব, শোক, হর্ষ,
তার কাছে দাঁড়াতে পারে না আমার আগামী শতবর্ষ।
ধরা-স্বর্গের সকল ভোগ চাই আমি প্রতি নিমেষের রক্তে,
অর্ব্বুদ বিদ্যুৎ বিন্দু পর পর ভাসুক আমার জীবন স্রোতে।
এখনি ঢাল্‌ব সকল শক্তি, হব সার্থক, বেঁচে নিব গোটা জীবন,
সেরা লগ্ন, মাহেন্দ্র যোগ জীবনে আর আস্‌বে না কখন।
আজকের দিন, এই বেলা, এই মুহূর্ত্ত, এই ধরাতল,—
এই সবই আমার শরীর-মন-প্রাণের শ্রেষ্ঠ সম্বল।

অর্থশাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন *

আর্থিক আইন-কানুন ও স্বদেশ-সেবা

সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা জানিনা। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলিতে আমি ওস্তাদ।

প্রথমতঃ, বিদেশ হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া ভারতের ধন-সৃষ্টিতে আর বেকার-সমস্যায় সাহায্য করা আমি বিচক্ষণ স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকি। তাহার অন্যান্য সুফলের ভিতর আমি দেখিতে পাই যে, চাষীরা অল্পমাত্র জমির উপর নির্ভর করিয়া গণ্ডা গণ্ডা লোকের ভরণ-পোষণ করিতে আর বাধ্য হইবে না, জেলায় জেলায় অসংখ্য আধুনিক প্রণালীর শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে, মজুর আর মধ্যবিত্ত নামক দুই শ্রেণীর লোক-বল, ধন-বল, জ্ঞান-বল আর চরিত্র-বল বাড়িতে পারিবে আর সমাজের সর্ব্বত্র যন্ত্র-নিষ্ঠার জয়জয়কার চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের হাতে জনগণকে বেশী পরিমাণে ট্যাক্স দিতে উৎসাহিত করা আমি স্বরাজ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। কেননা স্বরাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর নানাপ্রকার কাজে টাকা খরচ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করানো আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, আঠার পেন্সের রূপৈয়ার স্বপক্ষে আমি প্রথম হইতেই

---

* ঢাকা জেলার যুবক-সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ, (আগষ্ট, ১৯২৭)।

আছি। তাহাতে বাঙলার চাষীর ক্ষতি আমি দেখিতে পাই না। চতুর্থতঃ, সরকারী কৃষি-কমিশনের বিপক্ষে যুক্তি দেখানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর পঞ্চমতঃ, আজকাল যে "রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আইনের কথা উঠিয়াছে তাহার স্বপক্ষেই আমার চিন্তা খেলিতেছে।

বোল্‌শেভিক রুশিয়ায় "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা "সরকারী" প্রতিষ্ঠান, ইতালিতেও তাই। অর্থাৎ অংশীদার নামক জীব এই দুইটার শাসনকর্তা নয়। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ায় সরকারী এবং বে-সরকারী দুই প্রকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কই চলিতেছে। কাজেই ভারতে যদি বিলাতী-জার্ম্মাণ আদর্শের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কায়েম হয় তাহা হইলে একটা মারাত্মক কিছু সয়তানি ঘটিবে বলিয়া আমি সন্দেহ করি না।

তবে ইহার শাসনে ও কর্ম্ম-পরিচালনায় ভারত-সন্তানের হাত বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক-কিছুতেই "ইণ্ডিয়ানিজেশ্যন" বা ভারতীকরণ এখনো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। কাজেই একমাত্র ইণ্ডিয়ানিজেশ্যনের ওজরে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ককে খাড়া হইতে না দেওয়া আমার মতে অতিমাত্রায় চরম-পন্থিতা। সাধারণতঃ, চরমপন্থিতার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই চরমপন্থিতা বাঞ্ছনীয় কিনা সন্দেহ।

কিন্তু ব্যাঙ্কটাকে অন্যান্য তরফ হইতেও শাসন হিসাবে উন্নত করা সম্ভব। প্রস্তাবে আছে যে, মাত্র চারটা "ভারতীয়" ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কাগজপত্র এই ব্যাঙ্কে স্বীকার করা হইবে। অথচ বাইশটা বিদেশী ব্যাঙ্ক এই অধিকার ভোগ করিবে। এই বিধানের বিরুদ্ধে আমি বলিতে চাই যে, অন্ততঃ গোটা চল্লিশেক "ভারতীয়" জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ককে এই অধিকার

দেওয়া উচিত। অধিকন্তু ভারতের প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-গুলারও এই অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

শাসন-সংক্রান্ত এই ধরণের কয়েকটা দফা বাদ দিলে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে যে সকল সত্ত আছে তাহার অধিকাংশই আমার বিবেচনায় যুক্তি-সঙ্গত এবং গ্রহণীয়। বিশেষতঃ, ইয়োরামেরিকার চরম অভিজ্ঞতার সুফল এই ব্যাঙ্কের নোট-জারী আর নোটে-সোনায় সম্পর্ক সম্বন্ধে কায়েম করিবার ব্যবস্থা আছে। সহজে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নোট সম্বন্ধে ফরাসী কায়দা ত বর্জ্জিত হইয়াছেই, এমন কি বিলাতী রীতিও গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে আছে জার্ম্মাণ-জাপানী রীতি।

বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তাই হউক অথবা প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক বিলই হউক,—কোনো বিষয়েই বিপুলায়তন কেতাব লিখিবার সময় বা সুযোগ আমার জুটে নাই। তবে নানা উপলক্ষ্যে সিদ্ধান্তগুলা কয়েক কথায় প্রচার করা গিয়াছে।

মতামতের অনৈক্য

বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের মতন আর্থিক আইন-কানুন বিষয়েও আমার মতামতগুলা লোক-প্রিয় নয়। সর্ব্বত্রই আমি কিছু বেআড়া রকমের কথা বলিয়া থাকি।

কাজেই আমার নিকট হইতে আজও হয়ত পূরাপূরি অপ্রিয় কথাই বাহির হইবে। অন্যান্য দুনিয়ার মতন আর্থিক দুনিয়ায়ও বহুসংখ্যক মতভেদ আর দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমি অবশ্য দল পুরু করিবার মতলব রাখি না। মতটা জাহির করিবার স্বাধীনতা পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকি।

আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন কিম্বা স্বরাজশীল থাকিত তাহা হইলেও

একাধিক পরস্পর-বিরোধী আর্থিক মত বাজারে বাজারে চলিত। কাজেই যখন- তখন যেখানে-সেখানে যে-সে মতকে দেশ-হিতকর অথবা দেশের অনিষ্টকারক বলিতে গেলে অবিচার করা হইবে।

আজ ভারতে স্বরাজ আর স্বাধীনতা নাই বলিয়া সর্ব্বদা দেশশুদ্ধ লোককে কোনো এক মতের স্বপক্ষে "দেশের নামে" বিনা বাক্যব্যয়ে রায় দিতে উদ্বুদ্ধ করা স্বদেশ-সেবার লক্ষণ না হইতেও পারে। তাহাতে "দেশের স্বার্থ" রক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর উপর অত্যাচার ও জুলুম ঘটিতে বাধ্য। দুএকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাধারণতঃ আমরা না ভাবিয়া-চিন্তিয়া চাষী আর মজুর এই দুই শ্রেণীর লোককে এক গোত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই দুইএর স্বার্থ অনেক সময়েই একরূপ নয়। বিদেশী মাল বয়কট সুরু হইলে অথবা তাহার উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাইলে খরিদ্দার হিসাবে চাষীদের ক্ষতি। কিন্তু যে সকল স্বদেশী ফ্যাক্টরীতে সেই সব মাল তৈয়ারী হয় বা হইবার সম্ভাবনা তাহার মজুরেরা তাহাতে বিচলিত হইবে কেন?

কাজেই চাষী আর মজুরকে অনেক সময়ে দুই বিভিন্ন স্বার্থের লোক অতএব দুই বিভিন্ন পথের পথিক দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক। আবার কলের মালিকেরা যে আইন বা কর্ম্মপ্রণালীকে দেশহিতকর বিবেচনা করেন তাহাকে মজুরেরাও "দেশের পক্ষে" মঙ্গলজনক বিবেচনা করিবে এরূপ কথা বলা চলে না।

তারপর, তথাকথিত মধ্যবিত্তের মতি, গতি, স্বার্থ বা নীতি কিরূপ? এই শ্রেণীর লোকেরা আজ হয়ত জমিদারের পথকে, কাল হয়ত ফ্যাক্টরি-মালিকের পথকে, "দেশের পথ" বিবেচনা করিতে পারে। এমন কি কখনও বা চাষীকে আবার কখনও বা মজুরকে তোয়াজ করা তাহাদের স্বার্থ-মোতাবেক বা যুক্তি-মাফিক দাঁড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং

জোর জবরদস্তি করিয়া কোনো দাগ-দেওয়া বিশিষ্ট মতকে স্বদেশসেবার মত বা স্বরাজের পথরূপে প্রচার করা গা-জুরি মাত্র। কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে, শ্রেণী-বিশেষকে বা দল-বিশেষকে দেশের একমাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি বিবেচনা করা পূরাপূরি অন্যায়।

অসাধ্য সাধন

যৌবনশক্তির চাষ চালাইয়া বাঙ্‌লাদেশের যে কয়টা জেলা বাঙালী জাতিকে বর্ত্তমান জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহার ভিতর ঢাকার ইজ্জৎ খুব বেশী। যুবক বাঙ্‌লার ১৯০৫-৭ সন ঢাকার আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছিল। আর এই বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতি দুনিয়ায় যাহা কিছু করিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান ফোয়ারা সেই ১৯০৫-৭ সনের কর্ম্ম ও চিন্তারাশি।

সেই যুগের সাধনাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য যুবক বাঙ্‌লা দেশে বিদেশে নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙালীরা বহির্ব্বাণিজ্যে কিছু কিছু নজর দিতেছে। বাঙালীরা শিল্প-কারখানা কায়েম করিতেছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের চেষ্টা বাঙ্‌লায় দেখা যাইতেছে। বাঙালীর তাঁবে বীমা কোম্পানী, "যৌথ" ব্যাঙ্ক আর "সমবেত" ব্যাঙ্ক কতকগুলা মাথা খাড়া করিয়াছে।

বাঙ্‌লার বাহিরে যুবক বাঙ্‌লা বাঙালী যৌবনশক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ গাড়িতেছে। ভারতের বাহিরেও বাঙালী সাঁতার কাটিয়া গিয়া আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে বর্ত্তমান ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জাপানী সমাজে বাঙালীর যৌবনশক্তি ভারত-সুহৃৎ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, ইতালিতে, বিলাতে সর্ব্বত্রই যুবক বাঙ্‌লা নবীন ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে জীবন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। দুনিয়ার বড় বড়

চিন্তাকেন্দ্রে আর কর্ম্মকেন্দ্রে যুবক বাঙলা একটা "বৃহত্তর ভারত" কায়েম করিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের জীবনস্রোত আজ জগতের মজুর, পুঁজিপতি, শিল্পী, বিজ্ঞানসেবী, সাংবাদিক, রাষ্ট্রবীর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরনারী মহলে গিয়া ঠেকিয়াছে। দুনিয়ার অনেক প্রকার আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীন ও সমানভাবে জীবন-বিনিময় সাধিত হইতেছে।

প্রবীণেরা যাহা কখনো কল্পনা করিতে পারিত না ১৯০৫-৭ সনের নবীনেরা সেই স্বপ্নাতীত খেয়ালগুলাও কার্য্যে পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছে। যুবক বাঙলার এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইল কি করিয়া? যৌবন-শক্তির যুক্তি-শাস্ত্রই এই অসাধ্য-সাধনের জন্য দায়ী। ভাঙন আর গড়ন হইতেছে সেই যুক্তিশাস্ত্রের মোটা কথা।

দুনিয়া সম্বন্ধে যুবারা ভাবিত,—

সূর্য্য ভাঙিয়া গড়েছে পৃথিবী, পৃথিবী ভাঙিয়া গড়েছে চাঁদ,
আগ্নেয়গিরি ভাঙিয়াছে ধরা,—নদী ভাঙিয়াছে গিরির বাঁধ।
ধাতুরে গ্রাসিয়া বাঁচিতেছে গাছ, জীব বাঁচিতেছে গাছেরে খেয়ে,
অতীতে গ্রাসিয়া হ'ল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানেরই মেয়ে।
ব্যক্তিমাত্রে বহুরূপময়, নীতিধর্ম্ম বদ্‌লায় ক্ষণে ক্ষণে;
জীবনের প্রাণ চির-বিপ্লব,—স্থিতি নাহি তাহার পুরাতনে।
ভাঙার দাগ ত চারিধারে দেখি, দুনিয়াতে হেরি নিষ্ফল সব,
সবই অপূর্ণ বিশ্ব ব্যাপিয়া, শেষ পরিণাম শুধু পরাভব।
হিন্দু-গ্রীক ছাড়; ডারুইন্‌-কেপ্লার,—তারাই কল্কে পায়না হে!
রেডিয়াম এসে বাষ্প-তড়িতে ভিটেমাটি-ছাড়া করিল যে!
পরাজয়ই বটে উন্নতি, আর হারিল যাহারা তারাই বীর,
পরাজিত বীর কমেনা যাদের, অমরতা ভাগ্যে সেই জাতির।

দুনিয়ার গায়ে লেখা আছে দুই,— বিপ্লব, বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য,—তাহাই সার্থকতা।

যুবক বাঙলা পরাজয় আর বিফলতাকে ডরায় নাই। অসাধ্য-সাধনই তাহার একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল। এই অসাধ্য সাধনের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা অতীতের তোয়াক্কা রাখে নাই, অভিজ্ঞতার ধার ধারে নাই, ফেল-মারার ভয়ে জড় সড় হয় নাই। তাহাদের বিচারে বর্ত্তমানই একমাত্র কাল। ভবিষ্যৎকে গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য বর্ত্তমানের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিই ছিল তাহাদের জীবন-দর্শন।

আজ ১৯২৭ সন। অসাধ্য-সাধন আর বর্ত্তমান-নিষ্ঠা ধাপের পর ধাপে এক কথঞ্চিৎ উন্নত ঠাঁইয়ে আসিয়া খাড়া হইয়াছে। বাঙলার যৌবন-শক্তি এই উঁচু ঠাঁইয়ের মাপে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইতে পারিবে কি? এই ঠাঁইয়ে দাঁড়াইয়া যুবক বাঙলা প্রবীণদের দিকে তাকাইয়া বলিতে সাহসী হইবে কি,—

"দুনিয়ার গায়ে লেখা আছে দুই,—বিপ্লব, বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য, তাহাই সার্থকতা?"

দুনিয়া আজ বাঙলার যৌবনশক্তিকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। ভাঙন-গড়নের ক্ষমতা আছে কিনা তাহারই আবার যাচাই হইতেছে।

আজ অর্থশাস্ত্রের পালা। এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের অনেকেই কেতাব-পুঁথির ধার ধারেন না। অনেকে আবার কেতাবের পোকা বিশেষ। কেহ বা কাজের লোক, খুবই ব্যস্ত। তাঁহারা যুক্তি-তর্কের ধান্ধায় সময় খরচ করিতে অনভ্যস্ত। আবার অনেকে হয়ত তার্কিক। "কামের কথা পরে হবে" বলিয়া তাঁহারা তর্কের খাতিরে তর্ক চালাইতেই সুপটু।

জীবন আমাদের এইরূপ বিভিন্নতাময়। কিন্তু সকলেই যৌবনের ভাঙন-গড়নে মাতিবার জন্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছি। আর্থিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল চিন্তা-প্রণালী ও কর্ম্ম-প্রণালী এতদিন সনাতন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টাই বা বর্জ্জনীয় তাহার কিছু কিছু খতিয়ান করা আজকার উদ্দেশ্য। বিরাট বিশ্বকোষ ঘাড়ে বহিয়া আনি নাই। সকল কথা আলোচনা করা অসম্ভব। ক্ষমতারও বোধ হয় অভাব। আর, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে সেই সবও নেহাৎ সূত্রাকারে আলোচিত হইবে। মোটা সিদ্ধান্তগুলা দেখানো হইবে মাত্র।

বাড়্‌তির পথে আর্থিক বাঙ্‌লা

আমরা আজকাল যে বাঙ্‌লা দেশে বসবাস করিতেছি তাহার আকার-প্রকার "সেকেলে" বাঙ্‌লার মতন নয়। দেশটার ভিতর-বাহির দুইই বিলকুল বদলাইয়া যাইতেছে। এই রূপ-পরিবর্ত্তনের কথাটা সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। ধনদৌলতের রূপান্তর দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছে। আমাদের বাঙলায়ও তাহাই ঘটিতেছে, তবে বড় আস্তে আস্তে এই যা। যাহা হউক আর্থিক বাঙ্‌লার নবীন রূপের দুএকটা লক্ষণ দেখাইয়া আজকার আলোচনা সুরু করিতেছি।*

এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা

যন্ত্রপাতি, কল, লোহালক্কড় ইত্যাদির কারখানা বাংলা দেশে আজকাল মাত্র ১৩৫টা আছে। এই সমুদয়ে মজুর খাটে ২২,০০০ জন। কিন্তু এই ১৩৫টার ভিতর বাঙালীর তাঁবে ৩০টা কি ৩৫টার বেশী নাই। মোটের উপর বোধ হয় ১,৫০০ জন মজুরের অন্ন বাঙালী কারখানায় জুটিতেছে।

---

* অঙ্কগুলা ১৯২৫-২৬ সন সম্বন্ধে খাটিবে। এইগুলার উদ্দেশ্য দৃষ্টান্ত প্রদানমাত্র।

এই কারখানাগুলা "এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস" নামে সাধারণ্যে পরিচিত। মফঃস্বলের লোকেরা প্রায়ই এই সবের খবর রাখে না। কেন না ইহাদের প্রায় সবগুলাই কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলা দেশের মাত্র আট দশটা জেলায় যন্ত্রপাতির কারখানা চলিতেছে। সেই সবের কর্ত্তা হইতেছে রেল কোম্পানী অথবা কোনো বিদেশী বেপারী-সঙ্ঘ।

কয়লার খাদ

বাংলাদেশে কয়লার খাদ আছে ২৩৬টা। বাংলার খনি বলিলে এক কথায় রাণীগঞ্জ খনি বুঝা হইয়া থাকে। তবে ২৩৬টার ৪টা বাঁকুড়ায় আর ৩টা বীরভূমে অবস্থিত। ১৯২৫ সনে ৩১টা খনিতে কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে ১৬টা নতুন খাদ খোলা হইয়াছে।

১৯২৫ সনে গোটা ভারতে (ব্রহ্মদেশ সমেত) ৮১০টা কয়লার খাদ খোলা ছিল। খাদসম্পদে বাংলা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী বিহার ও উড়িষ্যা। এই প্রদেশে ৪৮৭টা খাদে কয়লার কাজ চলিয়া থাকে। অর্থাৎ বাংলার ডবলেরও বেশী খাদ বিহার-উড়িষ্যায় চলিতেছে।

২৩৬টা খাদের ভিতর ২০৩টাতে বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চালানো হয়। কিন্তু বিহার প্রদেশে, ৪৮৭টার ভিতর মাত্র ২৪৭টায় অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকে যন্ত্রপাতির চল আছে। যন্ত্রপাতির রেওয়াজ ভারতের বিভিন্ন কয়লার খাদে এখনো বেশী বাড়ে নাই। ৮১০টার ভিতর মাত্র ৪৭৪টায় আছে, ৩৩৬টায় এখনো নাই। এই হিসাবে বাংলার খাদগুলাকে উন্নত শ্রেণীর বলিতে হইবে।

১৯২৫ সনে বাংলার খাদে কয়লা উঠিয়াছিল ৪,৯১৩, ৮৫২ টন। বিহারের পরিমাণ ছিল ১৩,৯৩৯,২৪৪ টন, আর গোটা ভারতে ১৯,৯৬৯, ০৪১ টন। অর্থাৎ কয়লার উৎপাদনে বাংলা দেশের হিস্যা ভারতের প্রায় চার আনা।

বাংলায় কয়লার খাদে ১৯২৫ সনে মজুর খাটিয়াছিল ৪২,৭৮১। খনির ভিতর ২৭,৭৭৫, আর খনির উপর ১৫,০০৬ জন মজুর বাহাল ছিল। খনির ভিতর অর্থাৎ আন্তর্ভৌম কাণ্ডে ১৮,১৮১ জন কয়লা কাটাকাটি করিয়াছে আর ৯,৫৯৪ জন অন্যবিধ কাজে নিযুক্ত ছিল।

আন্তর্ভৌমদের ভিতর ছিল ১১,৯৯৫+৫৯৬০ পুরুষ। আর নারীর সংখ্যা ৬,১৭১+৩৬২৩। বালক-বালিকার সংখ্যা মাত্র ১৫+১১।

খনির উপর যত লোক বাহাল ছিল তাহাদের মধ্যে ১৮৪ জন বালক বালিকা। পুরুষের সংখ্যা ৯,৮৬১ আর নারীর সংখ্যা ৪,৯৬১।

কয়লার মজুরেরা গুন্‌তিতে বিহারে অবশ্য বাংলার চেয়ে বেশী। ঐ প্রদেশে মোট সংখ্যা ১,১৪,৬১১। ১৯১৫ সনে গোটা ভারতে খাদের কুলী ছিল সংখ্যায় ১,৭৩,১৪০। অর্থাৎ বাংলার কুলী গোটা ভারতের তুলনায় চার আনার কিছু কম।

খাদের কাজ দ্বিবিধ:—(১) ভিতরে আর (২) উপরে। প্রত্যেক কাজেই পুরুষ আর স্ত্রী দুই প্রকার মজুরই খাটিতেছে। এই সকল মজুরদের বেতন কিরূপ? প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত,—কাহাকে কত ঘণ্টা খাটিতে হয়?

খনির ভিতরে কাজ করে দুই শ্রেণীর পুরুষ। এক শ্রেণীর লোক কয়লা কাটাকাটি করে। তাহারা সপ্তাহে খাটে ৪২ ঘণ্টা করিয়া। আর এক শ্রেণীর পুরুষ অন্যবিধ কাজে বাহাল, তাহাদিগকে খাটিতে হয় ৪৮ ঘণ্টা। সাপ্তাহিক মজুরি প্রথম শ্রেণীরই বেশী,—৩।৵০ হিসাবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাপ্তাহিক মজুরি ৩৲ টাকা,—অর্থাৎ ফী ঘণ্টায় এক আনা।

আন্তর্ভৌম মেয়েরা খাটে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা। মজুরি তাহাদের সাপ্তাহিক ১৸৵০ আনা।

খনির উপরে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই খাটে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া। পুরুষের বেতন ২৷৵০ আনা, মেয়েরা পায় ১৷০ দেড় টাকা।

মজুরি বাংলার চেয়ে বিহারে ভাল। তবে ঐ প্রদেশে সপ্তাহে খাটিতে হয় খনির উপরে ৫৪ ঘণ্টা করিয়া। কিন্তু পুরুষের বেতন সপ্তাহে ৩৷০ আনা অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি এক আনার কিছু বেশী। অপরদিকে বাংলায় মজুরেরা সেই শ্রেণীর কাজের জন্য পায় ঘণ্টায় এক আনার কিছু কম।

বিহারে মেয়েরা যেখানে ৫৪ ঘণ্টা খাটে সেখানে বেতন তাদের ২।০ আনা, অর্থাৎ ঘণ্টা প্রতি প্রায় আড়াই পয়সা। কিন্তু বাংলায় মেয়েরা সেই শ্রেণীর কাজে ঘণ্টা প্রতি দুই পয়সা মাত্র রোজগার করে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক তথ্য এই যে,—আন্তর্ভৌম মেয়েরা বিহারে যত ঘণ্টা (৪৮) খাটে বাংলায়ও ঠিক তত ঘণ্টাই খাটে। অথচ বিহারে বেতন ২৷০ আনা, আর বাংলায় ১৸৵০ আনা। এই সকল কম-বেশী সম্বন্ধে খোঁজ লওয়া আবশ্যক। যাক্ সে কথা।

কুলী প্রতি কত টন কয়লা বাংলা দেশে উঠে? আন্তর্ভৌম কুলীদের সংখ্যা গুণিলে গড় হয় ১৮৭ টন, আর খনির উপর-ভিতর দুই অঞ্চলের সকল কুলী (মেয়ে সমেত) গুণিলে গড় হয় ১২০ টন। বিলাতে এই গড়টা ২৭৭ টন আর ২২৪ টন।

এইখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, বিলাতের খনিতে মেয়ে-মজুর কাজ করে না। কাজেই সেখানে কুলীদের কর্ম্মক্ষমতা গড়পড়তা বেশী দেখা যাইবার কথা।

অধিকন্তু বাংলার খনিতে বিলাতের খনির মতন কলযন্ত্র এখনো বেশী চলে না। বিশেষতঃ শারীরিক মেহনৎ বাঁচাইবার যন্ত্র কম ব্যবহৃত হয়। কাজেই কুলী প্রতি কাজের পরিমাণ বাংলায় বেশী দেখা যায় না।

বাঙালীর তাঁবে যেকয়টা ব্যাঙ্ক এবং লোন আফিস চলিতেছে

তাহার ভিতর কোনো কোনোটায় ১৯২৫ সনে দশ লাখের বেশী টাকা জনগণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে রক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের জমা হইয়াছিল ৬৫,৮৪,০০০৲। এটা অবশ্য এখন আর নাই। তাহার পরেই দেখিতে পাই জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কের ঠাঁই। এই ব্যাঙ্কে ৫২,৩৮,৬৯৭৲ জনসাধারণের নামে মজুত ছিল।

ব্যাঙ্কে বাঙালীর জমা

৪৩,৭০,২২২৲ ছিল যশোহর লোন কোম্পানীর নিকট এবং ৩৯,৯৮,০০০৲ ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশ্যনের নিকট। ফরিদপুর লোন আফিসে লোকেরা জমা রাখিয়াছিল ২৫,৩৮,১০৫৲। বগুড়ার লোন আফিসে ১৫,৭৯,৩০৩৲। আর রংপুরের আফিসে জমা ছিল ১১,৩৪,৩৪৮৲ টাকা।

বুঝিতে হইবে যে, মফঃস্বলেও বাংলার নরনারী আজকাল পরের হাতে নিজ টাকা খাটাইতে দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে স্থদ গণিতে শিখিতেছে। বাঙালীর চরিত্রে এই এক নতুনত্ব।

জলপাইগুড়ি জেলায় আটিয়াবাড়ী চা-কোম্পানী ১৯২৫ সনে শতকরা ২০০৲ লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। ১৯২৪ সনে লভ্যাংশ ছিল ৩৫০%, ১৯২৩ সনে ২৫০% এবং ১৯২১ সনে ১৩৫%। এই কোম্পানীর মূলধন ৭,৫০,০৯০৲। প্রতি অংশের মূল্য ৫০৲। কিন্তু বর্ত্তমানে এই পঞ্চাশ টাকার এক-একটি শেয়ার কিনিতে হইলে ১৩০০৲ টাকা লাগে।

জলপাইগুড়ির চা

চায়ের ব্যবসায়ে জলপাইগুড়ির কোম্পানীগুলা বেশ মোটা লাভ উশুল করিতেছে। শতকরা ১২৪৲, ১৫০৲, ২০০৲, ১৯২৫ সনের হার। কিন্তু এই সব কোম্পানীই ১৯২৪ সনে ২৪০%, ৩২৫%, ৩৫০% লাভ দেখাইয়াছিল। ১৯২২ সনে আবার ইহাদেরই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে

শতকরা ১০০৲, ১৫০৲, ১৩৫৲ টাকা। বৎসর বৎসর এইরূপ খাড়া উঠা-নামা চায়ের ব্যবসাকে অতিমাত্রায় অনিশ্চয়তাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জুয়ায় শেষ রক্ষা করিতে হইলে পাকা খেলোয়াড় হওয়া আবশ্যক।

চায়ের বাগানে ও ব বসায় আজকালকার বাঙালা একটা নয়া সম্পদের খনি চুঁড়িয়া পাইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় খনির মতন এই খনিও ভারতসন্তানের হাতে কতদিন থাকিবে তাহা বিশেষ সতর্কভাবে আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

যখনই আমাদের দেশে স্বদেশী কোনো কারবারে কোনো প্রকার দুর্যোগ উপস্থিত হয় তখনই আমরা সোজাসুজি বিদেশী বণিক, শিল্পপতি আর ধনকুবেরদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে লাগিয়া যাই। আজ ল্যাঙ্কাশিয়ারের দোষ দেখি, কাল দেখি জাপানী তাঁতীদের, পরশু হয়ত মার্কিণ পুঁজিপতিরাই আমাদের আর্থিক বিফলতার মোটা কারণ বলিয়া মালুম হইতে থাকে। আর আজকাল যখন-তখন যেখানে সেখানে গবর্মেণ্টের রেল-নীতি আর মুদ্রানীতিকে ভারতীয় দারিদ্র্যের আর বেকার-সমস্যার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-দক্ষ আর স্বদেশ-সেবক পণ্ডিতগণের রেওয়াজ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"বিদেশী সয়তান" (চীনা কায়দায় বলা যাইতে পারে, "ফরেণ ডেভিল") গুলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আর্থিক ক্ষতির কারণ নয় এরূপ বলা হইতেছে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসল কারণ আর জবর কারণ হইতেছে ঘরোআ। আমাদের শিল্পী-বণিক-চাষী-পুঁজিপতিরা অনেক সময়েই অকর্ম্মণ্য, ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ আর দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে নিরেট আনাড়ি। এক কথায়,—বর্ত্তমান জগতের আর্থিক আখড়ায় ভারতসন্তান নেহাৎ চ্যাংড়া। আমরা অতি-কচি শিশু অথচ লড়িতে হয় সর্ব্বদা জবরদস্ত পালোয়ানদের সঙ্গে।

চায়ের দুনিয়ায় বিদেশীরা বাঙ্গালীকে যখন-তখন কুপোকাৎ করিয়া মারিতে পারে। যদি মারে, ত টেক্‌নিক্যাল কর্ম্মদক্ষতা আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসিদ্ধ কৃষি-শিল্প বাণিজ্য চালাইবার জোরেই মারিবে। অতি স্বাভাবিক কারণেই আমরা মরিব। চায়ের ব্যবসায় বিদেশী কোম্পানীরা যে সকল যন্ত্রঘটিত, চাষ-ঘটিত, বাজার-ঘটিত আর শাসন-ঘটিত কায়দা কায়েম করিতেছে সেই সকল কায়দার সঙ্গে টক্কর দিবার যোগ্যতা যদি বাঙালীর থাকে তাহা হইলেই বাঙালী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

একটা আশার কথা এই যে, বাঙালী নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে রাজি নয়। নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিবার মতন লোক দু'একজন এখানে ওখানে দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতাটা পুরাপুরি বুঝিবার ক্ষমতা কয়জন বাঙালীর আছে জানি না। অথবা থাকিলেও দুর্ব্বলতা শুধরাইবার জন্য যে-সকল কর্ম্ম-কৌশল অবলম্বন করা উচিত তাহা অবলম্বন করা বাঙালী চা-ব্যবসায়ীদের হাড়ে কুলাইবে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র।

জলপাইগুড়ির "জনমত" চায়ের ব্যবসায় বাঙালীর ভবিষ্যৎ কিছু অন্ধকারময় দেখিতেছেন। ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার দুএকটা কায়দাও এই কাগজে বাৎলানো হইতেছে। এই সকল দিকে অনেক বাঙালীর একসঙ্গে দৃষ্টি পড়া আবশ্যক।

খালে খালে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করা সম্ভব। পথে নদীও পড়ে। পথটা ৮৩৪ মাইল লম্বা। সরকারী খাল-বিভাগের অধীনে এই জলপথ শাসিত হইয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সনে এই পথের জন্য খরচ পড়িয়াছিল ৬,২৩,৪০৩ টাকা। মালের নৌকা ইত্যাদি হইতে উসুল হইয়াছিল মাত্র ৪,৭৪,২৪১ টাকা। ১,৪৯,১৬২ টাকা লোকসান পড়ে। এই দেড়লাখ টাকা লোকসানের জন্য দায়ী প্রধানতঃ কলিকাতার আশেপাশের পুল-মেরামতের কাজ।

খাল সম্পদে বাঙলা

তাহা ছাড়া দুইটা "ড্রেজার" মেরামত করিতে হইয়াছিল। অধিকন্তু দোআগ্গা খালটাও চাঁছিতে হইয়াছে। এই জন্য অতিরিক্ত খরচ পড়িয়াছে।

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রায় ৭০ মাইল লম্বা বড় বড় খাল আছে। শাখা-প্রশাখা প্রায় ২৮৫ মাইল। খালের সাহায্যে চাষের জন্য জলসেচ চলে। নৌকাপথে চলাফেরা করাও সম্ভব। ফী বৎসর প্রায় ২,২৫,০০০ বিঘা জমি খালের জলে চাষ করা হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ মাইল লম্বা পথ জলযানের যাতায়াতের জন্য খোলা রহিয়াছে।

ফরিদপুর জেলায় মধুমতীর সঙ্গে কুমার দরিয়ার যোগাযোগ কায়েম করা হইয়াছে। এই খালটা মাদারীপুর বিল পথ নামে পরিচিত। খাল রক্ষা করার এক বড় ধান্ধা হইতেছে তলা চাঁছিয়া দুরস্ত রাখা। ১৯২৫-২৬ সনে কুমার নদীর এক অংশ চাঁছিতে বিস্তর টাকা খরচ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া কোথাও কোথাও নদী ও খালের আশপাশ কাটিয়া কিছু বিস্তৃত করা আবশ্যক হয়। এইজন্যও গত বৎসর টাকা লাগিয়াছে অনেক। মোটের উপর এই দুই কাজের জন্য ১,৩৪ ৯৫৬ টাকা খরচ হইয়াছে। প্রায় ১৩ মাইল লম্বা পথ ড্রেজ্ করিতে (চাঁছিতে) হইয়াছিল।

প্রায় সকল নদী ও খাল হইতেই যাতায়াতের কর আদায় করা গবর্মেণ্টের দস্তুর। কোনো কোনো জেলার নদীগুলাকে করমুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে নদীয়া জেলার নদীগুলা এই হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কাজেই নদীপথে গবর্মেণ্টের কোনো আয় নাই। তবে নদীগুলা দুরস্ত রাখিতে খরচ পড়ে। ১৯২৫-২৬ সনে খরচের মাত্রা ৩১,৪৩৩ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর পরিমাণ ছিল ২৬,৭৫২ টাকা। প্রায় ৪॥০ হাজার টাকা বেশী।

খাল-শাসনের প্রণালী নানাবিধ। হাওড়া জেলার একটা ছোট খাল

ইজারা দেওয়া হইয়াছে। ইজারার মেয়াদ ছয় বৎসর। ১৯২১ সনের ১৫ জুন মেয়াদ সুরু হইয়াছে। ইজারাদার ফী বৎসর ২,০০০ টাকা করিয়া গবর্মেণ্টকে দিতে বাধ্য। খাল মেরামত করার দায়িত্ব তাহার নিজের ঘাড়ে। তবে সরকারী সেচ-বিভাগের পরামর্শ ও হুকুম অনুসারে খাল-মেরামত ও খাল-রক্ষা কাজ চালাইতে হয়। খালটা দামোদর আর রূপ-নারায়ণ এই দুই নদীকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে। গায়ঘাটা-বক্সি খাল নামে ইহা পরিচিত।

খালগুলা কোথাও যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির জন্য কাটা হইয়াছে। কোথাও বা চাষের জন্য জলসেচই খাল কাটার প্রধান উদ্দেশ্য। কোথাও কোথাও দুই উদ্দেশ্যই এক সঙ্গে সিদ্ধ হয়। আবার পানীয় জল সরবরাহও কোনো কোনো অঞ্চলে প্রধান বা অন্যতম উদ্দেশ্য. এই উদ্দেশ্য লইয়াই ইডেন খাল কাটা হইয়াছিল। খালটা বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলায় অবস্থিত। আজকাল এই খালের জল চাষের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সনে প্রায় ৭২,০০০ বিঘা জমি এই জলে চষা হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে চষা হইয়াছিল ৬৩,০০০ বিঘা। দামোদরের খালটা সম্পূর্ণ হইলে ইডেন খালের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত প্রণালীতে কায়েম হইতে পারিবে। তখন ইডেন খালের জলাভাব থাকিবে না।

চব্বিশ পরগণার নবি ইচ্ছাপুর খালটা বাড়ানো হইতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে এই জন্য ৩৮,৭৬৫ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার আমিরাবাদ খালের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

যশোহর জেলার মেহেরপুর-ভৈরব আর গোব্রানালা খালেরও উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভৈরবের উন্নতিবিধানও আলোচিত হইয়াছে। নবগঙ্গার সঙ্গে ভৈরবের যোগাযোগও জল্পন-কল্পনের মধ্যে আছে।

খুলনা জেলার আলাইপুর খালের উন্নতি-সাধন সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে।

নদনদীর জলে ডুনিয়া ধোয়া-পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। আবার ঘটনাচক্রে অনেক সময়ে নদনদীকেও ধুইয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক হয়। এইরূপ নদী-ধোলাইয়ের কারবারকে বলে "ফ্লাশিং"। এই জন্য দরকার হয় এক দরিয়ার পানি আর এক দরিয়ায় আনিয়া ঢালা বা বহানো। মরা নদীগুলাকে তাজা ও চাঙ্গা করিয়া তুলিবার পক্ষে এই এক বড় উপায়। বাংলাদেশের অনেক নদীর পক্ষেই এইরূপ ফ্লাশিং-চিকিৎসা জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। নদীয়া জেলার নদীগুলা সম্বন্ধে এই দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে মাপা-জোকার কাজ কিছু কিছু হইয়াছে। মাথাভাঙ্গার জলে নবগঙ্গাকে জিয়াইয়া রাখা যায় কিনা বুঝিবার জন্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। জলঙ্গির জলের উপরও দৃষ্টি আছে।

কো অপারেটিভ্ সোসাইটি

১৯২৪ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটিগুলির সংখ্যা ৯,৩৪২ হইতে ১১,০৮১ এবং সভ্যসংখ্যা ৩৪০,১৫৯ হইতে ৩৮৬,০৫০ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২৪ সনে ১৯.৪ এবং ১৯২৩ সনে ১৭.৪ হারে সমিতি-সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৫ সনে ১৮.৩ হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে সভ্যসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৯ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১২.৬। কিন্তু ১৯২৫ সনে বৃদ্ধির হার হইয়াছে ১৩.৪।

মূলধন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫.০৭ হইতে ৬.১৮ কোটি টাকা। ১৯২৪ সনে বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.০৭ এবং ১৯২৩ সনে ১৭.৬। কিন্তু ১৯২৫ সনে বৃদ্ধির হার হইয়াছে ২১.৮। কেন্দ্রীয় এবং প্রাথমিক সমিতিগুলির ফাণ্ড পৃথক ভাবে গণ্য করিয়া যে সমস্ত খরচ হইয়াছে, তাহা না ধরিলে কো-অপারেটিভ আন্দোলনে যে টাকাটা খাটিয়াছে, তাহা ৩.৩২ ক্রোর হইতে ৩.৯৮ ক্রোর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। আর সমিতি এবং সমিতির সভ্যদের নিকট হইতে যে টাকাটা পাওয়া গিয়াছে তাহা ১.৫৬ হইতে ১.৮১ ক্রোর

পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। আন্দোলনের জন্য যে টাকাটা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী।

১৯২৫ সনে এই সমিতির ফাণ্ডে ৬২·৭১ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর হইতে ২৪ লক্ষ টাকা বেশী—আদায় হইয়াছে। পাঁচ বৎসরেও এরূপ হয় নাই। অনাদায়ী টাকা ৫১·৭৮ লক্ষ হইতে ৪৯·২৬ লক্ষে নামিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষশেষে শতকরা ২৮·৫ হিসাবে অনাদায়ী টাকা পড়িয়া থাকিবে।

এই সকল সমিতির সংখ্যা ২২ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ৪,৪৪১ হইতে ৫,৩৩৭ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাদের যে মূলধন খাটিতেছিল, তাহার মোট টাকা ১,৫৬,১৬১, হইতে ৯৪,৪১৯ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। "সুন্দরবন সরবরাহ ও বিক্রয় সমিতি" যে মূলধন খাটাইতেছিল, তাহা কমিয়া যাওয়ায় ঐরূপ হইয়াছে। সুন্দরবন সমিতিগুলি কিন্তু তাহাদের দেনার খানিকটা অংশ শোধ দিয়াছে এবং ব্যবসা ভাল চলায় লাভও অধিক করিয়াছে। এই শ্রেণীর সমস্ত সমিতির মোট লাভ ১৭,৭০১, টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৩,৬২০, টাকা।

ধান্য-বিক্রয় সমিতিগুলি যাহাতে তাহাদের মজুত ধান সুবিধাজনক হারে বিক্রয় করিতে পারে, তাহার সাহায্য-কল্পে একটা স্কীম করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হইয়াছে। সেই অনুমোদন অনুসারে বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ অর্গানিজেশন সমিতি লিমিটেড কর্ত্তৃক কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় গুদাম স্থাপিত হইবে। সমিতি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে গুদামের খরচ বাবদ প্রথম তিন বৎসর টাকা পাইবেন। গবর্মেণ্ট সামান্য কয়েকটি ধান ও পাট বিক্রয় সমিতির জন্য গোড়ায় একদল উপযুক্ত তদবির-কারক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন এবং সমিতিগুলির দ্রব্য মজুত রাখিবার স্থান-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে টাকা ধার দিবেন—স্কীমে এইরূপ কথা আছে।

এই সমস্ত সমিতির সংখ্যা ১৭৩ হইতে ২৬৮ পর্য্যন্ত, সভ্যসংখ্যা ৭,৩৭৬ হইতে ১০,৩৬৮ এবং যে মূলধন খাটিয়াছে তাহা ১,২৯,৫৯৮৲ হইতে ১,৯০,১২৪, টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। বৰ্দ্ধমানে তিনটি, হুগলীতে চারিটি, মেদিনীপুরে একটি, এবং বগুড়ায় একটি সমিতি রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সমিতি আছে বাঁকুড়া ও বীরভূমে। বাঁকুড়ায় ১৪২টি সমিতি। তাহার অধীন জলসেচন-যোগ্য ক্ষেত্রের মোট পরিমাণ ছিল ২৫,৫৫৯ বিঘা। বীরভূমে আছে ১১৬টি সমিতি এবং তাহার অধীন ১৫,৫০২ বিঘা পরিমাণ জলসেচনযোগ্য ক্ষেত্র। তথায় পূৰ্ব্ব বৎসর ছিল ৫৮টি সমিতি এবং তাঁহার তাঁবে ক্ষেত্র ছিল ৯,৭০৮ বিঘা। আলোচ্য বর্ষে বাঁকুড়ায় পুষ্করিণী-খনন-কাৰ্য্য চলিয়াছে এবং বীরভূমে চলিয়াছে একটি নূতন খাল-কাটার কাজ।

৫৪টা হইতে ৬৩টা পর্য্যন্ত এইসব সমিতির সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং তাহাদের সভ্যসংখ্যা বাড়িয়াছে ২,১৫৫ হইতে ২,৯০৯ পর্য্যন্ত। ৫৬টি সমিতি টাকা সম্বন্ধে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে। প্রতি সভ্য হিসাবে দুধের উৎপাদন যাহা হইয়াছে, তাহা তিন বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ। তিন বৎসরে প্রত্যেক সমিতি-হিসাবে দুধের উৎপাদন গড়ে দৈনিক ২৬.৯ হইতে ৫২.৭ সের পর্যান্ত বাড়িয়াছে। এইসব সমিতির সকলগুলাই কলিকাতা দুগ্ধ-ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ইউনিয়ন আলোচ্য বর্ষে দুধ বেচিয়া ২,৪৭,৯৮৮৲ টাকা পাইয়াছে। ইউনিয়ন কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য পাইতেছে। কলিকাতার জন-সাধারণের স্বাস্থ্য এবং দুধ যোগানের কারবারটাকে উন্নত করিবার জন্য ইউনিয়ন যাহাতে তাহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন তাহাকে টাকা ধার দিয়াছেন ও অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন।

ষ্টোর্স্ ও সরবরাহ-সমিতিগুলির কাজ ভাল হয় নাই। এই শ্রেণীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতেছে কলিকাতার স্বদেশী কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিমিটেড। কিন্তু তাহা ১৮২৫ সনে ফেল মারিয়াছে।

ঢাকায় ৮টি শঙ্খ-সমিতি বেশ কাজ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায় এই বৎসর একটি কাঁসারী-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা কম লাভে কাজ করিয়াছে। গবমেণ্ট এই সমিতিকে ৭,০০০৲ টাকা ধার দিয়াছেন। এই বৎসর তাঁতীদের সমিতিও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। মুর্শীদাবাদ জেলায় দোপ্পুকুরিয়ায় গুটি হইতে রেশম গুটাইবার শ্রমিকদের একটি সমিতি-সংগঠন এই বর্ষে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গবমেণ্ট এই সমিতিকে ৪,০০০৲ টাকা ধার দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শিল্পসমিতি ৬ হইতে ৮টি পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। এই বর্ষে ঢাকা ইউনিয়ন খুব সন্তোষজনক কাজ দেখাইয়াছে, এবং এই শ্রেণীর ইউনিয়নের মধ্যে তাহার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

১৯২৫ সনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯১। এই সকল ব্যাঙ্কের অন্তর্গত সমিতিগুলির সংখ্যা ৮,২৮৯ হইতে ৮,৭৪৬ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। অংশীদারদের টাকা যাহা সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়া গিয়াছে তাহা বাড়িয়াছে ২১·৫৪ হইতে ২৫·২৯ লাখ পর্য্যন্ত। রিজার্ভ ফাণ্ড ৯ ৪৭ হইতে ১১ ৪১ লাখ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সর্ব্বসমেত যে মূলধন খাটিয়াছে তাহা ১ ৭৫ ক্রোর হইতে ২·০৫ ক্রোর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৯২৫ সনে সমিতিগুলি হইতে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ৮৫·৪৭ লাখ। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ৩২ ১৬ লাখ বেশী।

এইবার রেলের কথা বলিব। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে খাস সরকারী সম্পত্তি এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। রেলওয়ের বড়কর্ত্তা বা এজেণ্ট ভারত সরকারের রেলওয়ে-দপ্তরের নিকট জবাবদিহি থাকিতে বাধ্য। লাইনটি গোটা বাংলা জুড়িয়া রহিয়াছে। বাংলার অধিকাংশ প্রধান প্রধান স্থানকে ইহার

ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

আওতায় আনা হইয়াছে। ১৮৫৭ সনে ইহার প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৭ সনে অন্যান্য রেলের সঙ্গে ইহার সংযোগ কায়েম করা হয়।

বাংলার বুকের উপর অনেক ছোট-বড় নদী-নালা প্রবাহিত। এইগুলি রেল লাইন বিস্তারের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েকে পুল নির্ম্মাণের জন্য অনেক খরচ করিতে হইয়াছে। সারাতে পদ্মার উপরের পুল তাহার নিদর্শন। শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত প্রশস্ত রেল বিস্তার করায়ও অনেক খরচ পড়িয়াছে। তবে উত্তর-বঙ্গ ও কলিকাতার মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ কমিয়া আসিল।

উত্তরে এই রেলওয়েটি ভূটান সীমান্তে হিমালয়ের পা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। পশ্চিমে বিহার প্রদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের সঙ্গে ইহার যোগ আছে। পূর্ব্বে আসামের কতকটা অংশ ইহার আওতায় আসিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দরবনের সীমানা পর্য্যন্ত ইহা বিস্তার-লাভ করিয়াছে। একমাত্র বাখরগঞ্জ ছাড়া বাংলার আর সকল জেলাতেই রেল লাইন আছে। বাখরগঞ্জেও রেল বিস্তারের প্রস্তাব চলিতেছে। বহু নদী-নালা-বিধৌত বাখরগঞ্জ জেলায় ইহা কোনো দিন সম্ভব হইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান। সুন্দরবনের মধ্যে আরও রেল বিস্তারের সম্ভাবনা আছে।

পাট বাংলার প্রধান ফসল। সুতরাং ইহার চলাচল হইতে রেলওয়ের খুব বেশী আয় হয়। বাংলার প্রত্যেক জেলাতে পাট জন্মে; কিন্তু সব চাইতে বেশী জন্মে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলাতে। এই সমস্ত জেলায় ধানের আবাদ কম হয়, কারণ পাট ও ধান একই মরশুমের ফসল। উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায় এবং আসাম প্রদেশের কয়েকটি জেলায় ধানের আবাদ বেশী। এই সমস্ত স্থানের ধান ও চাউল চালানীতে রেলওয়ের বেশী আয় হয়। এতদ্ব্যতীত

চা-প্রধান উত্তরবঙ্গ ও আসাম রেলওয়ের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

বাখরগঞ্জে রেল লাইন না থাকাতে এই জেলার বিরাট ধান ও চাউলের রপ্তানির লভ্যাংশ হইতে রেলওয়ে বঞ্চিত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ হইতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সাধারণতঃ নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতি জলযানে ধান ও চাউল প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১৮৮৭ সনে ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছিল ৯৪,৩০,৩৯৯ টাকা এবং ইহাতে ৬৭,৩৩,৩০৪ জন আরোহী চড়িয়াছিল। ১৮৯৭ সনের আয় ১,৪৭,৬২,২৩৩ টাকা, আরোহী ১,০৭,৭৭,০০০ জন এবং ১৫,৩৬,৯৩৯ টন মালের চলাচল ঘটিয়াছিল। ১৯০৭ সনে ইহাতে ২,৪২,২৫,০০০ আরোহী যাতায়াত করে ও ৪১,০১,০০০ টন মাল চালান দেওয়া হয়। ইহার নেট আয় হইয়াছিল ২,৬৯,০০,২৪২ টাকা। ১৯১৭ সনের আয়, আরোহী ও মালের ওজন যথাক্রমে, ৩,৭৪,৯৪,৫৫১ টাকা, ৩,৭২,৯২,৮০০ জন এবং ৫৩,৬৮,০০০ টন। ১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসর ৪,৬৫,২৬,৬৫০ জন আরোহী রেলে গমনাগমন করিয়াছে এবং ৬৮,৬৭,৭৫০ টন মাল চালান করা হইয়াছে। ইহার বাবদ রেলকোম্পানীর মোট আয় হইয়াছে ৬,৪৯,৫৪,৫৯১ টাকা। ঐ বৎসর রেলে দশ লক্ষ টন পাট, আড়াই লক্ষ মণ ধান-চাউল এবং পঞ্চাশ হাজার টন চা বিভিন্ন স্থানে চালান করা হয়।

বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথগুলা একত্রে লম্বায় ৩৮,৫৭৯ মাইল। এই সব তৈয়ারী করিতে খরচ পড়িয়াছে ৭৫৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক এক মাইল পথের খরচ গড়পড়তা ১,৯৫,৪৪৩। মাইল প্রতি প্রায় ২ লাখ টাকা ধরা যাইতে পারে।

ভারতের রেল সম্পদ

ফী বৎসর মোটের উপর ৬০ কোটি লোক রেলপথে যাতায়াত করে।

আর মাল চলাচলের পরিমাণ ৮ কোটি টন। অর্থাৎ ভারতের লোক-সংখ্যা সংক্ষেপে ৩০ কোটি ধরিয়া লইলে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া রেলে মোসাফিরি করে। আর ফী মোসাফির গড়পড়তা প্রায় সিকি টন (সাত মণ) মাল লইয়া চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত।

১৯২৫-২৬ সনে রেলের লাভ ১৯২৪-২৫ সনের সমান হয় নাই। তবুও ৯ কোটি ২৬ লাখ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে মূল পুঁজির উপর শতকরা ৫·৩১ টাকা পড়ে। ১৯২৪-২৫ সনে নিট লাভ ছিল ১৩ কোটি ১৬ লাখ টাকা। দুই বৎসরের লাভ একত্রে ২২ কোটি ৪২ লাখ।

এই লাভটা দুই হিস্যায় বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২ কোটি টাকা জমা হইয়াছে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সরকারী খাজনা-বিভাগে। আর রেল "রিজার্ভ" নামক রেলশাসনের মজুত-গচ্ছিত বিভাগে জমা করিয়া রাখা হইয়াছে ১০ কোটি টাকা। কোনো বৎসর লোকসান ঘটিলে অথবা অতিরিক্ত খরচের দরকার পড়িলে এই গচ্ছিত ভাঙিয়া খরচ করা চলিবে।

আমাদের দেশে চাষীর উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে সু-বর্ষা, কু-বর্ষার উপর। বর্ষা ঋতু এক হিসাবে সমগ্র আর্থিক ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ। গবর্ণমেণ্টের সরকারী খাজনার হ্রাস-বৃদ্ধি সু-বর্ষা কু-বর্ষার উপর নির্ভর করে। আবার রেল-আয়ের উঠানামাও বর্ষার প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কেননা চাষ-আবাদে মাল বেশী কি কম উৎপন্ন হইল তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় রেল-পথে মাল-চলাচল বেশী কি কম হইবে।

কাজেই "মন্সুন"-ঋতুর সু-কু আলোচনা করা আর বর্ষার ঠিকুজি রাখা গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চি-বিভাগের মতন ভারতীয় রেল-কোম্পানারও বড় ধান্ধা। তাহার উপর নদনদীতে বন্যার মাত্রা বাড়িলে-কমিলেও রেল বিভাগকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। অর্থাৎ সকল প্রকারে চাষ-আবাদের উন্নতি-ঘটা রেল-কোম্পানীর আসল স্বার্থ।

দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়লা-চালানের সুবন্দোবস্ত করা রেল-কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মালগাড়ী গুন্‌তিতে ছিল কম। তখনকার দিনে যে খাদে কয়লা বেশী উঠিত সেই খাদের জন্য বেশী গাড়ী যোগান হইত। কাজেই বড় বড় খাদের কাছেই মালগাড়ীর ডিপো থাকিত বড়। আর তাহার ফলে কয়লার ক্রেতারাও বড় বড় খাদেরই খরিদ্দার হইবার সুযোগ পাইত। ছোট ছোট খাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা ছিল যার পর নাই অনিষ্টকর।

১৯২৪-২৬ সনে মালগাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। গাড়ীগুলা ছোট-বড় মাঝারি সকল প্রকার খাদের কয়লাই বহিয়া লইবার জন্য যেখানে সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারে। কাজেই বড় খাদের মালিকেরা এখন আর অন্যায় সুযোগ ভোগ করিতে পায় না। বড় খাদের কয়লায় আর ছোট খাদের কয়লায় টক্কর চলিতেছে। খরিদ্দারেরা এখন একসঙ্গে সকল খাদের কয়লার দর যাচাই করিয়া কয়লা খরিদ করিতে সমর্থ। ছোট খাদের কয়লা পছন্দ হইলেও কোনো ক্ষতি নাই। কেননা সেখান হইতে মাল বহিয়া আনিবার জন্য গাড়ী পাওয়া যায়। ফলতঃ টক্করের ফলে কয়লার বাজার অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু উঁচু শ্রেণীর, মাঝারি শ্রেণীর আর নিম্ন শ্রেণীর কয়লা নামে নানাপ্রকার কয়লা বাজারে দেখা দিয়াছে। আজকালকার বাজারে শ্রেণী হিসাবে কয়লার দরও স্বতন্ত্র। নিম্ন শ্রেণীর কয়লা বাজারে আজকাল বিক্রী করা কঠিন।

কয়লা-চালানের নতুন সুযোগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আজকাল মাল গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। আসল কথা সংখ্যা-বৃদ্ধিই মালগাড়ীর যোগানে উন্নতি বিধানের একমাত্র কারণ নয়। মালগাড়ীর জোগানে উন্নতি অনেকগুলা বিভিন্ন রকমের ছোট-বড়-মাঝারি উন্নতির উপর নির্ভর করিয়াছে। অর্থাৎ নতুন নতুন মালগাড়ীর সংখ্যা না বাড়িলেও একমাত্র

ঐ সকল উন্নতি দুই চারিটা ঘটিলেই মালগাড়ীর জোগানে উন্নতি দেখা দিত।

একটা বড় কারণ হইতেছে গাড়ীগুলা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার সুব্যবস্থা। মালটা পাইবামাত্র তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করা আর এক কারণ। এই অবস্থায় কোনো এক জায়গায় গাড়ীগুলা বেশীক্ষণ নিশ্চলভাবে ফেলিয়া রাখিতে হয় না। অধিকন্তু গাড়ীগুলা যাহাতে এক ক্ষেপ শেষ করিবামাত্র নিজ নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও একটা বড় কথা। এই সবই শাসন-সম্পর্কিত কাজ। নতুন গাড়ী তৈয়ারী না করিয়াও একমাত্র গাড়ী-শাসনের উন্নতি সাধন করিলেই গাড়ী-জোগান উন্নত হইতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শাসন বিষয়ক উন্নতি একটা উল্লেখযোগ্য বস্তু।

গাড়ী-বিষয়ক শাসনে উন্নতি একমাত্র কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান বা সময়-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে না। এটাও একটা কটমট টেক্‌নিক্যাল চিজ। রেলপথগুলাকে শক্ত করা দরকার হয়। রেলের বাঁধ পুল ইত্যাদি অনুষ্ঠানও মজবুত করিয়া রাখা আর একটা উপায়। ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী সাজাইবার গুছাইবার জন্য সুবিস্তৃত উঠান চাই। এই উঠান বাড়ানোর অর্থ কতকগুলা নতুন নতুন রেল পাতিবার ব্যবস্থা করা। কোনো কোনো রেল লাইনে রাস্তাটার উপর এক সঙ্গে পাশাপাশি দুইটা গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করা অন্যতম উপায়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে এইরূপ পাশাপাশি ডবল রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। মাল-গাড়ীর গতি বাড়াইয়া দেওয়া একটা বড় কথা। তাহার জন্য আবার নতুন এঞ্জিনের ব্যবস্থা করা দরকার। অধিকন্তু মাল গাড়ীর কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যখন তখন মেরামতের জন্য গাড়ীগুলাকে যদি কারখানায় পাঠাইতে হয় তাহা হইলে উপযুক্তসংখ্যক গাড়ী অনেক

সময়েই জুটিতে পারে না। গাড়ীর কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইবার অর্থ বেশী দামের উৎকৃষ্ট সরঞ্জামের গাড়া তৈয়ারী করা। এক সঙ্গে এত দিকে উন্নতি সাধন করিতে পারিলে গাড়ী-শাসনে উন্নতি আপনা-আপনিই ঘটিয়া থাকে। আর তখন গাড়ী-জোগানের উন্নতিও সহজসাধ্য হইয়া আসে। রেলপথের এই টেক্‌নিক্যাল কথাগুলা ভারতীয় রেল-তত্ত্বজ্ঞের মগজে বসা আবশ্যক।

রেল সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ, আ, ক, খ, না জানিয়াও আমরা "ভ্যাকুয়াম ব্রেক" নামক কল-কৌশলের খবর রাখি। এই "ব্রেক" কৌশলটা যে সকল গাড়ীতে ভাল সেই সকল গাড়ী চলে ভাল। মোসা-ফিরদের আরামও ঘটে বেশ। সাধারণতঃ মালগাড়ীতে এই "ব্রেকের" ব্যবস্থা থাকে না,—অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত থাকিত না। আজকাল মালগাড়ীতেও ভ্যাকুয়াম ব্রেক লাগানো হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য পয়সার খেলা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন রেল-ঘটিত যন্ত্রপাতির বেলায়ও "যত গুড় তত মিষ্টি।" অর্থাৎ মালগাড়ীগুলা নিরাপদে দ্রুত চলে। এক কথায় শেষ পর্য্যন্ত কম খরচায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

এক একটা এঞ্জিন লম্বা লম্বা গাড়ী টানিতে গিয়া বড় শীঘ্র হয়রাণ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু প্রত্যেক ষ্টেশনেই অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে হয়। একটা বলদে লাঙ্গল টানার ব্যবস্থা দেখিলেই বিষয়টা কিছু বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যদি একাধিক এঞ্জিন একখানা গাড়ীর জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় তাহা হইলে লম্বা লম্বা গাড়ী বহুদূরবর্ত্তী ষ্টেশন পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে টানিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। এঞ্জিনটাকে বড় শীঘ্র ছুটি দিবার দরকার পড়ে না। প্রত্যেক এঞ্জিন হইতেই মোটের উপর ঘণ্টা প্রতি বেশী কাজ পাওয়া যায়। কয়লার খরচও লাগে কম। জোড়া বলদ হালে জুতিলে এই ধরণেরই খরচপত্র বাঁচে দেখা যায়। ভারতীয় রেলপথের কোনো কোনোটায় এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ এঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী

টানানো হইতেছে। তাহাতে গাড়ী-শাসনে আর অন্যান্য রেল-কারবারে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

যে সকল অঞ্চলে ঘনঘন গাড়ী চলাচল আবশ্যক সেই সকল অঞ্চলে কয়লার ঠাঁইয়ে বিদ্যুৎ কায়েম হইয়াছে। বিদ্যুতের রেল ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। বড় বড় সহরের আশে-পাশের সঙ্গে রেলসম্বন্ধ বিদ্যুতের সাহায্যেই ঘটিতে থাকিবে। জল-বিদ্যুতের কারখানা যে যে জনপদের বিশেষত্ব সেই সকল জনপদে বিদ্যুতের রেলই চলিবে। পাহাড়ী অঞ্চলে উৎরাইয়ের পথে বিদ্যুতের সাহায্য বেশ কাজে লাগিবে। যে সকল ঠাঁইয়ে কয়লার অভাব সেই সকল ঠাঁইয়েও বিদ্যুৎই রেল চালাইবে। আজ কাল বাংলাদেশে বিদ্যুতের রেল নাই। বোম্বাই অঞ্চলে এই দিকে সূত্রপাত হইয়াছে। বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রেলওয়ে-সংক্রান্ত মেরামতি কাজের পরিমাণ খুব বেশী। গাড়ী বা যন্ত্রপাতি নতুন তৈয়ারী করার কাজ যত, মেরামতির কাজ প্রায় তাহার সমান। কাজেই মেরামতের কারখানাগুলা বিজ্ঞানসম্মতরূপে শাসন করা আবশ্যক। এইদিকে পূর্ব্বে কোনো কাজ হয় নাই। সম্প্রতি স্যার ভিন্‌সেণ্ট রাভেন সাহেবের একটা তদন্ত-বিবরণ বাহির হইয়াছে। তাহাতে কারখানাগুলার সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করা হইবে। যন্ত্রপাতি কলকব্জার মেরামত সাধারণতঃ কোন্ কোন্ দিকে কত দরকার তাহা প্রথম হইতেই আন্দাজ করিয়া লওয়া সম্ভব। আর সেই আন্দাজমাফিক জিনিষপত্র বেশ বেশী তৈয়ারী করিয়া রাখিলে অল্প খরচে বেশী ফললাভের সম্ভাবনা।

এতদিন রেলের "ষ্টোর্স" বা সরঞ্জাম কেনা হইত বিদেশ হইতে। কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া এই লাইনে "স্বদেশী" আন্দোলন চলিতেছে। ভারতেই

আজকাল অনেক সরঞ্জাম খরিদ করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে রেলের খরিদ-বিভাগ পুনর্গঠিত হইয়াছে।

কোনো কোনো জিনিষ খরিদ না করিয়া রেলের কারখানায়ই তৈয়ারী করিয়া লইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সুতরাং রেল-সরঞ্জাম আজকাল দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) খরিদা, (২) ঘরে তৈয়ারী।

সরঞ্জাম বিভাগের কর্ত্তা এখন খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজের পরিচালক। "ভাঁড়ার ঘর," দেশবিদেশে মাল খরিদ করা, জিনিষপত্র তৈয়ারী করা, আর সরঞ্জামের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সকল দিকেই তাঁহার নজর পড়ে।

বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর অন্যান্য নানা কৌশলে রেলের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। (১) বিভিন্ন রেলপথের সঙ্গে পরস্পর হিসাব-নিকাশের জন্য একটা "ক্লীয়ারিং হাউস" (খোলসা ভবন) বা নিষ্পত্তি-ভবন কায়েম করা হইয়াছে। (২) মাল চলাচলের উপর মাসুল যথাসম্ভব ন্যায্যভাবে স্থির করিবার জন্য "রেটস্-অ্যাডভাইজরি কমিটি" (মাশুলবিষয়ক পরামর্শ সমিতি) কায়েম করা হইয়াছে (৩) রেল বিষয়ক অঙ্ক ও তথ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থার উন্নতি-বিধান করা হইয়াছে (৪) গাড়ীগুলার আর যন্ত্রপাতির ভালমন্দ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ কায়েম করা হইয়াছে।

আজকাল ভারতের নানা গলিঘোঁচে ৬৭টা নতুন নতুন রেলপথ তৈয়ারী হইতেছে। এইগুলা লম্বায় ২,২০০ মাইল। এই গেল বৃটিশ-ভারতের কথা। তাহা ছাড়া, "রিয়াসতে" অর্থাৎ রাজরাজড়াদের ভারতে ১৯টা নতুন রেলপথে ৭৭৫ মাইল খোলা হইতেছে। মোটের উপর প্রায় ৩,০০০ মাইল নতুন পথে কাজ চলিতেছে।

আজ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভিতর ১৫৯টা নতুন পথ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে ৯,০০০ মাইলের মোসাবিদা

আছে। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে ৬,০০০ মাইল নতুন রেলপথ খোলা হইয়া যাইবে। আর তখন প্রায় ৩,০০০ মাইলে কাজ চলিতে থাকিবে।

রেলপথের বিস্তারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে আর ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কিন্তু আব একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। বহুসংখ্যক লোকের স্থায়ী অন্নসংস্থানও রেলপথের এক মস্ত কথা। আজকালকার ৩৮,৫৭৯ মাইলে ৭॥০ লাখ লোকের ভাতকাপড় জুটিতেছে। এই সাড়ে সাত লাখের ভিতর মোটা মাহিয়ানাওয়ালা বিদেশী বা দো-আঁসলাদিগকে বাদ দিলে সকলেই খাঁটি ভারতসন্তান।

কাজেই ১৯৩২ সনের ভিতর যদি ৬,০০০ মাইল নতুন পথ খোলা হইয়া যায় তাহা হইলে আরও অনেক কুলী-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের অন্ন-সংস্থান ঘটিতে পারিবে। একথা সহজেই বিশ্বাস করা চলে। তবে ৩৮,৫৭৯ মাইলের জন্য যদি ৭॥০ লাখের ডাক পড়ে তাহা হইলে নতুন ৬,০০০ মাইলের জন্য ঠিক সেই অনুপাতে লোকের ডাক পড়িবেই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কেননা কোনো কারবার যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে তাহা চালাইবার জন্য লোকজনের সংখ্যা সেই পরিমাণে বাড়ানো আবশ্যক হয় না।

এইক্ষেত্রে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। দেখা গিয়াছে যে, ফী মাইল রেলপথের জন্য গড়ে প্রায় ২ লাখ টাকা পড়ে। এই দুই লাখ টাকা খরচ হয় কিসে? একটা বড় হিস্যা যায় লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালে। তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আসে। কাজেই এই খরচের অধিকাংশই বিদেশীর ভোগে যায়। তাহা ছাড়া আর সবই খরচ হয় লোকের মেহনতের মজুরি বাবদ। মাথার মেহনতের উঁচু দিক্‌টা অধিকাংশই বিদেশীদের কপালে লেখা। অবশিষ্ট ভারতসন্তানের। হাতপায়ের মজুরি সবই অবশ্য ভারতবাসীর একচেটিয়া। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, মাইল প্রতি দুই লাখ টাকার অনেক-কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় নরনারীর অন্ন জোগাইয়া থাকে। অনেক দিক্ হইতেই রেল আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

রেল-চালানো একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। এই বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করিয়া লওয়া ভারতীয় রেল-কোম্পানীগুলা আজকাল নিজ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছে। রেলের জন্য লোক বাহাল করিবার পরই তাহাদিগকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় এই ধরণের ইস্কুল আগে ছিল না। অধিকন্তু যে সকল লোক অনেক দিন হইতে রেলের কাজে বাহাল আছে তাহাদিগকেও পুনরায় ইস্কুলে আনিয়া তাজা করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভবিষ্যতে ব্যবস্থাটা ক্রমেই পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে আজকাল যে প্রণালীতে রেলপথ শাসিত হয় তাহার প্রধান কথা তিনটি। প্রথমতঃ, রেলপথের খরচপত্র গবর্ণমেণ্টের সরকারী খাজাঞ্চি বিভাগের অধীন নয়। ১৯২৪ সনে রেল-"কোষ" ভারত-সরকারের রাজস্ব-বিভাগ হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রেলপথগুলা "স্বরাজ" ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় কথা বিভিন্ন রেলপথের পরস্পর-সম্বন্ধ বিষয়ক। রেল-শাসনের জন্য কেন্দ্র-কমিটি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কেন্দ্রে-কমিটির এক্তিয়ার যাহাতে কমিয়া যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে। রেলপথগুলা প্রত্যেকেই যথাসম্ভব এক একটা স্বরাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তৃতীয়তঃ "ব্রড্ গেজ" বা চওড়া-রাস্তার রেলপথগুলার অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টের সরকারী তাঁবে শাসিত হয়। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, রেল-শাসনের স্বরাজটা বাস্তবিক পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক বিভাগ হইতে অপর বিভাগের স্বতন্ত্রতা।

অর্থনৈতিক স্বীকার্য্য

যন্ত্রপাতির কারখানা, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা, চায়ের বাগান ও কারবার, খাল বিল নদীর মেরামৎ, চাষ আবাদের সমবায় আর রেল বিস্তার এই কয় প্রকার আর্থিক তথ্যে বাঙলা দেশের রূপান্তর মাত্র দেখিতেছি এইটুকু বলা আমার দস্তুর নয়। নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই সকল দফায় আর্থিক বাঙলার (আর আর্থিক ভারতের) বাড়তিই আসল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই উপলক্ষ্যে,—যে ধরণের ধন-বিজ্ঞান বা অর্থ-শাস্ত্র আমার মেজাজ মাফিক তাহার কয়েকটা মূলসূত্র প্রচার করিয়া যাইতেছি। এই সব অবশ্য আমার নিকট নেহাৎ গোড়ার কথা,—স্বতঃসিদ্ধ বা প্রাথমিক স্বীকার্য্য বিশেষ।

মুসলমান সমস্যা

"হিন্দুর স্বার্থ" আর "মুসলমানের স্বার্থ" ইত্যাদি বোল আজকালকার বাঙলায় খুব শুনা যায়। কিন্তু খাওয়া-পরা আর টাকা-রোজগারের কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধরণের ধর্ম্ম হিসাবে স্বার্থ-ভেদ আমি স্বীকার করিয়া চলিতে অসমর্থ। আমার স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ একদম অন্য ঢঙের।

ধন-বিজ্ঞান হইতেছে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মামলা। "সূচী-সংখ্যায়" ধরা পড়ে কোন্ লোকটা সুখে আছে আর কোন্ লোকটা দারিদ্র্য-সীমানার তলায় পড়িয়া আছে। দাড়িতে আর টিকিতে তফাৎ করা "ইণ্ডেক্স্ নাম্বারে"র কোষ্ঠিতে লেখা নাই। এই সনাতন, বিশ্বজনীন বিদ্যার পতাকা-তলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐক্য-বদ্ধ হইতে বাধ্য।

যদি অনৈক্য দেখা দেয়, সে অনৈক্য দাড়ি আর টিকির অনৈক্য নয়। সে অনৈক্য জীবন-যাত্রার মাপ-কাঠির অনৈক্য। তুমি বেশী খাইতে

পাইতেছ, ভাল কাপড় পরিতেছ, তোফা বাড়ীতে বাস করিতেছ আর আমি এই সকল বিষয়ে ঘৃণ্য নগণ্য জঘন্য জীবন যাপন করিতেছি, সেই অনৈক্য। অর্থাৎ ধনী-নির্দ্ধনে, মজুর-মালিকে, চাষী-জমিদারে, কেরাণী-মনিবে অনৈক্য। এ সব অনৈক্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনৈক্য নয়,—আর্থিক ও সামাজিক অনৈক্য। আর এই সকল নতুন ধরণের অনৈক্য নিবারণের দাওয়াইও আছে হরেক রকমের। সে কথা সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না।

সভ্যতার গতি সহর-মুখো

বড় বড় সহর কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়োরামেরিকায়ও ছিল না। পল্লী-জীবন, পল্লী-সভ্যতা, পাড়াগাঁয়ের আদর্শ ইত্যাদি মাল মান্ধাতার আমল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজেরও অতি পরিচিত বস্তু। কিন্তু মহানগরী নামক জনপদ বা জীবন-কেন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছে। আর তাহার ধারা বিংশ শতাব্দীতে জোরেই বহিতেছে। আমাদের ভারত এই পল্লী-নগর সমস্যায় আগাগোড়া পাশ্চাত্যেরই জুড়িদার। তবে আমরা কাল হিসাবে ইয়োরামেরিকার পেছনে পেছনে চলিতেছি—এই যা প্রভেদ। মাল হিসাবে ভারতে এবং পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ নাই।

বর্ত্তমান জগতের বিশেষত্ব দুনিয়া-নিষ্ঠা, সংসার-শ্রদ্ধা আর শক্তি-পূজা। নগর জীবনে এই সবই পুঞ্জীকৃত। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ায় নানা-প্রকার সমাজ-সমস্যা দেখা দিয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, নরনারীর যৌন-সম্বন্ধ, বিবাহ-প্রথা, নগরের চৌহদ্দি ও বহর, নগরের গৃহ নির্ম্মাণ আর গৃহ-সংখ্যা,—এই সকল দফায় অনেক নতুন কিছু ঘটিতেছে। সরকারী ও বে-সরকারী লোকহিতের প্রতিষ্ঠান এই যুগেরই সন্তান। নগর-পরিচালিত শিল্প-কর্ম্ম, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, শিক্ষাকেন্দ্র, "যৌবন-ভবন" আর গ্রন্থশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও অতিমাত্রায় নবীন চিজ।

এইসব চিজ "সেকেলে" ইয়োরোপে ছিল না। পশ্চিমা মুল্লুকেও এমন যুগ গিয়াছে যখন লড়াই চলিত চাষীতে আর শিল্পীতে। আর তখন প্রাচীন শিল্প-ওয়ালারা নবীন শিল্পপতির দলকে দেশের দুস্‌মন বিবেচনা করিত। প্রাচীনেরা নবীনের কর্ম্ম-কৌশল আর সফলতা দূর হইতে দেখিয়া হা-হুতাশ করিত।

এই "সেকাল" কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের সামিল নয়, একশ' দেড়শ' বৎসরের পুরাণো কাল মাত্র। বিলাতী ইতিহাসে ১৭৮৫ সনকে সাধারণতঃ শিল্প-বিপ্লবের প্রথম তারিখ রূপে ধরিয়া লইতে পারি। ফ্রান্সে আর জার্ম্মাণিতে শিল্প-বিপ্লবের তারিখ আরও ৪০।৫০ বৎসর পরের কথা। অর্থাৎ আজ কাল ২০।৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া ভারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে যে সকল ওলট-পালট চলিতেছে সেই সব সাধিত হইয়াছে ইয়োরামেরিকার বড় বড় দেশে, আমাদের প্রায় পুরুষ দুইয়েক আগে। দুনিয়ার সকল দেশেই শিল্প-বিপ্লবের সম-সম কাল প্রায় এক ধরণেরই কাল। আর সেই যুগটা পল্লী-নগরে ভাঙন-গড়নের যুগ।

একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৮৭২ সনে ঢাকা সহরে ৬৮,৫৯৫ জন নরনারীর আস্তানা ছিল। ঠিক সেই বৎসর উত্তর-পূব ফ্রান্সের র্‌াঁসনগরে ৬৯ ০৩৭ জন লোক বসবাস করিত। সংখ্যা দুইটা প্রায় কাছাকাছি, তবে ফরাসী নগরে কিছু বেশী। ১৯১১ সনে ঢাকার লোক সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখের কিছু উপর,—১,০৮,৫৫১, আর র্‌াঁস সহরে সেই বৎসর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১,১৫,১৭৮। এই সংখ্যাটার লাগালাগি সংখ্যা ঢাকায় দেখা দিয়াছে ১৯২১ সনের লোক-গণনায়। আজকাল বোধ হয় ১,২০,০০০ অথবা ১,২২,০০০ নরনারী ঢাকায় বাস করে।

বাঙলার ঢাকা ও ফ্রান্সের র্‌াঁস

ঘটনাচক্রে রাঁস সহরের লোক সংখ্যা ১৯২১ সনে মাত্র ৭৬,৬৪৬। এই অধোগতির কারণ সকলেরই জানা-কথা। কেননা ১৯১৪-১৮ সনের কুরুক্ষেত্রে রাঁসনগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয় আর লোকজন বাস্তুভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করে। ফরাসী কাগজ-পত্রে দেখিতেছি এক্ষণে পুনর্গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। লোকজন অনেকে ফিরিয়া আসিতেছে। বহুসংখ্যক বিদেশী লোকও বাসিন্দা হইতেছে। লোক সংখ্যা ইতিমধ্যে লাখ পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯২১ সনের সংখ্যা এখনো পৌছে নাই।

যাহা হউক, দেখিতেছি যে, এশিয়ার একটা শহর আর ইয়োরোপের একটা শহর,—দুইই প্রায় একই মাপে বাড়িয়া চলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর দুনিয়ার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নাগরিক জীবনের গতি মোটের উপর এক-মুখো। অর্থাৎ পশ্চিমকে নগর-নিষ্ঠ বা নগর-প্রধান আর পূবকে পল্লী-নিষ্ঠ বা পল্লী-প্রধানরূপে বর্ণনা করা ধনবিজ্ঞানের ধাতে অসম্ভব। লোক-বহুল জনপদ অর্থাৎ নগর ইয়োরোপের "সেকালে" ছিল না। পশ্চিমা রক্তও পল্লী-কেন্দ্রেই মস্‌গুল থাকিতে অভ্যস্ত ছিল। ১৮০৮ সনে রাঁস-নগরে লোক বাস করিত মাত্র হাজার বিশেক ; আজকালকার বিষ্ণুপুর বা কিশোরগঞ্জ সেই কোঠায় রহিয়াছে।

বাঙলায় আজকাল শ দেড়েক মিউনিসিপ্যালিটি চলিতেছে। দুনিয়ার মাপে এ উল্লেখযোগ্যই নয় বটে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের ক্রমবিকাশ হিসাবে এই তথ্য নেহাৎ নিন্দনীয়ও নয়। ১৮৭২ সনের বাঙলায় সহুরে লোক ছিল গুনতিতে ১৮,৫৭,৫০৪ জন। ১৯২১ সনের জরীপে দেখা যাইতেছে ৩১,১১,৩০৪—প্রায় পৌনে দুগুনের কাছাকাছি।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতি যত কারণে নবশক্তির

আধার হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর আধুনিক শিল্পকর্ম্মের সেবক, নবীন মজুর সম্প্রদায় অন্যতম। বাস্তবিক পক্ষে শহর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ফ্যাক্টরি আর মজুর এই চার বস্তু আধুনিক আধ্যাত্মিকতার সমান প্রতিমূর্ত্তি। ভারতবর্ষ এই কর্ম্মক্ষেত্রে কোনো নতুন সৃষ্টি দাবী করিতে অসমর্থ। কিন্তু ইয়োরামেরিকার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া আমরাও জাপানীদের মতনই নবীন অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার পথে আসিয়া দাড়াইতেছি।

ভারতে মজুর-নিষ্ঠা

বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের মতন ভারতও ক্রমশঃ ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও মজুর-শক্তিই স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রধান সহায়রূপে দেখা দিতেছে। কাজেই মজুর-আন্দোলনের ক্রমিক উন্নতিকে আমি ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিরই এক বড় খুঁটা সমঝিতে অভ্যস্ত।

এই বৎসর দিল্লীতে নিখিল-ভারত-মজুর কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। আগামী বৎসর কলিকাতায় অধিবেশন বসিবে। অপরদিকে জেনেহ্বার আন্তর্জাতিক মজুর-সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের যোগাযোগে কায়েম হইয়াছে। উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ও অন্যান্য ভারতবাসী এই আন্দোলনে মজুরদের সুহৃৎভাবে দাড়াইয়া ভাবুকতার নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া ধরিতেছেন। মজুর-আন্দোলনে ক্রমশঃ নানা দল দেখা দিতে থাকিবে। তাহাতে ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

আদর্শ এবং জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় নারীতে আর পাশ্চাত্য নারীতে কোনো প্রভেদ নাই। আইনের চোখে, আর্থিক তরফ হইতে এবং রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে ইয়োরামেরিকার মেয়েরা এশিয়ার মেয়েদের মতনই 'গোলাম' ছিল। মাত্র

নারীত্ব ও বর্ত্তমান জগৎ

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন পশ্চিমা জগতে চলিতেছে। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে মেয়ের সাম্য কায়েম করিবার চেষ্টা পশ্চিম মুল্লুকে বেশী পুরানো চিজ নয়।

এই দিকে পশ্চিমা মেয়েরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেও। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের নারী আর খ্রীষ্টিয়ান পশ্চিমা নারী প্রায় এক গোত্রের জীবই ছিল। গোটা জগৎ একই পথে, একই মতে, একই আদর্শে চলিয়াছে। ভারতের নারী খ্রীষ্টিয়ান নারী অপেক্ষা উন্নত ছিল না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার নারী মানব-সভ্যতার নতুন এক অধ্যায় খুলিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। এই পথ তাহাদের আবিষ্কৃত চিজ। ভারতীয় নারীও সেই পথেই চলিতেছে এবং চলিবে। পূর্ব্বে পশ্চিমে এখন টক্কর চলিতেছে ঠিক যেন ঘোড়দৌড়,—পশ্চিমারা আগে আগে ছুটিতেছে, কিন্তু উহাদের কানটা মাত্র সম্প্রতি আগে আছে। ভারতীয় নারীকে বর্ত্তমান জগৎমাফিক কর্ম্ম-দক্ষতা, জীবনবত্তা ও ভাবুকতা অর্জ্জন করিবার জন্য এখনও কিছুকাল পশ্চিমা মেয়েদের পেছনে পেছনেই ছুটিতে হইবে। ইহাই যুবক বঙ্গের—যুবক ভারতের—যুবক এশিয়ার নারী-সমস্যা।

সমগ্র বিশ্ব ও সকল জাতি সেই পুরাকাল হইতে এক পথে চলিতেছে। পাশ্চাত্যের কর্ম্মপদ্ধতি এক প্রকার আর প্রাচ্যের অন্য প্রকার একথা ঠিক নয়। সুয়েজ খালের এক পারের লোকদের যে পথ,—অপর পারের লোকদেরও সেই একই পথ। প্রাচ্যদেশ যে আধ্যাত্মিক হিসাবে জগতের গুরুস্থানীয় এ কথাও সত্য নয়। প্রাচ্যদেশ কোনো অতীতকালে জগতের গুরু ছিল, তাহাও ঠিক বলা চলে না। বড় জোর প্রাচ্যেরা পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হইয়া চলিয়াছিল এই পর্য্যন্ত। সকলে এক দিকে চলিয়াছে। তবে কেহ বা আগে, কেহ বা পশ্চাতে। কেহ বা দশম ধাপে, কেহ বা

অষ্টম ধাপে, কেহ বা তৃতীয় ধাপে, আবার কেহ কেহ প্রথম ধাপেও রহিয়াছে।

ইয়োরোপে "ভদ্র-ঘরের" মেয়েরা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আফিসে বা ব্যাঙ্কে চাকুরি করিত না। আজকাল করিতেছে। ভারতে আজও মেয়ে-মহলে এইরূপ চাকুরির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আছে। কিন্তু বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। আর মধ্যবিত্ত ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা ত চিরকালই সকল দেশে গতর খাটাইয়া খাইতে অভ্যস্ত।

আর্থিক দুনিয়ায় একঘরো হইয়া জীবন কাটানো অসম্ভব। জগতের নানা লোকের সঙ্গে মালের আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া মানবজাতিকে "কলা দেখানো" কখনই চলিতে পারে না।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও স্বদেশী আন্দোলন

বিদেশে কিছু কিছু মাল প্রত্যেক দেশকে কিনিতেই হইবে। তাহা না হইলে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য অচল থাকিতে বাধ্য। অপর দিকে বিদেশে প্রত্যেক দেশেরই কিছু না কিছু মাল বেচিতেও হইবে। তাহা না হইলে বিদেশী জিনিষের দাম সমঝাইয়া দেওয়া যাইবে কোথা হইতে? এই সকল গোড়ার কথা ধামা চাপা দিয়া রাখিলে "স্বদেশী আন্দোলন" সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা অসম্ভব।

সকল ক্ষেত্রেই অঙ্ক কষিয়া দেখা আবশ্যক এক একটা জিনিষ তৈয়ারী করিয়া বাজারে ফেলিতে খরচ পড়িতেছে কত। যদি দেখা যায় যে বিদেশী মাল সস্তায় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইলে এই দুই দরের প্রভেদটাকে শুল্কের দ্বারা যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টা চলিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ব্যবসাটার বাঁচিবার কেনো সম্ভাবনা নাই তাহার জন্য বিদেশী মালের উপর মোটা হারে শুল্ক বসানো অসঙ্গত। আবার যখন-

তখন যে-সে স্বদেশী কারবারকে শিশু-কারবার বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জলের মত টাকা ঢালাও আহাম্মুকি।

লড়াইয়ের পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে একটা কাণ্ড বিশেষরূপে দেখা দিয়াছে। কারখানাওয়ালাদিগকে তাহাদের দেশের বাজার হইতে সমূলে উৎপাটন করিবার মতলবে বিদেশী কারখানাওয়ালারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এই সকল কৌশলের ভিতর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অন্যতম। তাহার ফলে বিদেশের বাজারে অতি সস্তায় মাল হাজির করা হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ যদি কেনো দেশে ঘটনাক্রমে মজুরির হার অন্য দেশের তুলনায় নীচু থাকে তাহা হইলে যে-দেশে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত উঁচু সেই দেশের কারখানাওয়ালারা নিজ মুল্লুকেই বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিতে অসমর্থ হয়। যে সকল দেশে "ইন্‌ফ্লেশ্যন" বা কাগজী-মুদ্রার অতি-বিস্তারের দরুণ মুদ্রা-পতন ঘটিয়াছে সেই সকল দেশের মাল অন্যান্য দেশে পৌঁছিলে তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। শুল্ক-দুনিয়ার পারি-ভাষিকে তাহার নাম "ডাম্পিং"। ডাম্পিং-বিরোধী শুল্ক এক্ষণে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চলিতেছে। তবে ইহাকে মামুলি সংরক্ষণ-শুল্ক হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করা ধনবিজ্ঞানের ন্যায়-শাস্ত্রের পক্ষে সুকঠিন।

ভারতের জাপানী-সমস্যা

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সংরক্ষণ-নীতির দিগ্‌বিজয় চলিতেছে। এখন প্রশ্ন কেবল খরচ-পত্রের আঁকজোক আর আমদানি-রপ্তানির সূচী-সংখ্যা। এই উপলক্ষ্যে ভারত সম্বন্ধে জাপানী জটিলতার কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতেছি।

জাপান ভারতবাসীর পক্ষে মাল বেচিবার এক বড় বাজার। জাপানীরা আমাদের মাল কিনে ৮৫ ক্রোর টাকার। আর আমরা ভারতে মাত্র ২৬ ক্রোর টাকার জাপানী মাল খরিদ করিয়া থাকি।

জাপানী মালের খরিদ্দার হিসাবে ইয়াঙ্কিস্থান আমাদের ভারতের চারগুণ বড়।

জাপানের সঙ্গে বোম্বাইওয়ালারা খোলাখুলি আড়ি চাহিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যসত্যই আড়ি চালাইলে ভারতবাসীর লোকসান কতটা এই অঙ্কে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। জাপানীরা ভারতীয় মাল বয়কট করা সুরু করিলে লোকসান আমাদের নেহাৎ কম নয়। আর আমরা যদি গায়ে পড়িয়া জাপানীদের সঙ্গে দুস্‌মনি চাগাইয়া তুলি তাহা হইলে আমরা নিজ বাজারটা নিজেই খোয়াইয়া বসিব।

জাপানে আর বোম্বাইয়ে বাণিজ্য-লড়াইটা এক বিচিত্র আকারে দেখা দিতে পারে। জাপানীদের সঙ্গে ভারতবাসীর যে আমদানি-রপ্তানি চলিয়া আসিতেছে তাহার পশ্চাতে আছে একটা "কন্‌ভেনশুন" বাণিজ্য-সমঝৌতা। ১৯০৫ সনে এই বিষয় লইয়া জাপানে আর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টে সন্ধি-জাতীয় বন্দোবস্ত কায়েম হয়। বোম্বাইওয়ালারা এইটা রদ করাইবার আন্দোলন চালাইতে পশ্চাৎপদ নয়।

তাহার পাণ্টা জবাব দিয়া জাপানী ব্যবসায়ীরা বলিতেছে,—"বহুৎ আচ্ছা। আমরা ভারতীয় লোহার বিরুদ্ধে আন্দোলন রুজু করিতেছি।" জাপানে ভারতীয় লোহার উপর কড়া শুল্ক বসিলে ভারতীয় লোহাওয়ালাদের ক্ষতি বিস্তর। কাজেই লড়াইটা চলিতেছে,—কাপড় বনাম লোহা। অতএব স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাখ্যায় ভাঙন-গড়ন অবশ্যম্ভাবী।

ইস্পাত ও সংরক্ষণ-শুল্ক

সংরক্ষণ-নীতি চালাইলেই যে দেশের উপকার হয় তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। আমাদের চোখের সম্মুখে দুইটা বড় দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। টাটার লোহা আর ইস্পাত কারখানার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই

অনেকের চোখ ফুটিবার কথা! সরকারী ধনভাণ্ডার অর্থাৎ ভারতীয় নরনারীর দেওয়া ট্যাক্‌স হইতে সাহায্য না পাইলে টাটা কোম্পানী একদম অচল। কতবার ৬০ লাখ টাকা করিয়া দিতে হইবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। এদিকে টাটা কতদিন বাঁচিবে তাহাও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যাচাই করা হয় নাই।

সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারতের নরনারীকে নানা তরফ হইতে অর্থকষ্ট সহিতে হইতেছে। কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাকে নিজ পায়ের উপর দাঁড় করাইবার জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ ট্যাক্‌স্ দাতাদের পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় ত অনুচিত নয়। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতির অপর দিকটাও ভারতীয় স্বদেশসেবকগণের মগজে বসা দরকার। যে-যে শিল্পকে বা ব্যবসাকে বাঁচাইবার জন্য ভারত-সন্তান নিজের রক্ত দিতে বাধ্য হইতেছে সেই সকল শিল্প ও ব্যবসার কর্ম্ম-পরিচালনায় তাহাদের মতামত এবং স্বার্থ রক্ষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। স্বরাজ-নীতিকে বাদ দিলে সংরক্ষণ-নীতির আধখানাই মাঠে মারা যাইবে। টাটার উপর কঠোর নজর রাখা প্রত্যেক বিচক্ষণ স্বরাজ-সেবকের আবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বৎসর পক্ষপাতমূলক ইস্পাত-সংরক্ষণ আইন জারি হইয়াছে। বিদেশী ইস্পাতের আওতা হইতে স্বদেশী ইস্পাতের বাজারকে রক্ষা করা এই আইনের মতলব।

কিন্তু "বিদেশী"কে ভাগ করা হইয়াছে দুই খণ্ডে, (১) বিলাতী, (২) অন্যান্য বিদেশী, যথা মার্কিণ, ফরাসী, বেলজিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি। বিলাতী ইস্পাতের উপর যে হারে শুল্ক বসানো হইল "অন্যান্য বিদেশীর" উপর তাহার চেয়ে বেশী হার চাপানো হইয়াছে।

আসল কথা,—এই ক্ষেত্রে বিলাতী ইস্পাতকে ভারতের বাজারে বাঁচানো হইল "অন্যান্য বিদেশী" ইস্পাতের আক্রমণ হইতে। "অন্যান্য

বিদেশী" ইস্পাতের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে টক্কর চালাইয়া বিলাতী ইস্পাত ভারতের বাজারে আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ।

বিলাতী ইস্পাতের স্বপক্ষে এইরূপ হামদর্দ্দি দেখানো ভারতীয় ক্রেতা ও জনসাধারণের আর্থিক হিসাবে ক্ষতিকর। ভারতবাসী আজকাল অনর্থক অত্যধিক মূল্যে বিদেশী ইস্পাত কিনিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাতে বিলাতের ইস্পাত-ব্যবসায়ীদের লাভ আছে যথেষ্ট, কিন্তু ভারতীয় নরনারীর লাভ আধ কাঁচ্চাও নাই। বরং আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি বড় বড় দেশের অপ্রীতি অর্জ্জন করা হইতেছে মাত্র। তাহাতে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক দুই প্রকার ক্ষতিই ভারতের কপালে জুটিয়াছে।

রেল বিস্তারে আর্থিক উন্নতি

বর্ত্তমানে ভারতীয় রেলপথগুলো একত্রে লম্বায় ৩৮,৬৭৯ মাইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এইসব তৈয়ারি করিতে মাইল প্রতি গড়ে প্রায় ২,০০,০০০ টাকা লাগিয়াছে। ফী বৎসর মোটের উপর ৬০ কোটি লোক রেলপথে যাতায়াত করে আর মাল চলাচলের পরিমাণ ৮ কোটি টন। অর্থাৎ ভারতের লোকসংখ্যা সংক্ষেপে ৩০ কোটি ধরিয়া লইলে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া রেলে মোসাফিরি করে। আর ফী মোসাফির গড়-পড়তা প্রায় সিকি টন (৭ মণ, মাল লইয়া চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত।

আজ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভিতর ১৫৯টা নতুন পথ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে ৯০০০ মাইলের মোসাবিদা আছে। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে ৬০০০ মাইল নতুন রেলপথ খোলা হইয়া যাইবে। আর তখন প্রায় ৩০০০ মাইলে কাজ চলিতে থাকিবে।

রেলপথের বিস্তারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে আর ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কিন্তু আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। বহুসংখ্যক

লোকের স্থায়ী অন্নসংস্থানও রেলপথের এক মস্ত কথা। আজকালকার ৩৮,৫৭৯ মাইলে ৭,৫০,০০০ লোকের ভাতকাপড় জুটিতেছে। এই সাড়ে সাত লাখের ভিতর মোটা মাহিয়ানাওয়ালা বিদেশী বা দো-আঁস্‌লাদিগকে বাদ দিলে সকলেই খাঁটি ভারত সন্তান।

কাজেই ১৯৩২ সনের ভিতর যদি ৬,০০০ মাইল নতুন পথ খোলা হইয়া যায় তাহা হইলে আরও অনেক কুলী-কেরাণী-এঞ্জিনিয়ারের অন্ন- সংস্থান ঘটিতে পারিবে। একথা সহজেই বিশ্বাস করা চলে।

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। দেখা গিয়াছে যে, ফী মাইল রেলপথের জন্য গড়ে প্রায় দুই লাখ টাকা পড়ে। এই দুই লাখ টাকা খরচ হয় কিসে? একটা বড় হিস্যা যায় লোহা-লক্কড়, যন্ত্র-পাতি ইত্যাদি মালে। তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আসে। কাজেই এই খরচের অধিকাংশ বিদেশীর ভোগে যায়। তাহা ছাড়া আর সবই খরচ হয় লোকের মেহনতের মজুরি বাবদ। মাথার মেহনতের উঁচু দিকটা অধিকাংশ বিদেশীদের কপালে লেখা। অবশিষ্ট ভারত-সন্তানের। হাতপায়ের মজুরি সবই অবশ্য ভারতবাসীর একচেটিয়া। অতএব মাইল প্রতি দুই লাখ টাকার অনেক-কিছুই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় নরনারীর অন্ন জোগাইয়া থাকে। নানা দিক হইতেই রেল আমাদের আর্থিক উন্নতির এক বড় খুঁটা।

ম্যালেরিয়ার অন্যতম সহায়ক হিসাবে রেলপথগুলা নিন্দনীয় বটে। ইতালিতেও রেলপথের জন্য নরনারী আর জীবজন্তুকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ ইতালির রেল-এঞ্জিনিয়ারেরা পুরাণো দোষ শুধরাইয়া লইয়াছে। ভারতেও এঞ্জিনিয়ারিংয়ের তরফ হইতে রেলনীতির সংস্কার সাধিত হইতে পারে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের নমুনা

আজকালকার দুনিয়ায় ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রে ভাঙন-গড়ন চলিতেছে খুব জোরের সহিত। একটা নবীন ধনবিজ্ঞানের সূত্রপাত হইতেছে। যুবক বাঙলার অর্থশাস্ত্রীদিগের সঙ্গে তাহার কিছু মোলাকাৎ হওয়া আবশ্যক। এক এক শ্লোকে বিপুল মহাভারতের কোনো কোনো পর্ব্ব আওড়াইয়া যাইতেছি।

সঙ্কট ও চক্র

ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

আলোচনার একটা নমুনা দেখাইতেছি। বাজারদরের ওঠা নামাই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। এইটাকে কাবু করিতে পারিলেই আর্থিক সমতা সাধিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা করা যায় কি করিয়া? তাহার জন্য চাই বাণিজ্যের ওলট-পালট বা অতি-দ্রুত পরিবর্ত্তন (ফ্লাক্‌চুয়েশুন) বন্ধ করা। বাণিজ্য-বস্তুটা অর্থাৎ লেন-দেন, কেনা-বেচা, আমদানি-রপ্তানি নির্ভর করে ব্যাঙ্কের উপর। কেননা ব্যাঙ্কগুলা কারবারকে যেরূপ কর্জ্জ দেয় তাহার উপরই অনেকটা নির্ভর করে মাল কেনা-বেচার আকার-প্রকার। ব্যাঙ্ক যদি বেপারীকে অতি সহজে মালের রসিদ দেখিবামাত্র টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত থাকে তাহা হইলে বেপারীরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়ে। আর তাহারা একেবারে দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া বাজারে মাল চালাইতে লাগিয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, ব্যাঙ্কগুলা সহজে টাকা ছাড়িতে রাজি হয় কেন। তাহাদের তহবিলে কাঁচা টাকা অনেক মজুত হয় বলিয়া। কিন্তু কাঁচা টাকা

মজুতই বা হয় কেন ? দেশের গবর্ণমেণ্ট অথবা নোট-ব্যাঙ্ক যদি অনেক পরিমাণ সোনার মালিক হইয়া পড়ে, আর সোনা পাইবা মাত্র তাহার সমান দামের নোট ছাড়িতে সুরু করে তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলাও টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে থাকিবে।

অতএব প্রধান সমস্যা হইতেছে ব্যাঙ্কগুলাকে টাকার সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে না দেওয়া। অর্থাৎ বেপারীদিগকে কর্জ্জ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কগুলার হাতে কম থাকিলেই অথবা উচিত পরিমাণের মাত্রা ছাড়াইয়া না গেলেই আপদঃ শান্তিঃ। তাহা হইলে কর্জ্জ-নীতিকে শাসন ও সংযত করা দাঁড়াইতেছে বর্ত্তমান দুনিয়ায় আসল রাষ্ট্র-নীতি ও অর্থ-শাস্ত্র।

এক গ্রন্থে অরুইন ও পীল নামক দুইজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,— মান্ধাতার আমলের জমিদারি-প্রথা বিলাতে এখনো চলিতেছে। তাহা উঠাইয়া দেওয়া দরকার। প্রজা, রাইয়ত ইত্যাদি নামের লোক ইংরেজ সমাজে আর থাকিবে না। প্রত্যেক চাষীই নিজ নিজ জমির মালিক হইবে। আর এই ব্যবস্থায় "স্বত্বের যাদুতে বালু হইবে সোনায় পরিণত"। লেখকদের একজনও বোল্‌শেভিক-পন্থী নন। কৃষিবিজ্ঞানে সুদক্ষ বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি আছে।

নয়া বিলাতে জমিদারি

১৯২৩ সনে "লিবার্য্যাল" দলের রাষ্ট্রনায়কেরা একটা কমিটি কায়েম করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ভূমি-সমস্যা আলোচনা করিয়া কমিটি মন্তব্য প্রচার করিয়াছে।

কমিটির মতে চাষ-আবাদের প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ সমাজে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। জমিদারি প্রথা উঠাইয়া না দিলে বিলাতে কৃষি-সংস্কার অসম্ভব। গবর্মেণ্টের হাতে সকল আবাদী জমির দখল আসুক। যে সকল চাষীরা জমি চাষ করিতে প্রস্তুত এবং সমর্থ, বাছিয়া বাছিয়া

তাহাদিগকে জমি ভাড়া দেওয়া উচিত। জমিদারদের জমি কিনিয়া লইয়া গবর্মেণ্ট তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার দায়িত্ব লইতে বাধ্য। কিন্তু যে সব কিষাণ বা জমিদার নিজ হাতে অথবা মজুর খাটাইয়া জমি চষিতে অভ্যস্ত তাহাদের জমি কাড়িয়া লইবার প্রয়োজন নাই।

এই ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থায় ছোট ছোট বহুসংখ্যক চাষী সৃষ্ট হইবার কথা। তাহাদের হাতে হয়ত অনেক সময়েই প্রচুর পুঁজি না থাকিতেও পারে। কিন্তু পুঁজি দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা গবর্মেণ্টের একটা বড় কর্ত্তব্য থাকিবে। এই জন্য ভূমি-বিষয়ক কর্জ্জ-ব্যবস্থা নূতন সরকারী আইনের অন্যতম অঙ্গ হইবে।

বিলাতে আজকাল যে আদর্শে জমিজমার আইন-কানুন গড়িয়া তুলিবার আন্দোলন চলিতেছে তাহার গোড়া ঢুঁড়িতে হইবে জার্ম্মানির আইন-কানুনের ভিতর। বার্লিনের অধ্যাপক জেরিং এই আদর্শের অন্যতম জন্মদাতা।

মনে রাখিতে হইবে যে, লিবারাল দলের মাথায় আছেন লয়েড জর্জ্জ আর লর্ড অ্যাস্‌কুইথ। তাঁহারা এবং তাঁহাদের পেটোআরা এমন কি মজুরপন্থীও নন, আর বোলশেভিক ত ননই।

পুঁজি-সঙ্ঘের আইন

বিগত বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার আর্থিক জীবনে একটা নয়া যুগান্তর চলিতেছে। তাহার অন্যতম লক্ষণ কার্টেল, ট্রাষ্ট ইত্যাদি সঙ্ঘের আবির্ভাব। এই সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা মৎ-সম্পাদিত "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইয়াছে।

কিন্তু সঙ্ঘ যেমন-যেমন বাড়িতেছে তেমন-তেমন তাহার আকার-প্রকার ধরণ-ধারণও বদলাইয়া যাইতেছে। মামুলি "সঙ্ঘ" শব্দ কায়েম করিলে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক গড়ন বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নয়।

বিভিন্ন গড়নের জন্য কিরূপ রাষ্ট্রীয় আইনকানুন কায়েম করা উচিত, তাহার আলোচনায় ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতেরা সময় দিয়া থাকেন। ভারতে এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার সময় এখনো আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে নবীনতন ধনবিজ্ঞানের কাঠামটা মাঝে মাঝে আলোচনা করিয়া দেখা মন্দ নয়। সম্প্রতি মাত্র এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, পুঁজি বা মূলধনের দুনিয়ায় আজকাল প্রধানতঃ তিন গড়ন দেখা যায়। একটাকে মামুলি "বিরাট কারবার" বলা চলে। দ্বিতীয় গড়নের নাম "ট্রাষ্ট"। আর শেয়ার বাজারের বণ্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি ধনদৌলত বিষয়ক কাগজপত্রের সঙ্ঘ হইতেছে তৃতীয় প্রকার গড়ন। তিন প্রকার গড়নের অস্থিমজ্জা আর মাংস পেশী অনেকটা এক ধাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল বিষয় লইয়া ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা জার্ম্মাণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (লাইপৎসিগ ১৯২৪)। বইটা গ্র‍ুণ্ডলেগুঙ ডেস্ রেখ্‌ট্‌স ড্যার উন্টার্ণেমেন্স-ৎস্থসামেনফস্থুঙেন" (কারবার-সঙ্ঘ বিষয়ক আইন-কানুনের ভিত্তি)। গ্রন্থকার হাউসমান।

পুঁজি-সঙ্ঘ-বিষয়ক আইন-কানুন বর্ত্তমান জগতে এত জরুরি কেন তাহা ভারতের নরনারীর পক্ষে সহজে বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর নয়। কিন্তু দুইএকটা বিলাতী ও মার্কিণ জীবনের দৃষ্টান্তে ইহা বেশ মালুম হইবে। দুইখানা গ্রন্থ এই উপলক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য। "আমেরিকান টোবাকো কোং" নামক মার্কিণ কারবার আর "ইম্পীরিয়্যাল টোবাকো কোং" নামক বিলাতী কারবার দুইটা জগতে প্রসিদ্ধ। এই দুই কোম্পানীর যথেচ্ছাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। লোকেরা তিতিবিরক্ত হইয়া মার্কিণ গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ রুজু করে, "ফেডারাল ট্রেড কমিশ্যন" নামক যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বাণিজ্য-বিচারালয় মোকদ্দমা বিচার করিয়া দেখিতে বাধ্য হইয়াছে। বিচারটা ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আর একখানা বইয়ের নাম কম্‌বিনেশুন ইন্‌ দি আমেরিকন ব্রেড বেকিং ইণ্ডাষ্ট্রি" (আমেরিকায় রুটিওয়ালাদের সঙ্ঘ)। ১৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখক আল্‌সব্যার্গ, ১৯২৪-২৫ সনে নবগঠিত সঙ্ঘগুলার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশক ষ্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-গবেষণা বিভাগ।

আমাদের ভারতে এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যাঁহারা চাষীদিগকে পল্লী-প্রেমিক, কুটির শিল্পী, পরিবার-সেবী রূপে বিবৃত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শনে চাষী-চরিত্র সহুরে-চরিত্র হইতে পুরাপুরি পৃথক। এই ধরণের মত কোনো কোনো বিদেশী পণ্ডিতের মতেরই ছায়াবিশেষ। রুশিয়ায় এই দর্শন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। নারদ্‌নি-প্রবর্ত্তিত "কট্টর স্বদেশী" দল এইরূপ মতের প্রচারক।

রুশ চাষী ও মূল্য-তত্ত্ব

এই মত কতটা টেকসই তাহার বিচারও চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া। সম্প্রতি রুশ পণ্ডিত স্তুদেন্‌স্কি-প্রণীত দুইখানা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কৃষি-ব্যবস্থাকে মূল্য-বিজ্ঞানের ভিতর ফেলিয়া লেখক আর্থিক জগতের একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতে চাষ-আবাদ বলিলে দুই শ্রেণীর কাজ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ আধুনিক বা নব্য কৃষি-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে পুঁজিনীতি-শাসিতরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে। আজকালকার ফ্যাক্টরিতে, ব্যাঙ্কে, আমদানি-রপ্তানিতে যে ধরণের "পুঁজি-শাহী" বা পুঁজিতন্ত্র চলে চাষ-আবাদের কাজেও সেই ধরণেরই মূলধন-মাহাত্ম্য, মজুর-মালিক সম্বন্ধ, বাজারে কেনা-বেচার রীতি দেখা যায়।

বর্ত্তমান জগতের অন্য প্রকার চাষ-ব্যবস্থা হইতেছে প্রাক্‌-পুঁজিশাহীর অন্তর্গত। এই ব্যবস্থাকে সহজে "সেকেলে", আদিম বা মান্ধাতার

আমলের কৃষিকর্ম্ম বলা চলে। এই কৃষিকে "প্রাকৃত" বলিলে পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত কৃষিকে "সংস্কৃত" বলিতে পারি।

সাধারণতঃ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, এই দুই ধরণের চাষ-আবাদে দুই বিভিন্ন ধন-সূত্র খাটে, "প্রাকৃত" কৃষিতে মজুরির নিয়ম, দামের নিয়ম, খরচপত্রের নিয়ম যেরূপ তাহা এ কালের নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় না। এই মতের বিরুদ্ধে রায় দিয়া স্তুদেন্স্কি বলিতেছেন যে,—সকল প্রকার চাষ-ব্যবস্থায়ই এক বিনিময়-নীতি, এক মুদ্রা-নীতি, এক মূল্য-নীতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই পুঁজি-নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতি-যোগিতা, টক্কর, বাজারের দর-কষাকষি তথাকথিত "সেকেলে," আদিম বা "অ-সভ্য" কৃষি-দুনিয়ায়ও পাকড়াও করা সম্ভব।

স্তুদেন্স্কির বস্তুনিষ্ঠ, অঙ্ক-নিষ্ঠ গবেষণায় কতকগুলা নতুন তথ্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার রুশিয়ায় চাষীরা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ বাজারে বেচিত। নিজ পরিবারের ভরণপোষণই তাহাদের কৃষিকর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত না।

কট্টর "স্বদেশী আদর্শের" প্রচারকেরা বলিয়া থাকেন যে, "অ-সভ্য" চাষীরা পারিবারিক ভোগের জন্য যেটুকু দরকার তাহার বেশী ফসল উৎপাদন করে না। স্তুদেন্স্কি বলিতেছেন,—তাহা হইলে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক চাষীরই মাসিক বা বার্ষিক আয় ফসলের মাপে সমান হওয়া উচিত। কেননা খাওয়া-পরার জন্য প্রত্যেক পরিবারেরই সমান দরকার। আয়ের সমতা "প্রাকৃত" চাষী সমাজের একটা বিশেষত্ব বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, "সেকেলে" কৃষি-ব্যবস্থায় আয়-সাম্য দেখা যায় কি? যায় না। বরং উল্টাই দেখা গিয়াছে। কোনো ব্যক্তির আয় হয় ত মাত্র ২১ রুব্‌ল্। আবার কোনো ব্যক্তির আয় ১০০ রুব্‌ল্। পল্লী-গ্রামের আনাড়ি চাষীরা বাজার বুঝে না,—তাহারা খুব সাদাসিধা

লোক,—নিজ গৃহস্থালীর জন্য জিনিষ তৈয়ারী হইয়া গেলেই তাহারা স্বর্গসুখ অনুভব করে,—ইত্যাদি কথার পশ্চাতে কোনো নিরেট যুক্তি নাই। "সেকেলে" চাষীরাও নিজ নিজ মেহনৎকে পারিবারিক প্রেমের ডাক বিবেচনা করে না। তাহার দাম কষিয়া দেখিতে তাহারা বেশ পটু।

কর্ম্ম-পরিচালনার বিজ্ঞান-কথা

আজকালকার দিনে কর্ম্ম-পরিচালনা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ষ্টুটগার্টের পোয়েশেল কোং একখানা কর্ম্ম-পরিচালনা-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৩১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা, কারখানা-পরিচালনা, বিশ্ব বাণিজ্য, রেল-জাহাজ, কৃষিকর্ম্ম, বন-সম্পদ, হস্ত-শিল্প, বীমা, সমবায়-সমিতি, খাজনা, আফিস-পরিচালনা ইত্যাদি সকল বিষয়েই শৃঙ্খলীকৃত তথ্য আছে। ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ এই "আখিভ্ ড্যর ফোর্টশ্রিট্টে বেট্রী ব্‌স্-হ্বিস্‌সেন-শাফ্‌ট্‌লিখার ফর্শুঙ্ উণ্ড লেরে" (কর্ম্ম-পরিচালনাবিজ্ঞানের গবেষণা এবং পঠনপাঠন-বিষয়ক উন্নতির গ্রন্থশালা) ঘাঁটিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শিল্প-কারখানায় চিত্ত-বিজ্ঞান

চিত্ত-বিজ্ঞান ক্রমশঃ ফলিত বিদ্যায় পরিণত হইতেছে। টাকাকড়ির কারবারে, শিল্প-কারখানার কর্ম্মকেন্দ্রে, আর্থিক জীবনের সকল বিভাগেই নরনারীর কর্ম্মদক্ষতা পরীক্ষা করা সম্ভব। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব, জীবনবত্তা, চরিত্রের বিশেষত্ব মাপিয়া জুকিয়া নির্দ্ধারিত করা চলে। এই সকল দিকে আমেরিকায় নানা ল্যাবরেটরিতে অনুসন্ধান-গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণির এঞ্জিনিয়ার সাক্‌সেনব্যর্গ এই বিষয়ে একখানা বই লিখিয়াছেন। ড্রেস্‌ডেনের টেকনিক্যাল কলেজে সাকসেন-ব্যর্গ অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। গ্রন্থের প্রকাশক বার্লিনের স্প্রিঙ্গার

কোং। কয়েকজন স্ত্রী-মজুরের কর্ম্মক্ষমতা পরীক্ষা করা হইয়াছে। কোন্ শক্তির প্রভাবে কর্ম্মের পরিমাণ বাড়িয়া যায় আর কিরূপ অবস্থায় পরিমাণ কমিতে থাকে তাহার আঁকজোক আছে। তাল, মান, সুর, তাপ ইত্যাদি নানা শক্তির ফলাফল মাপিয়া দেখা হইয়াছে। লাইপৎসিগের অধ্যাপক ব্র্যিশর এই বিদ্যার অন্যতম প্রবর্ত্তক।

যন্ত্র গোলাম মানুষের

ডেনমার্কের কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বির্ক জার্ম্মাণির কীল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেইটা "টেৰ্খনিশার ফোর্টশ্রিট উণ্ড য়্যিবার-প্রোডুক্ট্সিয়োন" (যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাল-উৎপাদনে অতিবৃদ্ধির যোগা-যোগ) নামে বাহির হইয়াছে (১৯২৭)। মাল-উৎপাদনের "অতিবৃদ্ধি" হইলে সমাজে "আর্থিক দুর্য্যোগ," "বাণিজ্যিক ধূমকেতু" ইত্যাদি উপস্থিত হয়। তাহার ফলে কিছুকাল ধরিয়া বহুলোক বেকার থাকিতে বাধ্য। আর অনেক বেপারীর মাল পচে। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিওয়ালাদের টাকাকড়িও নষ্ট হয়। মার্ক্‌স্-পন্থীরা পুঁজিতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহাদের বিচারে পুঁজি-সংগ্রহ, পুঁজি-নিষ্ঠা ইত্যাদিই হইতেছে সকল দোষের গোড়া। যতদিন সমাজে ধন "সঞ্চয়ে"র বাতিক থাকিবে ততদিন "আর্থিক দুর্য্যোগ" লাগিয়া থাকিবেই। বির্ক বলিতেছেন, এই যুক্তি টেঁকসই নয়। তাঁহার মতে "চাই আরও পুঁজি। দুনিয়ায় যে পরিমাণ পুঁজি আছে তাহাতে জগতের নরনারীর অভাব মোচন হইতে পারে না। মানুষের উদ্ভাবিত কলযন্ত্র আজকাল অনেক দিকে উন্নত হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা আর জটিলতাও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ আজকাল অনেক নতুন উপায়ে তাহার দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলাকে মানুষের কাজে লাগাইতে হইলে চাই রুধির, চাই পুঁজি। এককথায়, মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা যে পরিমাণে

বাড়িতেছে মানুষের ধনসঞ্চয়, মানুষের পুঁজিনিষ্ঠা, মানুষের পুঁজিসংগ্রহ সেই পরিমাণে বাড়িতেছে না। কাজেই যথোচিত সংখ্যক নরনারীকে মজুর, কেরাণী, এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক হিসাবে বাহাল করা সম্ভবপর হইতেছে না। পুঁজির পরিমাণ বাড়ুক। তাহা হইলে কলযন্ত্রগুলাকে ধনোৎপাদনের কাজে গোলামের মত খাটাইয়া মধ্যবিত্তের আর মজুর-চাষীর বেকার সমস্যা মীমাংসা করা সম্ভবপর হইবে।”

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বীকার্য্যগুলা অথবা নবীন ধনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কাহাকেও বিনা বিচারে হজম করিতে উপদেশ দেওয়া আমার স্বধর্ম্ম নয়। আর্থিক জীবনে ভাঙন-গড়নের যুক্তি-শাস্ত্র বা কর্ম্ম-প্রণালীটা দেখাইলাম মাত্র।

এই সকল বিষয় লইয়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মহলে তর্ক-প্রশ্ন গবেষণা-সমালোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এইদিকে বাঙালী পণ্ডিতগণের শৈথিল্য খুব জবর। ধন-বিজ্ঞান আর আর্থিক-জীবন সম্বন্ধে যুবক-বাঙ্‌লার কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে বিশাল।

বাঙলার প্রত্যেক জেলায়ই দুচার দশজন করিয়া উচ্চশিক্ষিত গবেষক আবশ্যক। দেশী-বিদেশী আথিক তথ্যে দক্ষতা লাভ করিবার জন্য আমরা বাঙ্‌লায় আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো চেষ্টা করি নাই। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা সুরু করিবার জন্য দেশব্যাপী একটা আন্দোলন চালাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইখানে একটা মার্কিন নজির আনিব।

যুক্তরাষ্ট্রে ধনবিজ্ঞান-সম্পর্কিত অনুসন্ধানসমিতি গুন্‌তিতে অনেক। “সোশ্যাল সায়েন্স রীসার্চ কাউন্সিল” নামক সমাজ-শাস্ত্রের গবেষণা-পরিষৎ

অন্যতম। ফী বৎসর এই পরিষৎ কয়েকজন ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিতকে বিভিন্ন বিভাগের জন্য গবেষক বাহাল করিয়া থাকে। গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। বর্ত্তমান বর্ষে উনিশ জন গবেষক মোতায়েন আছেন। অষ্ট্রেলিয়ার মজুর আন্দোলন সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বাহাল হইয়াছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুডরিচ্।

টেনেসি প্রদেশের টাসকিউলাস কলেজের অধ্যাপক গিল্ড কোনো ছোট মার্কিণ শহরের মজুরজীবন আলোচনা করিবেন। বিলাতে বার্থ-কন্ট্রোল (জন্ম-সংযম) আন্দোলন (আজকাল) কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে তাহার গবেষণায় মোতায়েন আছেন আইওয়া প্রদেশের কোনো কলেজের অধ্যাপক হাইম্‌স।

বস্তুনিষ্ঠ প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াই ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ,মার্কিণ ও ইতালিয়ান পণ্ডিতেরা জীবন কাটাইতে অভ্যস্ত। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তাঁহারা এখান-ওখান-সেখান হইতে "আর্থিক সংবাদ" সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হন। এই সকল সংবাদ লইয়া মাঝে মাঝে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে লিখিবার রেওয়াজও তাঁহাদের আছে। বিদেশী ভাষা হইতে তর্জ্জমায় আর সঙ্কলনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নন। তাহা ছাড়া মাল যখন বহরে বেশ পুরু হইয়া উঠে তখন তাঁহারা বিশ্বকোষ-সদৃশ ঢাউস ত্রৈমাসিকের শরণাপন্ন হন। তাহার পরেই "কপালে যদি থাকে" ত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা। "বাঘা" "বাঘা" সকল পণ্ডিতের দস্তরই এইরূপ—ইয়োরামেরিকায়।

এই ধরণের "নিয়মিত" আর্থিক-গবেষণার দৃষ্টান্ত বাঙ্‌লা দেশে খুব কমই দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কর্ত্তব্যজ্ঞান আর পরিশ্রমনিষ্ঠা এখনো যুবক বাঙ্‌লায় অনেকটা অজ্ঞাত। কিন্তু এই দিকে সকলে মিলিয়া দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। "বঙ্গীয় ধন-

বিজ্ঞান-পরিষৎ” নামক একটা গবেষক-ও-লেখক-সঙ্ঘ কায়েম করা আবশ্যক।

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা চাই। কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লির আসল কাজ হইতেছে আইন-কানুন তৈয়ারি করা। আর এই আইন-কানুনের বার আনা চৌদ্দ আনা অংশ হইতেছে ধনদৌলত-সম্পর্কিত। বহির্বাণিজ্য অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করা এই সকল আইন গঠনের অন্তর্গত। রেলের আইন, জমিজমার আইন তাহাদের অন্যতম। আর ফ্যাক্টরি কারখানার শাসন প রচালনাও এই সব আইনের অধীনেই চলিয়া থাকে।

বাংলাদেশে কাউন্সিল অ্যাসেম্ব্লির সভ্য অথবা উমেদার আর কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের সভ্য অথবা উমেদার গুন্‌তিতে আজকাল কম নন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই আর্থিক আইন কানুনের নানা কথা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সেই জ্ঞান-বিস্তার করাই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য থাকিবে,—বলা বাহুল্য।

বঙ্গে দেশ-ও-দুনিয়া চর্চ্চা

১। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ *

বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা

বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় বিশেষ কাঁচা। একথা বাঙালীরা নিজেই আজকাল "ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্" না করিয়া সজ্ঞানে বলিতেছেন। দুর্ব্বলতাটার দিকে দেশের লোকের নজর যখন পড়িয়াছে তখন একটা দাওয়াই আবিষ্কার করিবার দিকে সমবেত বা দলবদ্ধভাবে মাথা খেলানো আবশ্যক। দেশের নিকট একটা প্রস্তাব পেশ করা যাইতেছে। আলোচনা প্রার্থনা করি।

ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কেতাব বাঙালীর পেটে পড়ে নাই,—একথা কেহই বলিবে না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে দেশের ভিতর। তাহার আওতায় এই সকল কেতাবের ঠাঁই আছে। তাহা ছাড়া বিদেশেও বাঙ্গালীরা ব্যারিষ্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইবার জন্য এই সকল বই পড়িয়াছেন। আর একালে শিল্প-বাণিজ্যাদি-বিষয়ক বিদ্যা দখল করিবার জন্য বিদেশী শিক্ষাকেন্দ্রে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা অনেককেই অল্প-বিস্তর করিতে হইয়াছে।

তথাপি বাঙালীর ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্যে ধনবিজ্ঞানের ছাপ এক প্রকার পড়ে নাই। কি দৈনিক, কি মাসিক, কি গ্রন্থ, কোনো

* এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল ইতালিতে থাকিবার সময়, বোল্ৎসানোয় (১৯২৪)। প্রথম বাহির হয় "প্রবাসী"তে (ফাল্গুন ১৩৩১)।

রচনায়ই বাঙালীকে ধনবিজ্ঞান-দক্ষ বলা চলিবে না। এমন কি বিশ বৎসর ধরিয়া যে উত্তরোত্তর চরম মতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিতেছে তাহার আবহাওয়ায়ও এই বিদ্যার অভাব যৎপরোনাস্তি।

স্বদেশ-সেবকেরা আর রাষ্ট্রিকেরা ভক্তিযোগের ভাবুকতা প্রচার করিয়াছেন। আদর্শ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ত্যাগনিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক জীবন-দর্শন সমাজের নানা ঘাঁটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সব তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। কিন্তু তবুও আন্দোলনটা "দেশের মাটিতে" আসিয়া শিকড় গাড়িতে পারে নাই। ধনদৌলতের কথা নিরেটভাবে পাকড়াও করিবার মত মাথা আজও বাঙালী-সমাজে সচরাচর দেখিতে পাই না।

ধনবিজ্ঞানের "ল্যাবরেটরি"

আসল কথা, ধনবিজ্ঞান বইয়ের বিদ্যা নয়। কেতাব পাঠ করিয়া এই বিদ্যা দখল করা অসম্ভব। রসায়ন বিদ্যাটা গ্যাস-বিষ-"ওষুধ" ঢালাঢালির বিদ্যা,—কেতাবী শাস্ত্র নয়। যন্ত্রপাতি, লোহা-লক্কড় ঘাঁটা-ঘাটি না করিতে পারিলে এঞ্জিনিয়ারও হওয়া যায় না। কলকব্জায় আঁতকাইয়া উঠিয়া কেতাবের চিত্রগুলা লইয়া ভাবে বিভোর হওয়া এঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত্তবিদ্যার সাধনা নয়। "ল্যাবরেটরি" আর "কারখানা" হইতেছে রসায়ন-পূর্ত্তের জন্মভূমি। ধনবিজ্ঞানের জন্মভূমিও ঠিক এইরূপই কতকগুলা "ল্যাবরেটরি" আর "কারখানা"।

বাংলা দেশে যাঁহারা চাষ চালাইতেছেন, ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন, তেল তৈয়ারী করিতেছেন পাটের দালালিতে মোতায়েন আছেন, মাল আমদানি-রপ্তানি করিতেছেন, সেই সকল বাঙালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ধনবিজ্ঞানের মশলা। নাই-নাই করিতে-করিতেও এই শ্রেণীর "ধন-স্রষ্টা" বাঙালী-সমাজে আছেন অনেক। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা

অর্থাৎ জীবনটা লইয়া "দার্শনিক" আলোচনা করিবার প্রয়াস দেখা যায় না। বাংলা দেশ এবং বাংলার ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্য এই সকল "জীবন" বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই।

ধনবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি আর কারখানা চালাইতেছেন সরকারী চাকরেয়েরাও। যাঁহারা ডাকঘর, রেলওয়ে ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্রের উচ্চতর পদে বাহাল আছেন, সেই সকল বাঙালীর অভিজ্ঞতা এই বিদ্যার উপকরণ। খাজনা আদায় করার বড়-বড় আফিসে যে সকল বাঙালীর ঠাই, নগর-শাসনে, স্বাস্থ্য-বিভাগে, লোকগণনার কাজে, জেলার তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য কার্য্যালয়ের আবহাওয়ায় যাঁহারা কথঞ্চিৎ মোটা মাহিয়ানা পান তাঁহাদের দৈনিক কাজকর্ম্মের ভিতরও ধনবিজ্ঞান বিদ্যার খুঁটাগুলা লুকাইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীর বাঙালী বাংলার চিন্তা সম্পদকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত বোধ হয় এই হিসাবে "সবে ধন নীলমণি"।

গণিত ও ধনবিজ্ঞান

আর্থিক বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় বাংলাদেশে ধন-বিজ্ঞান জন্মিতে পারে নাই। আর-একটা কারণ কিছু সূক্ষ্ম।

বাংলা দেশে যে সকল বাঙালী ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার কেতাব ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় সকলেই "অঙ্কে কাঁচা।" অথচ যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগে যে-ব্যক্তির আত্মারাম চমকিয়া উঠে, তাহার পক্ষে ধনবিজ্ঞানে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া কঠিন। ডাইনে-বাঁয়ে অঙ্ক ছাড়া ধনবিজ্ঞান আর কিছুই নয়। সংখ্যাগুলা এই বিদ্যার প্রাণ।

সকলেই জানেন যে, পাটীগণিতের যে সকল "আঁক্" পাঠশালার নিম্নতম শ্রেণীতে কষা হয় সে সবই আগাগোড়া হাটবাজার, ভাগ-বাটোয়ারা,

সুদডিস্‌কাউন্ট ইত্যাদির মামলা। সেকেলে শুভঙ্কর আর একেলে গণিতকার উভয়েই ধনবিজ্ঞানের কারবার করেন।

কিন্তু ধনবিজ্ঞান বিদ্যাটার ভিতরও যে অঙ্কশাস্ত্রের ঘর অতি বড়, সে কথা সাধারণের মনেই আসে না। মনে আসে না বলিয়াই অঙ্কে যাঁহারা কাঁচা তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান-ক্লাশে নাম লিখাইয়া থাকেন। কথাটা ঠিক কিনা?

সেকালে ছিল এদেশে "এ" কোর্সের বি-এ পরীক্ষা। প্রাথমিক ধনবিজ্ঞান এই লাইনের অন্যতম পাঠ্য ছিল। এই লাইনে থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রকে পুরাপুরি "বয়কট" করা চলিত। আর আজকালকার বি-এ-তে বোধ হয় প্রথম হইতেই অঙ্কের সঙ্গে "অসহযোগ"। কাজেই যত রাজ্যের যে-যে ছাত্র অঙ্কে কাঁচা সকলে আসিয়া জুটে অধম-তারণ ধন-বিজ্ঞানে। আর এই "কোঠে" নিরাপদ্ থাকিয়া তাহারা সকলেই অঙ্ককে দেখায় "কলা"।

ফল অতি স্বাভাবিক। নীলমলাটওয়ালা সরকারী "রিপোর্ট" কেতাবগুলো যখন আমরা দৈবক্রমে ঘাঁটিতে সুরু করি তখন অঙ্ক সমূহ বাদ দিয়া পড়িতে লাগিয়া যাই একমাত্র "বক্তৃতা" গুলা। খবরের কাগজের বাণিজ্য-পৃষ্ঠাটার "বাজার দর", ব্যাঙ্কের অঙ্ক ইত্যাদি পাঠ করেন এমন ধনবিজ্ঞান-সেবী বাঙালী কয়জন আছেন জানি না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানের "রিসার্চ্চে" মোতায়েন হইবার পর আমরা আলোচনা করি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে প্রভেদ আর 'ভারতীয়' ধনবিজ্ঞানের বাণী! অঙ্কে মাথা খেলিলে আমাদের ধরণ-ধারণ আলাদা হইত।

বাংলা ভাষায় বিদ্যা চর্চ্চা

আর এক আপদ্ ভাষা। বিদেশী ভাষায় কোনো বিদ্যাই মগজে বসিতে পারে না। ধনবিজ্ঞানও ইংরেজির দৌবাত্ম্যেই বাঙালীর এবং অন্যান্য ভারতবাসীর মাথা দখল করিতে পারে নাই।

বাঙালীরা অনেক সময়ে নিজেদেরকে ইংরেজিতে খুব পাকা বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা নয়। ইংরেজী খবরের কাগজের সংবাদ আর টীকাটিপ্পনীগুলা আমাদের অনেকেই অতি সহজে,—জলের মতন—বুঝিয়া যাইতে পারেন। ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু যেই খানিকটা "চিন্তাওয়ালা" ইংরেজী কেতাব অথবা প্রবন্ধ চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই দেখা যায় যে, সেটা বড় শীঘ্র বেশী-সংখ্যক বাঙালীর রোচে না। "পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের" (এক্স্পেরিমেণ্টাল সাইকলজির) তরফ হইতে ইংরেজী-জানা বাঙালীর তথ্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

বি-এ, এম্-এ ক্লাসে ধনবিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়িতে বাঙালী যুবাকে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। এ-কথা কাহারও অজানা নাই। পাঁচশ' বা হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কোনো ইংরেজী বই পড়িয়া শেষ করা একটা অদ্ভুত কৃতিত্ববিশেষ সমঝা হইয়া থাকে। দায়ে পড়িয়া অধ্যাপকের তৈয়ারী-করা চুম্বক মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখা যায় না।

কিন্তু যদি বাংলায় বই থাকিত তাহা হইলে বৎসরে হাজার পৃষ্ঠার জায়গায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা হজম করাও অতি সহজ বিবেচিত হইত। ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে যে কথা বলা হইতেছে সে কথা অধ্যাপক এবং গবেষক মহাশয়দের সম্বন্ধেও খাটে। কয়জন বাঙালী ধনবিজ্ঞানসেবী বৎসরে কত হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী নতুন বিদেশী বই বা পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে বসিলে গোমর ফাঁক হইয়া পড়িবে। সুললিত বঙ্গভাষায় রচনা বাজারে পাওয়া গেলে কি ছাত্র, কি মাষ্টার, কি গবেষক, কি স্বদেশসেবক সকলেই প্রতিবৎসর হাজার-হাজার পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ করিতে সহজেই "সাহসী" হইবেন। অবশ্য একমাত্র মাতৃভাষার কল্যাণেই অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়।

আর্থিক অভিজ্ঞতার মিলন-কেন্দ্র

বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব বাঙালীর ধন-বিজ্ঞান সেবাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। শৈশবেই গণিতের সঙ্গে আড়ি করিবার ফলে আমরা ধন-বিজ্ঞানের অঙ্কগুলাকে "কাঁকড়া বিছা"র মতনই ভয় করিতে শিখিয়াছি। তাহার উপর বিদেশী ভাষাও ধন-বিজ্ঞানকে জীবনের তথ্যরাশি হইতে সম্পর্কহীন করিয়া ছাড়িয়াছে। সকল দিক্ হইতেই আমাদের ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা বাস্তব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব দাওয়াই অতি সহজ। একটা আখড়া কায়েম করা দরকার। সেখানে ব্যাঙ্কার, শিল্পনায়ক, বীমার দালাল, কৃষি-দক্ষ, বণিক্ ইত্যাদি ধন-স্রষ্টার সঙ্গে সরকারী চাকুর্‌্যেরা এক সঙ্গে আড্ডা মারিবেন। আর এই দুই দলের বাঙালীর জীবন-কথা দুহিবার জন্য দেশের অন্যান্য লোক সেই মিলন কেন্দ্রেই হাজির থাকিবেন। চাই বিভিন্ন আথিক অভিজ্ঞতাওয়ালা নর-নারীর পরস্পর যোগাযোগ আর মেলমেশ। বাক্‌বিতণ্ডা, ঝগড়াঝাঁটি, বক্তৃতা-ব্যাখ্যান, তর্কপ্রশ্ন, হাতাহাতি, মারামারি যা কিছু ইয়ারের দলে সম্ভব সবই জননী-বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে। ধনস্রষ্টা আর চাকুর্‌্যেরা অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতে পটু। কাজেই এই বারোয়ারিতলার আবহাওয়ায় তথ্য ও অঙ্কের তালিকা বা "ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" থাকিবে প্রচুর। এই সকল গণিত-সমন্বিত, মাপজোক-নিয়ন্ত্রিত, বাস্তব আর্থিক অভিজ্ঞতার উপর চালাও যে

যত পার "থিয়োরি"ও তত্ত্ব বা "দর্শন"। তাহার পর বাংলা দেশে ধন-বিজ্ঞানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

এই মিলন-কেন্দ্র বা বারোয়ারিতলার নাম দিতেছি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সীমানা

বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের আয়োজনে দেশী-বিদেশী কিছুই বাদ পড়িবে না। অধিকন্তু একমাত্র ইংরেজি অথবা বৃটিশ ও ইয়াঙ্কি মতগুলাই বাঙালার জ্ঞান-মণ্ডল দখল করিয়া বসিবে এমন নয়। ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মান ইত্যাদি ভাষায় তুনিয়া যাহা-কিছু চিন্তা করে, সেই সবও এই আবহাওয়ায় দেখা দিবে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে সহযোগ চলিতে থাকিবে চূড়ান্ত ও নিবিড়। চিন্তারাজ্যে কোনো "বয়কট" চলিবে না। আবার কাহারও প্রতি পক্ষপাত করাও এই রাজ্যের আইনকানুনের বহির্ভূত।

অধিকন্তু কোনো মত-বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন চালানো পরিষদের মতলব নয়। মতগুলা মতমাত্ররূপে "দার্শনিক" বা "বৈজ্ঞানিক" হিসাবে আলোচিত হইবে।

এই পরিষৎ "সাত মাসে স্বরাজ" আনিয়া দিবে না। দেশের লোককে রাতারাতি ধনী করিয়া তোলাও এই পরিষদের সাধ্য নয়। আর ম্যালেরিয়ার মূল উৎপাটন প্লেগের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি অথবা তুর্ভিক্ষের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি সুফলও এই পরিষদের নিকট আশা করা চলিবে না।

ধনদৌলত-সম্বন্ধে বাঙালী জাতির জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সাহিত্যসৃষ্টি হইতে থাকিবে। তাহার ফলে যদি দেশের কোনো উপকার সাধিত হয় এবং অপকার নিবারিত হয় ত হইবে। তাহার বেশী কিছু চাহিলে যে-কোনো বিদ্যাপরিষৎই পত্রপাঠ জবাব দিতে বাধ্য। প্রত্যেক জ্ঞান-মণ্ডলেরই সীমানা আছে।

কর্ম্মগণ্ডী

(ক) উদ্দেশ্য :—

(১) বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চা করিবার জন্য এই পরিষদের উৎপত্তি।

(২) দুনিয়ার আথিক ক্রমবিকাশও এই চর্চ্চার অন্তর্গত। ভারতীয় তথ্যের সঙ্কলন এবং বিশ্লেষণ করিবার দিকেই পরিষদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

(খ) কার্য্য-প্রণালী :—

(১) এই সকল বিষয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীর মিলনকেন্দ্র কায়েম করা হইবে।

(২) আলোচনা, তর্কপ্রশ্ন, বক্তৃতা, সম্মেলন, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের ভিতর ধন-বিজ্ঞান এবং আথিক জীবন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

(৩) বাংলা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) ইস্কুল-কলেজের ধনবিজ্ঞান পঠন-পাঠন-সম্বন্ধে উন্নতি এবং বিস্তৃতির উপায় আলোচনা করা হইবে।

(৫) দেশের ভিতর অনেক সময় সরকারী আথিক সমস্যা হাজির হয়। সেই সকল সাময়িক সমস্যার আলোচনায় যোগ দেওয়া যাইবে।

(৬) দেশের নানা কেন্দ্রে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন বিষয়ক বিদ্যাপীঠ, গ্রন্থশালা, বক্তৃতা-ভবন, আলোচনাগৃহ ইত্যাদি শিক্ষা-কেন্দ্র কায়েম করিবার দিকে লক্ষ্য থাকিবে।

(৭) কলিকাতার নানা প্রতিষ্ঠান অথবা মফঃস্বলের পল্লী সহর হইতে ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিলে সেইসকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের জবাব প্রকাশ করা হইবে।

(গ) বৃত্তিস্থাপন :—

(১) এই বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গে পাকাইয়া তুলিবার জন্য বাঙালী গবেষকদিগকে আর্থিক বৃত্তি দ্বারা সাহায্য করা হইবে।

(২) গবেষণার জন্য দেশের নানা স্থানে পর্য্যটন আবশ্যক হইলে তাহার ব্যয় বহন করা হইবে।

(৩) অনুসন্ধান এবং গবেষণা-পর্য্যটনের জন্য বাঙালী বিজ্ঞানসেবী-দিগকে বিদেশের নানা কেন্দ্রে খোরপোষ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(মামুলী পরীক্ষায় পাশ বা ডিগ্রীলাভে সাহায্য করা এই বৃত্তির মতলব নয়।)

(ঘ) আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও কর্ম্ম-বিনিময় :—

(১) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ধন-বিজ্ঞান-পরিষৎ-সমূহের সঙ্গে ভাব ও কর্ম্ম-বিনিময়ের সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) দেশ-বিদেশের কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্যসচিবের আফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত-সঙ্ঘ, শিল্প-পরিষৎ, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-মণ্ডল, মজুর-সমিতি, কিষাণ-সভা ইত্যাদি কর্ম্মকেন্দ্র ও চিন্তাকেন্দ্র হইতে আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিবে।

(৩) ভারতের নানা স্থানে বিদেশী কন্‌সাল এবং ব্যাঙ্ক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিনিধিরা মোতায়েন আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এই পরিষৎ বাঙালী জাতির আর্থিক চিন্তাসম্পর্কিত লেন-দেন চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) দেশের সমস্যা-সম্বন্ধে বিদেশী ধন-কেন্দ্র, শিল্প-কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিষদের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের নিকট আলোচনা-প্রণালী এবং মতামত চাহিয়া পাঠানো হইবে।

(৫) বিদেশী বিজ্ঞান-দক্ষ নরনারীকে বক্তা, শিক্ষক বা গবেষক-হিসাবে ভাড়া করিয়া আনা হইবে।

(৬) দেশ-বিদেশের সঙ্গে গবেষক-বিনিময়, অধ্যাপক বিনিময়, গ্রন্থ-বিনিময়, পত্রিকা-বিনিময় ইত্যাদি কাজের ভার লওয়া হইবে।

সভ্য ও সহায়ক

ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন আলোচনা করিবার কাজে সাহায্য করা বাংলার সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ। বিশেষ করিয়া কয়েক শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) দেশে অথবা বিদেশে শিক্ষা-প্রাপ্ত প্রত্যেক রাসায়নিক ও পূর্ত্তবিৎ (এঞ্জিনিয়ার) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে পুষ্ট করিয়া তুলিবেন আশা করা যায়। অধিকন্তু কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও বাণিজ্য অথবা এই সকল বিভাগের শিক্ষা কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সকলের সাহায্যই পরিষদের পক্ষে আবশ্যক।

(২) এই ধরণের আর এক শ্রেণীর লোক দেশের আর্থিক কথা-সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহারা সরকারী চাকর্য্যে-হিসাবে কিষাণ মজুর, জমিজমা, রেল, খাল, বন, মাছ, দুধ, স্বাস্থ্য, খনি, চাষ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সর্ব্বদা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত। বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর মুনসেফ এবং অন্যান্য অল্প বিস্তর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে বাহাল কর্ম্মচারীরা এই পরিষদের বড় খুঁটা বিবেচিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহযোগিতা যার-পর-নাই বাঞ্ছনীয়।

(৩) আজকাল সহরে-মফঃস্বলে নানা ব্যক্তি সরকারী ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মমণ্ডলে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ পাইতেছেন। এই সূত্রে ধনবিজ্ঞান এবং আর্থিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহারা সকলেই এই পরিষদের সহায়ক হইবেন বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ তাঁহাদের আলোচনার রসদ জোগানোই এই পরিষদের অন্যতম কাজ।

(৪) পল্লী-সেবক-মাত্রের পক্ষেই ধনবিজ্ঞান-পরিষদের কাজকর্ম্ম বিশেষ মূল্যবান। তাহাদের সাহায্যে এই পরিষৎও যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে।

(৫) মজুর-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা অথবা মজুর-আন্দোলনের নেতৃত্ব করা যেসকল নরনারীর সাধনায় ঠাঁই পায় তাঁহাদের পক্ষেও এই পরিষদের পুষ্টি বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৬) ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় ইস্কুল কলেজে ছাত্র পড়ানো যাঁহাদের ব্যবসা তাঁহাদের সঙ্গে এই পরিষদের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠ বলাই বাহুল্য।

(৭) সংবাদ-পত্র, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি সাময়িক সাহিত্যের প্রকাশক, প্রবর্ত্তক, পৃষ্ঠপোষকেরা এবং সাংবাদিক শ্রেণীর লেখকেরা এই পরিষদের অন্যতম সহায়ক এরূপ ধরিয়া লইতেছি।

(৮) বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালী জাতির উন্নতি কামনায় যে সকল ধনী, জমিদার, শিল্পপতি বা উকীল টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত অথবা এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা হাতে-পায়ে-মাথায় খাটিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবুকতা এই পরিষদের উপরও বর্ষিত হইতে থাকিবে, বিশ্বাস করা চলে।

(৯) সার্ব্বজনিক জীবন এবং পররাষ্ট্রনীতি যাহাদের আলোচনার বিষয় তাঁহারা এই পরিষদের আবশ্যকতা সহজেই বুঝিবেন।

পরিচালনা ও পরিচালক

(ক) সভ্য সংখ্যা সম্প্রতি ধরিয়া লওয়া গেল ১০০০। প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক ৮৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকে মাসিক ১০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী "ধন-বিজ্ঞান" নামক পত্রিকা পাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের পরিচালক-বাছাই এবং অন্যান্য কাজে প্রত্যেকের যোগ থাকিবে।

(খ) পরিচালক-সমিতি। পরিচালকেরা সকল সভ্য কর্ত্তৃক দুই-দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হইবেন। পঁচিশ জন এই সমিতিতে ঠাঁই পাইবেন। তাঁহাদের ভিতর পাঁচজনের বেশী ধনবিজ্ঞান বিদ্যার অধ্যাপক এবং সাত জনের বেশী উকিল, ব্যারিষ্টার ও চিকিৎসক থাকিতে পারিবেন না। অন্যান্য সকলে কৃষি. শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত কর্ম্মে অভিজ্ঞতার জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচন ইত্যাদির নিয়ম যথাসময়ে সুবিস্তারিতরূপে আলোচনা-সাপেক্ষ।

(গ) যে পঁচিশজন লোক পরিচালক-সমিতি গড়িয়া তুলিবেন তাঁহারা ভিন্ন-ভিন্ন পচিশটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষজ্ঞরূপে গড়িয়া উঠিতে সচেষ্ট এইরূপ বুঝিতে হইবে। বিষয়গুলা দ্বিবিধ ঃ—

(১) স্বদেশী ঃ—ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, রেল, জাহাজ, বীমা, কুদরতী মাল, বন, খনি, লোক-সংখ্যা, স্বাস্থ্য, জমিজমার বন্দোবস্ত, পল্লীজীবন, ফ্যাক্টরি-কেন্দ্র, আর্থিক আইন এবং শিল্প-সংগঠন, এই পনেরো বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা পরিচালক হইবার যোগ্য।

(২) বিদেশী ঃ—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, রুশিয়া, ইতালি, জাপান ও তুর্কী এই আট দেশের জন্য আট জন বিশেষজ্ঞ বাছিয়া

পরিচালক-সমিতিতে বসাইতে হইবে। তাহার উপর বিদেশ-বিষয়ক দুইটা মোটা ঘর রাখা হইবে। এক ঘরের জন্য ধনিক-সমাজের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আবশ্যক। আর-এক ঘরের জন্য শ্রমিক ও কিষাণ সমাজের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে অপর এক বিশেষজ্ঞ দরকার হইবে। জাপান-সম্বন্ধে চাই মুসলমান বিশেষজ্ঞ আর তুর্কী-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে হিন্দুকে।

এই পঁচিশ বিভাগের পরিবর্ত্তে অন্য কোনো শ্রেণীবিভাগও চলিতে পারে বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তর্ক-বিজ্ঞানের তরফ হইতে একটা নিখুঁত শ্রেণীবিভাগ কায়েম করা সম্ভব নয়। যাহাতে কালে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হইতে পারে সেই দিকে নজর দিয়া আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইল মাত্র।

(ঘ) পরিচালকেরা পরিষৎ-সংক্রান্ত সকলপ্রকার কাজের ভার লইবেন। বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা, দেশ-বিদেশের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-ব্যবহার চালানো, গ্রন্থপত্রিকাদির প্রকাশ ইত্যাদি সবই এই সমিতির অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(ঙ) পরিচালক-সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন বেতন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। ধন-বিজ্ঞান বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন এবং ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধ্যক্ষের পদ দিতে হইবে। পরিষদের শাসন-বিষয়ক সকল ধান্ধাই এই কর্ম্মচারীর ঘাড়ে পড়িবে। অধ্যক্ষ গবেষকদিগের অনুসন্ধান-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষক থাকিবেন। "ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকার সম্পাদন-ভার তাঁহার হাতেই থাকিবে। অধিকন্তু গ্রন্থশালার তত্ত্বাবধান করা এবং গ্রন্থ-প্রকাশের তদ্বির করা তাঁহার এলাকার অন্তর্গত।

গবেষক

(ক) আপাততঃ বিভিন্ন পাঁচ বিষয়ে পাঁচ জন গবেষক বাহাল হইবেন। বিষয়গুলা নিম্নরূপ :—

(১) ব্যাঙ্ক, বীমা, মুদ্রা, রাজস্ব ইত্যাদি।

(২) রেল, ষ্টীমার, জাহাজ, অটোমোবিল ইত্যাদি।

(৩) দেশের স্বাস্থ্য, লোকসংখ্যা, সার্ব্বজনিক চিকিৎসা ইত্যাদি (চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশকরা ডাক্তারকে এই পদ দিতে হইবে। তিনি অবশ্য চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্বের যোগাযোগ আলোচনা করা তাঁহার কর্ম্ম থাকিবে)।

(৪) মজুর ও কিষাণ।

(৫) শিল্পোন্নতি ও বহির্ব্বাণিজ্য।

(খ) অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পাঁচজন গবেষক নিজ-নিজ আলোচ্য-ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাইবেন, সাময়িক সমস্যাগুলার মীমাংসায় মনোযোগী হইবেন, আন্তর্জ্জাতিক ভাব ও কর্ম্মবিনিময়ের জন্য দায়িত্ব লইবেন, আথিক সংবাদ সংগ্রহ করিবেন, "ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকা সম্পাদনের কাজে মাথা খাটাইবেন এবং অন্যান্য উপায়ে পরিষদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

(গ) গবেষকেরা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। কলেজের অধ্যাপক-হিসাবে তাঁহাদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেককেই ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষায় গ্রন্থপত্রিকাদি ব্যবহার এবং পত্র লিখিবার মতন দখল দেখাইতে হইবে। পঁচিশ হইতে বত্রিশ বৎসরের ভিতর যাঁহাদের বয়স এইরূপ বাঙালীকে গবেষক পদে বাহাল করা হইবে।

"ধনবিজ্ঞান"-পত্রিকা

ক) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষৎ "ধনবিজ্ঞান" নামে পুরাপুরি বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা চালাইবেন। একশ' পৃষ্ঠায় কাগজ বাহির হইবে। আকার থাকিবে "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" ইত্যাদির মতন। দাম হইবে বার্ষিক ৬৲।

(খ) অধ্যক্ষ এবং গবেষকগণ পত্রিকা বাহির করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন। তবে একমাত্র গবেষকদের রচনা, অনুবাদ বা সঙ্কলনই পত্রিকায় ছাপা হইবে এমন নয়। গবেষকেরা পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে দায়িত্ব লইয়া দেশের নানা অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আহ্বান করিবেন। বাহিরের লেখকদের রচনার জন্য দক্ষিণা দেওয়া হইবে। তাহাদের রচনা পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে গবেষকেরা নিজ রচনার দ্বারা অভাব পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। পত্রিকার কোথাও বাংলা হরপ ছাড়া আর কোনো হরপ ব্যবহৃত হইবে না,—মায় ফুটনোটেও নয় আর ব্রাকেটের ভিতরও নয়।

(গ) একশ' পৃষ্ঠার জন্য পত্রিকা নিম্নরূপ বিভক্ত হইবে :—

প্রবন্ধ (বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্ এ, ক্লাসে যে ধরণের বিদেশী গ্রন্থাদি পঠিত হইয়া থাকে অন্ততঃ সেই দরের মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ বা সঙ্কলন এই অধ্যায়ে ঠাই পাইবে) ... ... ৫০ পৃষ্ঠা

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মাসিক সংবাদ ... ৫ "

মাসিক সাহিত্য (ফরাসী, জার্মান, মার্কিন, ইংরেজ, জাপানী, ইতালিয়ান, রুশ এবং অন্যান্য ধনবিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার সূচী নিয়মিত ছাপা হইবে। তর্জ্জমায় কোনো-কোনো প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারও দেওয়া যাইবে) ... ... ১০ পৃষ্ঠা

গ্রন্থপঞ্জী (ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী যেসকল বই ছাপা হয় সেই সকলের বাংলা নাম, ধাম, সন, তারিখ প্রকাশ করা হইবে বাংলা হরপে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ) ... ... ১০ পৃষ্ঠা

ধনদৌলতের গতিবিধি (দুনিয়ার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, টাকার বাজার, মূলধনের চলাফেরা, রাজস্বব্যবস্থা ইত্যাদি "সংবাদ" প্রকাশিত হইবে নিয়মিতরূপে) ... ... ১০ পৃষ্ঠা

আর্থিক ভারত (ভারতীয় কৃষিশিল্প বাণিজ্যবিষয়ক ক্রমবিকাশের তথ্য ও অঙ্ক এই বিভাগের আলোচ্য কথা। বৃটিশ ভারতের বহির্ভূত রাজ-রাজড়াদের "ষ্টেট" সম্বন্ধেও সংবাদ থাকিবে) ... ১০ পৃষ্ঠা

শিক্ষা ও সমাজ (দেশবিদেশের বিদ্যা-কেন্দ্রে ও ধন-কেন্দ্রে কখন কোন্ ব্যক্তির বা কোন প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে কোন্ কোন্ আন্দোলনের সূত্রপাত হইতেছে সেই সকল বিষয়ে তথ্য প্রচার করা হইবে) ... ৫ পৃষ্ঠা

১০০ পৃষ্ঠা

গ্রন্থ প্রকাশ

(ক) বাঙ্গলা ভাষায় আপাততঃ দশ খানা বই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। অন্ততঃ ৫০০ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক কেতাব সম্পূর্ণ থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণীত হইবে। লেখকদিগকে যথোচিত বৃত্তি দেওয়া যাইবে। পাঁচ বৎসরের ভিতর দশখানা বই বাহির হওয়া চাই।

(খ) এই সকল গ্রন্থের লেখক ঢুঁড়িয়া বাহির করা অধ্যক্ষের কার্য্য থাকিবে। গবেষকেরা এই সকল লেখকের অন্তর্গত নন। লেখকদের

সঙ্গে মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করা হইবে না। ফুরণ করিয়া পাণ্ডুলিপির উপর দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

(গ) গ্রন্থগুলা নিম্নলিখিত দশ বিষয়ে তৈয়ারি হইবে:—(১) ব্যাঙ্ক, (২) শিল্প-কারখানা, (৩) রেল, (৪) স্বাস্থ্য ও ধনদৌলত, (৫) জমিজমা, (৬) মূল্য, (৭) বহির্ব্বাণিজ্য, (৮) বীমা, (৯) মজুর-জীবন, (১০) পাট।

(ঘ) প্রত্যেক গ্রন্থ ২০০০ কাপি ছাপা হইবে। লেখকের দক্ষিণাসহ বই প্রতি প্রকাশের খরচ আনুমানিক ধরা যাইতেছে ২০০০৲। দশখানা বাহির করিতে ২০,০০০৲।

গ্রন্থশালা ও পাঠাগার

(ক) নানা ভাষায় ধনবিজ্ঞান ও আর্থিক জীবন বিষয়ক গ্রন্থ, পুস্তিকা এবং পত্রিকা সংগ্রহের জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ একটা গ্রন্থশালা কায়েম করিবেন। এই জন্য প্রথমেই নগদ আবশ্যক ৫০০০৲।

(খ) দেশী-বিদেশী, দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিকের জন্য বার্ষিক লাগিবে ১৫০০৲।

(গ) বার্ষিক বই কিনিতে হইবে আপাততঃ ৫০০৲।

(ঘ) পাঠাগারে বসিয়া যে-কোন লোক কেতাব ও কাগজ পাঠ করিবার অধিকার পাইবেন।

(ঙ) গ্রন্থরক্ষক বেতনপ্রাপ্ত স্থায়ী কর্ম্মচারী। কলেজের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপকের সমান তাঁহার পদ। ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

(চ) গ্রন্থরক্ষক কয়েকজন সহকারী পাইবেন এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইবেন।

খরচপত্র

পাঁচ বৎসরে দুই লাখ

	মাসিক	বার্ষিক	পাঁচবৎসরে
গ্রন্থ প্রকাশ	...	...	২০,০০০৲
গ্রন্থশালা	...	..	১৫,০০০৲
বৃত্তি ও বেতন (অধ্যক্ষ, ৫ গবেষক গ্রন্থরক্ষক)	১,৭০০৲	২০,৪০০৲	১০২,০০০৲
পাঁচজন সহকারী (ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ "টাইপিষ্ট" আবশ্যক)	৪০০৲	৪,৮০০৲	২৪,০০০৲
কার্য্যালয় ও গ্রন্থশালা এবং পাঠাগারের সরঞ্জাম	২০০৲	২ ৪০০৲	১২,০০০৲
পাঁচজন সেবক (দপ্তরী সমেত)	১০০৲	১,২০০৲	৬,০০০৲
			১৭৯,০০০৲

পত্রিকার খরচ এইখানে দেখানো হয় নাই। একশ' পৃষ্ঠার কাগজ মাসিক ৩০০০ ছাপিতে এবং ডাকে ছাড়িতে লেখকদের দক্ষিণা সহ আনুমানিক ধরা হইতেছে বার্ষিক ৬০০০৲। পরিষদের সভ্য-সংখ্যা ১০০০ হইলেই ৮০০০৲ উঠে। কাজেই পত্রিকার জন্য আলাদা আর্থিক দায়িত্ব নাই।

মোটের উপর পাঁচ বৎসরের জন্য ১৭৯,০০০এর ফর্দ্দ। ধরা যাউক দুই লাখ মুদ্রা। এই পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারিলে গোটা বাঙালী জাতিকে ধনবিজ্ঞানের পাঠশালায় হাতে-খড়ি দিবার জন্য পাঠানো সম্ভব। (পুসার কৃষিকলেজে গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসার টাকা খরচ করেন প্রতি বৎসর প্রায় দশ লাখ টাকা)।

লাভালাভ

পাঁচ বৎসরের পর যদি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ উঠিয়া যায় তাহা হইলে বাঙালী জাতির লাভ-লোকসান কতটা? দুই লাখ টাকা খরচ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

জমার ঘরে,—(১) দশখানা বি-এ ক্লাসের পাঠ্য ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ (৫০০০ পৃষ্ঠা)।

(২) ১৫,০০০৲ দামের ফরাসা, জার্ম্মান্ ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং পত্রিকা। এই সব যে-কোন লাইব্রেরীকে উপহার দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই মাল নষ্ট হইবে না।

(৩) ৬০০০ পৃষ্ঠায় ভরা "ধনবিজ্ঞান" পত্রিকার ৬০ সংখ্যা। এই সবও বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ্।

(৪) সাতজন বাঙালী যুবা পাঁচ বৎসর ধরিয়া দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান-সেবীদের সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ কায়েম করিবার জন্য মোতায়েন থাকিবেন। একমাত্র এই কাজের জন্যই দুই লাখ টাকা খরচ করিলেও অতি-কিছু করা হয় না।

(৫) পঁচিশজন পরিচালক বাংলার চিন্তা-সম্পদ্ পুষ্ট করিবার জন্য আর্থিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইবার সুযোগ পাইবেন। সেই সুযোগ বর্ত্তমানে কোন বাঙালী পাইতেছেন না।

(৬) পাঁচ বৎসরের কার্য্যফলে আর্থিক, রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য লেনদেন-সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের চিন্তা একদম নয়া পথে চলিতে থাকিবে। সেই নয়া পথের প্রধান লক্ষণ হইবে বাস্তব-নিষ্ঠা। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে দেশব্যাপী এক বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব আর শক্তি-যোগের নবীন ভাবুকতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই প্রবন্ধে বিবৃত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। ১৯২৮ সনে যে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার পরিচালনা কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলিতেছে।

২। "আর্থিক উন্নতি"র জন্মকথা *

"হ্যান করিব", "ত্যান করিব" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা এই কাগজ বাহির করিতে ঝুঁকি নাই। আর্থিক ব্যবস্থা নরনারীর জীবনে এক বড় কাণ্ড। এই কাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের বাংলাদেশে একসঙ্গে বহু সংখ্যক বাঙালীর সমবেত চিন্তা ফুটিয়া উঠা দরকার। ব্যস্। এইটুকুই আমাদের দর্শন।

আর চাই আমরা আর্থিক জীবনের সকল কথাই বাংলা ভাষায় চর্চ্চা করিতে ও চর্চ্চা করাইতে। ইহার বেশী দৌড় আমাদের নয়। বাংলা-দেশের সর্ব্বত্রই আর্থিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঢঙের বাংলা পত্রিকা বাহির হইতেছে দেখিলে আমরা যার পর নাই সুখী হইব।

---

* **বৈশাখ, ১৩৩৩ (এপ্রিল, ১৯২৬)।**

আর্থিক জীবনের চর্চ্চা কোন্ প্রণালীতে চলিলে বাংলাদেশে ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বেশ পাকা বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার আলোচনা বাহির হইয়াছে বর্ত্তমান সম্পাদকের "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" নামক প্রবন্ধে। লেখকের ইতালিতে অবস্থানকালে—১৩৩১ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে রচনাটা প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রাপ্তব্য (ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, ২৫।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

সেই প্রবন্ধে যে ধরণের "পরিষৎ" কায়েম করিবার কথা তোলা হইয়াছে, তাহা একদিন না একদিন বাঙালী জাতিকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে। সম্প্রতি তাহা বোধ হয় সম্ভবপর নয়। যাহা হউক, তাহার কোনো কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য "আর্থিক উন্নতি"র সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

তিন রকম মাথার এবং তিন রকম অভিজ্ঞতার মেলমেশ ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার খোরাক। প্রথমতঃ চাই আমরা চাষী, শিল্পী, বেপারী, ব্যাঙ্কার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি "ধনস্রষ্টা"দের কাজকর্ম্ম এবং চিন্তা-প্রণালী। আমাদের দ্বিতীয় কুদরতী মাল হইতেছে রেল, ডাক, বন, খনি, স্বাস্থ্য, শুল্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী ও নাগরিক শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীদের সার্ব্বজনীন জীবন-কথা। আর তৃতীয় উপকরণের ভিতর পড়ে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার-ছাত্রদের পঠন-পাঠন এবং গবেষণা। "আর্থিক উন্নতি"র নানা বিভাগে ধনবিজ্ঞানের এই ত্রিধারা মূর্ত্তি পাইতে থাকিবে।

নেহাৎ মামুলি আর্থিক সংবাদও আমাদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। আবার ভাত-কাপড় সম্বন্ধে উঁচু দার্শনিক তথ্য বিশ্লেষণকেও আমরা অতি-কিছু বিবেচনা করিব না। চাই সবই। বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিবার জন্য সবেরই প্রয়োজন আছে।

কাগজগুলির কথা প্রথমে আলোচিত হয় "অমৃতবাজার পত্রিকা"র এক মোলাকাৎ-কাহিনীতে (২২ জানুয়ারী ১৯২৬)। তাহার পর দেশের সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত অনুরোধপত্র পাঠান হয় :—

"সবিনয় নিবেদন,

যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে বাংলার নরনারী আর্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমুদয়ের কথা আলোচনা করিবার জন্য দেশে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষা খানিকটা পূরণ করিবার মতলবে কয়েকজনে মিলিয়া আমরা "আর্থিক উন্নতি" মাসিকপত্র বাহির করিতেছি।

আগামী বৈশাখে ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। সঙ্গে একটা অনুষ্ঠান-পত্র জুড়িয়া দিলাম। তাহাতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী দেখিতে পাইবেন।

আজকালকার দিনে দুনিয়ার অন্যান্য দেশে ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা এবং আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা যে যে প্রণালীতে চলিতেছে, সেই সকল দিকে বাঙালী জাতির নজর টানিয়া আনা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মাণ ইত্যাদি ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকাদির সঙ্গে আমরা বাংলার জনসাধারণের যোগাযোগ কায়েম করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।

আপনাদের পত্রিকায় এই চিঠি এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে পারিলে যারপর নাই উপকৃত ও বাধিত হইব। অবসর মত আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে আপনারা আলোচনা করিতে পারিলেও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে।

আপনাদের কাগজ আমরা নিয়মিতরূপে পাইলে অনেকসময়েই তাহা হইতে তথ্য, সংবাদ ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে পারিব আশা করি। মফঃ-

স্বলের সঙ্গে এবং দেশের সকল প্রকার লেখক-পাঠক-সাংবাদিকের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা কামনা করিতেছি।

ভরসা করি, সকল উপায়ে আপনাদের আনুকূল্য লাভ করিতে পারিব।"

"আর্থিক উন্নতি"—ব্যাঙ্কিং, বহির্ব্বাণিজ্য, টাকার বাজার, বীমা, দালালি, ফ্যাক্টরি, কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, খনি-শিল্প, বনসম্পদ্, রেল জাহাজ, সরকারী আয়ব্যয়, ধনদৌলত বিষয়ক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, ধনাগমের উপায়-সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচার, পল্লী-সংগঠন, নরনারীর স্বাস্থ্য এবং নগর-শাসন ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যমূলক মাসিক পত্র।

প্রথম আলোচ্য বিষয়,— বাংলার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচী, মাঝী, তাঁতী, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, আধুনিক ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য-শিল্পেরপ্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর বাঙালীর আর্থিক জীবন-যাত্রা। (তথ্যসমূহ স্থানীয় সংবাদদাতার মারফৎ সংগৃহীত)।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়,—সমগ্র ভারতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্র-পুঞ্জের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয়,—দুনিয়ার ধনদৌলত এবং বিদেশের সঙ্গে বাঙালীর ব্যবসা বাড়াইবার সুযোগ।

চতুর্থ আলোচ্য বিষয়,— দেশবিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, এঞ্জি-নিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা-পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব-সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-শিক্ষার ধুরন্ধর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা।

পঞ্চম আলোচ্য বিষয়,—দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নরনারীর সঙ্গে সম্পাদকীয় "মোলাকাৎ" এবং মৌখিক কথোপকথন,—কৃষিশিল্পবাণিজ্য এবং ধনবিজ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত।

এই সকল বিষয় দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রণালীতে "সংবাদে"র আকারে পাঠকগণের প্রতিদিনকার জীবন স্পর্শ করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব.—(১) ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী, তুর্ক, মার্কিণ ও ইংরেজি কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক এবং ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার সূচী ও সারাংশ।

(২) আর্থিক জীবনবিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা।

(৩) সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালোচনা।

তাহা ছাড়া পত্রিকার অর্দ্ধাংশ মৌলিক প্রবন্ধে এবং বিদেশী আর্থিক সাহিত্য হইতে তর্জ্জমায় সংগঠিত। উচ্চতম ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার সকল তত্ত্ব এবং সাময়িক আথিক সমস্যার নানা তর্কপ্রশ্ন দুই-ই এই অংশের প্রাণ।

আপাততঃ, "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "বঙ্গবাণী" ইত্যাদির আকারের মাসিক ৮০ পৃষ্ঠা।

পরিচালকবর্গ,—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী (রংপুর), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী (শ্রীরাম-পুর), শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন,—১। "আথিক উন্নতি"কে বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান-চিন্তার কর্ম্মদক্ষ বাহনরূপে গড়িয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। এই মাসিকপত্রের লেখকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত :—(১) আর্থিক জীবন বিষয়ক সাংবাদিক বা তথ্য-সংগ্রাহক, (২) গ্রন্থ-পত্রিকাদির সূচী-সারাংশ-সঙ্কলনকর্ত্তা ও সমালোচক, (৩) প্রবন্ধ-লেখক ও অনুবাদক।

৩। রচনাবলীর কোনো অংশে একটি মাত্র বিদেশী হরপও ব্যবহৃত হইবে না। যেখানে-যেখানে বিদেশী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলিবে না সেই সকল স্থলেও শব্দগুলা বাংলা হরপে বসাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাংলা তর্জ্জমা থাকিবেই। গ্রন্থ-পত্রিকাদির নাম এবং জনপদ বা নরনারীর নাম সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে।

৪। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে আপাততঃ যাঁহার যেরূপ সুবিধা, তিনি সেইরূপই বাংলা তর্জ্জমা চালাইয়া দিবেন। প্রয়োজন হইলে "ফুটনোটে" এই সকল শব্দ লইয়া আলোচনা চলিতে পারিবে।

৫। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ বাংলায় বসাইবার সময় গোলে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি তাহার জন্যও উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা আছে।

৬। কোনো মত বা ব্যক্তিবিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রকার আন্দোলন চালানো এই কাগজে সম্ভবপর হইবে না। তথ্যের জোরে এবং যুক্তির জোরে তত্ত্ব বা মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। যখনই কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকা হইতে নজির উদ্ধৃত করা দরকার হইবে, তখনই সন, তারিখ, প্রকাশক ও লেখকের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

৯। সঙ্কলন-কর্ত্তা ও সমালোচকেরা প্রথমতঃ গ্রন্থ-পত্রিকাদির বক্তব্য কথাগুলা বস্তুনিষ্ঠরূপে বিবৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। তাহার পরে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করা চলিতে পারিবে। সমালোচকদের অনুভূতিই সমালোচনা বা সঙ্কলনের প্রধান অংশ হইবে না, বিবৃত সাহিত্যের যথাযথ চুম্বক প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে।

৯। সমালোচকেরা নিম্নলিখিত আলোচনারীতির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন :— প্রথমে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। তাহার পর

থাকিবে গ্রন্থের নাম (বিদেশী বইয়ের নাম বাংলা হরপে প্রদত্ত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাকেটের ভিতর নামের বাংলা অনুবাদ থাকিবে), পরে সহর ও প্রকাশকের নাম, তৎপরে প্রকাশের তারিখ. তাহার পর পৃষ্ঠা-সংখ্যা, শেষে দাম।

১০। দেশী-বিদেশী যে-কোন আর্থিক বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হইতে পারিবে।

৩। "আর্থিক উন্নতি"র হালখাতা *

আমাদের জন্মদিন ফিরিয়া আসিল। বার মাসে "আর্থিক উন্নতি"র ৯৬০ পৃষ্ঠা মাত্র ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই জন্য সম্পাদককে যত মেহনৎ করিতে হইয়াছে সেই মেহনতে ডবল ক্রাউন যোলপেজী আকারের প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রা-নীতি-বিষয়ক, অথবা ব্যাঙ্ক-ব্যবসা-বিষয়ক, অথবা বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক অথবা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা বই লেখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু স্বদেশ-সেবার সেই পথ বর্জ্জন করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে "পাঁচ ফুলে সাজি" জাতীয় অর্থ নৈতিক মাসিক পত্রিকা।

আমাদের এই পথে বন্ধু জুটিয়াছেন অনেক। একটা নয়া বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। মফঃস্বলের বহুসংখ্যক পল্লীতে "আর্থিক উন্নতি"র পৃষ্ঠপোষক আছেন। তাঁহারা কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবিকা অর্জ্জন করেন, কেহ বা কৃষি-সমবায়-সমিতির সম্পাদক, কেহ বা ইস্কুল-কলেজের কর্ণধার। তাঁহাদের অনেকে ব্যাঙ্ক

---

* বৈশাখ, ১৩৩৪ (এপ্রিল, ১৯২৭)।

চালাইতেছেন, অনেকে বীমা-সমিতির এজেণ্ট, অনেকে যন্ত্রপাতির কারবারে নিযুক্ত। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, মজুর-সেবক, কিষাণ সেবক, সরকারী চাকুরো, সংবাদপত্রের সম্পাদক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক আমাদিগকে নানা উপায়ে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি। ভবিষ্যতেও তাঁহাদের আর তাঁহাদের বন্ধুবর্গের আনুকূল্য প্রা"না করি।

এই নূতন পথে মেহনতের মাপে সা৺কতা লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। "হাতী ঘোড়া" কিছু করিবার মতলব কোনো দিনই ছিল না। কিন্তু মতলবটা যাহাই থাকুক না কেন,—কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র অসম্পূর্ণতা পদে পদে দেখা দিয়াছে। বীমা, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থিক জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বইও নাই, পত্রিকাও নাই। সাধারণ মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই সকল বিষয়ে যে সব আলোচনা বাহির হয়, তাহা পরিমাণ হিসাবে বা মালের উৎকর্ষ হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

কাজেই "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদনে দেশের ভিতরকার অন্যান্য পত্রিকা হইতে উল্লেখযোগ্য আত্মিক সাহায্য পাওয়া যায় না। বাংলার বিভিন্ন কাগজ হইতে, বিশেষতঃ মফঃস্বলের পত্রিকা হইতে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার দিকে ঝোঁক আমাদের প্রবল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য একমাত্র নিজ পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফল অতি স্বাভাবিক। প্রায় কোনো বিষয়ই খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আলোচনা করা ঘটিয়া উঠে না। আমাদের এই অসম্পূর্ণতা শুধরাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে দেশের ভিতর ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ বিষয়ক পাঁচ সাতটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাগজের প্রতিষ্ঠা। বহুসংখ্যক লেখক ও পত্রিকা

একসঙ্গে বাজারে দেখা না দিলে,—সহযোগিতার অভাবে "আর্থিক উন্নতি" প্রায়ই আংশিক ও অপূর্ণ থাকিতে বাধ্য।

আর্থিক জীবনের সকল বিভাগ

"আথিক উন্নতি"র অলোচনা-ক্ষেত্র বিশ্বজোড়া। আলোচ্য বিষয়-গুলারও সীমানা নাই। কোনো বিষয় সুবিস্তৃতরূপে খতাইয়া দেখিতে হইলে তাহার জন্য অনেক পৃষ্ঠা দেওয়া দরকার। অধিকন্তু কয়েক সংখ্যা ধরিয়া ধারাবাহিক রূপে প্রবন্ধ বা আলোচনা বাহির করাও আবশ্যক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আর্থিক জীবন সম্বন্ধায় কোনো এক বিশিষ্ট বিভাগের পত্রিকা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। তাহাতে বর্ত্তমান পত্রিকার লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। আথিক জীবনের সকল প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করাই "আথিক উন্নতি' র উদ্দেশ্য।

ইংরেজি, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান এই পাঁচ ভাষায় সম্পাদিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক অর্থ-পত্রিকা সর্ব্বদা আমাদের চোখের সম্মুখে থাকে। কেবল সম্মুখে থাকে মাত্র নয়,—এই সকল পত্রিকার আকার-প্রকার, লেখক-পাঠক-সমালোচক, রচনা-সমালোচনা-টীকাটিপ্পনী ইত্যাদি সব-কিছুই "আথিক উন্নতি"র পাঠকগণের নিকট হাজির করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। অর্থনৈতিক পত্রিকার সম্পাদন-বস্তুটা যে কি তাহা এই উপায়ে বাঙালী পাঠক সমাজে সহজেই ধরা পড়িবার কথা।

কোন্ দেশের সাহিত্যে কিরূপ তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারিত হয় তাহার সঙ্গে বাঙালীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত করাইয়া দেওয়া "আথিক উন্নতি"র অন্যতম ধান্ধা। এই উপায়ে দুনিয়ার মাপকাঠি দিয়া আমরা নিজ নিজ জীবন, কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী জরীপ করিতে অভ্যস্ত হইতে পারি।

বাঙালী সমাজকে পত্রিকা-সম্পাদনের বিশ্বরূপ দেখাইয়া "আর্থিক উন্নতি' নিজেই নিজের সমালোচনায় সাহায্য করিতেছে। আর জগতের চিন্তাক্ষেত্রে বাঙালীর ঠাঁই কোথায় তাহাও চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইতেছে। কি ব্যক্তি, কি জাতি,—উভয়ের পক্ষেই আত্মসমালোচনা একটা মস্ত আধ্যাত্মিক দাওয়াই, আর তাহার জন্য বস্তুনিষ্ঠ বিশ্ব-বোধ অত্যাবশ্যক। "আথিক উন্নতি"র সাহায্যে বাঙালী সমাজ নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে খানিকটা সজ্ঞান হইতে পারিতেছে,—বিশ্বাস করি।

মার্কিন ধনসাহিত্য ও যুবক ভারত

বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যা বলিলে যুবক ভারত প্রধানতঃ—বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র ইংরেজ পণ্ডিতদের রচনাই বুঝিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-৭) আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে যুবক বাংলার আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা কায়েম হয়। ইয়াঙ্কি-স্থানের নরনারী যুবক ভারতের প্রিয় হইয়া উঠে। তখন হইতে মার্কিণ মুল্লুকের অর্থনৈতিক সাহিত্য ভারতের চৌহদ্দীর ভিতর কিছু কিছু করিয়া প্রবেশ করিতে থাকে। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতসন্তানেরা মার্কিণ কৃতিত্ব প্রচার করিবার কাজে অন্যতম বা একমাত্র অগ্রণী। এই প্রচারের অন্যতম ফল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিণ ধনসাহিত্যের সরকারী ইজ্জৎ-প্রতিষ্ঠা।

এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে—যুবক-ভারতের পশ্চাতে পশ্চাতে আশুতোষ যতদিকে চলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাহার ভিতর তাঁহার আমেরিকা-প্রীতির দিকটা অন্যতম। ১৯২০-২৫ সনের ভিতর মার্কিণ ধনসাহিত্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ধনসাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সমান আসন পাইয়াছে।

ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে আমেরিকার আর মার নাই বলা যাইতে পারে।

যুবক ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে ইংরেজ চিন্তার সঙ্গে মার্কিণ চিন্তার টক্কর চলা ভাল। ইহাতে আমাদের আত্মার বিস্তারসাধন ঘটিবে। অধিকন্তু আজ ১৯২৭ সনে বেশ খোলাখুলি জানিয়া রাখা দরকার যে,—আমেরিকার পাণ্ডিত্য ইয়োরোপের পণ্ডিত-মহলে সমাদৃত হইয়া থাকে। ফরাসা, জার্ম্মাণ আর ইতালিয়ান পত্রিকায় ও পরিষদে মার্কিণ ধনসাহিত্যের কদর দিন দিন বাড়িতেছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণও আমেরিকার নামে আর নাক সিটকাইতে চেষ্টা করেন না। ইয়াঙ্কি পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয় সুরু হইয়াছে। আমেরিকার নরনারা কোন্ কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ চিন্তা করিতেছে অথবা কোন্ কর্ম্মকেন্দ্রে কিরূপ কৌশল চালাইতেছে তাহা জানিবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখিতেছি ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান পণ্ডিত সংসারে আর কেজো মহলে। "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদনে বিশ্বশক্তির এই মূর্ত্তি বাদ পড়ে নাই। ভবিষ্যতেও বরাবরই মার্কিণ চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বজায় রাখিয়া চলা হইবে।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধনসাহিত্য

মার্কিণ চিন্তা-ধারার সঙ্গে যুবক বাংলার আত্মীয়তা যত নিবিড়, ফরাসী ও জার্ম্মাণ চিন্তাধারার সঙ্গে তত নিবিড় নয়। এইখানে কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা দরকার। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলার বিজ্ঞানসেবীরা আজকাল অনেকেই ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত গ্রন্থ-পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত আছেন। অধিকন্তু বাংলাদেশে প্রাচীন ভারতের ভাষা, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চ্চা যাহারা করিতেছেন তাহাদের বৈঠকেও ফরাসী আর জার্ম্মাণ ভাষা

আস্তে আস্তে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিগত পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর বাঙালী চিত্তের এইরূপ প্রসার কথঞ্চিৎ সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার বাঙালী সেবকেরা প্রায় সকলেই ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় অনভিজ্ঞ। অর্থাৎ এক যুবক বাংলায় এক সঙ্গে দুই মাপকাঠি চলিতেছে। পদার্থ-বিদ্যা আর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এই দুই শ্রেণীর বিদ্যাসেবকেরা যে দরের বিজ্ঞান-চর্চ্চায় হাত দেখাইতেছেন, ধনবিজ্ঞান ইত্যাদির সেবকেরা সেই দরের কোঠায় উঠিতে পারেন নাই।

"আর্থিক উন্নতি"কে প্রতি পদে এই অবস্থাটা মনে রাখিয়া চলিতে হয়। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রণালীর সাহায্যে যুবক বাংলার মগজটা বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা আমাদের অন্যতম ধান্ধা। ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধনপাণ্ডিত্যের স্বপক্ষে বিশেষ কোনো ওকালতী করা বোধ হয় ভারতে আর দরকার নাই। তবে ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রে ফরাসী ও জার্ম্মাণ ধনসাহিত্য ইয়াঙ্কি ও ইংরেজ ধনসাহিত্যের সমান ইজ্জৎ পাইবার অধিকারী,—এ কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করিতে অনেক ভারত-সন্তান আজও নারাজ! দুঃখের কথা।

ইতালি ও জাপান

"আর্থিক উন্নতি"র ফী সংখ্যায়ই ইতালিয়ান আর জাপানী তথ্য ও তত্ত্বের কিছু কিছু হিসাবনিকাস করা হইয়াছে। ইতালি আর জাপানকে যুবক ভারতের চিন্তামণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের অন্যতম ধান্ধা। ইতালি ইয়োরোপের "সভ্য" বা "উন্নত" বা "যন্ত্র-নিষ্ঠ" বা "ধনশালী" দেশগুলার ভিতর নিকৃষ্ট। কম সে কম ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি আর ফ্রান্সের

নীচে ইতালিকে ঠাঁই দেওয়া যাইতে পারে। আর জাপান হইতেছে এই সকল বিষয়ে এশিয়ার সেরা,—এক হিসাবে যুবক ভারতের আদর্শস্থল।

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান এবং পাশ্চাত্য ইতালি সভ্যতার সিঁড়িতে প্রায় এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্যাই একরূপ। উভয়েই আজও কৃষি-প্রধান অবস্থায় রহিয়াছে। উভয়কেই আস্তে আস্তে যন্ত্র-নিষ্ঠ, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সভ্যতার কোঠায় উঠিতে হইতেছে। এই সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত আজ তিন দেশ,—ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা। এই তিন দেশকে ধ্রুবতারা করিয়া জাপান আর ইতালি জীবন-সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। ফ্রান্সের ঠাঁই এই তিন দেশের কিছু নীচে।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আত্মিক সংযোগ অতি নিকট। আজ আমরা ভারতে আর্থিক জীবনের যে ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপান ঠিক যেন তাহার পরের ধাপ। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি আর আমেরিকা পর্য্যন্ত "প্রোমোশ্যন" পাইতে হইলে যুবক ভারতকে ইতালি-জাপান নামক পুলটা পার হইয়া যাইতে হইবে। এই কারণে ইতালিয়ানরা নিজের দেশটাকে আর্থিক হিসাবে "সভ্য" করিয়া তুলিবার জন্য যে সকল সাধনা করিতেছে, জাপানীরা আর্থিক উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতেছে, সবই যুবক বাংলার পক্ষে ভাল করিয়া রপ্ত করা দরকার।

জাপানী ভাষা আমাদের জানা নাই। কিন্তু ইংরেজী ফরাসী ও জার্ম্মাণের সাহায্যে জাপানকে বাংলায় প্রচার করা যাইতেছে। আর খোদ ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ-পত্রিকার রায় "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকেরা কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছেন।

সমসাময়িক আর্থিক ইতিহাস

এই এক বৎসরের ৯৬০ পৃষ্ঠায় কত মাল ছাপা হইয়াছে তাহার শ্রেণীবদ্ধ সূচী এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের শেষ অংশে প্রকাশ করা গেল। সেইটা দেখিলেই মালুম হইবে এক বৎসরের "বাংলার সম্পদ্‌" বস্তুটা কি। তাহার পরই "আর্থিক ভারত" বস্তুর বাৎসরিক কিম্মৎও এক সঙ্গে পাকড়াও করা সম্ভব। আর এই দুই দফা একত্র করিলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে "দুনিয়ার ধনদৌলত" বস্তুর সঙ্গে তাহার তুলনায় সমালোচনা চলিতে পারিবে। বুঝা যাইবে দুনিয়ার মাঝে আমরা আজ কোথায়।

এই তিন অধ্যায়ে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে সেই সবই হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার আসল ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষালয়। এই ধরণের তথ্যের সঙ্গে যে সকল লোকের "হাতে কলমে" যোগাযোগ ছিল না, তাঁহারা কোনোদিনই ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত হইতে পারেন নাই। ইয়োরামেরিকার যে-কোনো ধনবিজ্ঞান-সেবীর মগজটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর পাওয়া যাইবে, এই তিন অধ্যায়ে বিবৃত আর্থিক জীবনের বিভিন্ন তথ্য ও অঙ্কের সঙ্গে হামেশা মোলাকাৎ।

বর্ত্তমান সংখ্যার কোনো এক স্থানে একবার বলা হইয়াছে যে, মার্শ্যালের "ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড ট্রেড" আর "মানি ক্রেডিট কমার্স" নামক ঢাউস বই দুইটার আগাগোড়াই এই ধরণের তথ্যগুলা সাজাইয়া গুছাইয়া বলা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্‌ অব ইকনমিক্‌স্‌" নামক মার্শ্যালের ধনসম্পত্তি-বিষয়ক "দার্শনিক" গ্রন্থের সূত্রগুলার পশ্চাতেও এই ধরণের নিরেট তথ্যই বিরাজ করিতেছে।

বস্তু-নিষ্ঠা ও তথ্য-সংগ্রহ

এই শ্রেণীর তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রণালী নানাবিধ। কৃষিক্ষেত্রে বিচরণ, পল্লী-পর্য্যটন আর বস্তি-নিরীক্ষণ এক উপায়। কারখানায় কারখানায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মজুরদের মালিকদের ঘরবাহির দুইদিক্ বুঝিয়া বেড়ানো আর এক উপায়। রেল-আফিসে, ষ্টীমার-ষ্টেশনে, ফেরিঘাটে, রাস্তায়, সড়কে লোকজনের আর মালপত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা অন্য উপায়। তাহা ছাড়া, ষ্টক-এক্স্‌চেঞ্জের দালাল-পাড়ায় নাক গুঁজিয়া পাটের "গন্ধ," তেলের "গন্ধ" শুঁকিয়া আসা অন্য এক উপায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ম্মগুলা স্বচক্ষে দেখা আর মুটে-মজুর, কিষাণ-জমীদার, মনিবমালিক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করা তথ্য-সংগ্রহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল মহলেই সব সময়ে কোনো লোকের পক্ষে হাজির থাকা সম্ভব নয়। কাজেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ব্যাঙ্ক-বিবরণী, কারখানার বার্ষিক হিসাব, মজুর-সমিতির ইস্তাহার, গবর্মেণ্টের সরকারী বাণিজ্য-সংবাদ ইত্যাদি দলিল অত্যাবশ্যক। যে-সকল দেশের সংবাদ-পত্রগুলা দেশ-নিষ্ঠ সেই সকল দেশের সংবাদ-পত্রসমূহ বস্তু-নিষ্ঠ ধন-সাহিত্যের দলিল।

"আর্থিক উন্নতি"র তথ্য-নিষ্ঠায় এই দুই প্রণালীই পরিস্ফুট। তাহারই অন্যতম নিদর্শন "মোলাকাৎ" অধ্যায়। নিজের মতামত পুরাপুরি চাপিয়া রাখিয়া অন্যান্য লোকের অভিজ্ঞতাগুলা প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া বস্তুনিষ্ঠ-রূপে খুলিয়া ধরা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। বার মাসে যে বার শ্রেণীর নরনারীর অভিজ্ঞতা বাংলা ভাষায় প্রচার করা গিয়াছে তাহা ভারতীয় সাহিত্যে বোধ হয় নতুন চিজ।

ধনবিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য

"সমালোচনা" বলিলে "আর্থিক উন্নতি" যাহা বুঝিয়া থাকে তাহা অতি সহজ। গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত মালের চুম্বকই আমাদের সমালোচনা-অধ্যায়ের প্রাণ। অধ্যায়টার পৃষ্ঠাসংখ্যা বেশী নয়। প্রায় সবসময়েই "নমোনমঃ" করিয়া সারিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বার মাসে যে কয় পৃষ্ঠা সমালোচনার অধ্যায়ে বাহির হইয়াছে তাহা একত্র করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে আধুনিক ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের আকার-প্রকার সম্বন্ধে খানিকটা জ্যান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী,—এই সাত জাতির পণ্ডিতেরা আজকাল যে-সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে সকলেরই কব্জায় আসিবে। "আর্থিক উন্নতি"র আকারের একখানা মাসিক-পত্রিকা আগাগোড়া একমাত্র এই ধরণের সমালোচনা-প্রকাশের জন্য মোতায়েন থাকিলে তবেই যুবক বাংলার ইজ্জৎ রক্ষা পাইতে পারে।

বাংলায় ধনদৌলতবিষয়ক বিশ্ব-সাহিত্য বাঁটা যাইতেছে "পত্রিকা-জগৎ" অধ্যায়েও। মাসের পর মাস দুনিয়া কোন্ কোন্ চিন্তার পর কোন্ কোন্ চিন্তায় আসিয়া খাড়া হইতেছে তাহা গত বৎসরের সংখ্যাগুলা একত্রে দেখিলে সহজেই ধরিতে পারা যায়। আর এই চিন্তা-ভাণ্ডারে কোন্ ব্যক্তির বা কোন্ জাতির দান কতখানি তাহাও হাতে হাতে ধরা পড়ে। বাঙালীর আর অন্যান্য ভারতবাসীর মগজও সঙ্গে সঙ্গেই যাচাই হইয়া যাইতেছে।

রিকার্ডো, রবার্ট ওয়েন ও লুই ব্লাঁ

ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বিশ্ব সাহিত্যের কতকগুলা "ক্লাসিক" বা "শ্রেষ্ঠ" রচনা বাংলা ভাষায় প্রচার করা আর্থিক উন্নতির অন্যতম ধান্ধা। গত বৎসর এইরূপ তিনটা রচনা বাংলায় তর্জ্জমা করা হইয়াছে। তাহার ভিতর রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্ব এক হিসাবে ধনবিজ্ঞান বিদ্যার মূলসূত্র স্বরূপ। অপর দুইটা রচনা ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ ও রিস্ত্ প্রণীত "আর্থিক মতবাদের ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে অনূদিত। একটায় ইংরেজ মজুর-সেবক ওয়েনের ধন-দর্শন, অপরটায় ফরাসী ধনসাম্যবাদী লুই ব্লাঁর মজুর-বিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। এই তিনটা রচনাই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসের অবশ্যপাঠ্যের অন্তর্গত।

রিকার্ডো পারিভাষিক হিসাবে তথাকথিত "ক্লাসিক" বা বনিয়াদি ধাঁচের ধনবিজ্ঞানের প্রতিনিধি। আর অপর দুইজন হইলেন তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী ধনবিজ্ঞানের জন্মদাতা। প্রথম বৎসরেই "আর্থিক উন্নতি" ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার দুই তরফ এক সঙ্গে বাঙালী সাহিত্য-সেবীর সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে।

সমসাময়িক ধনবিজ্ঞানে মূল্য-তত্ত্বের ইজ্জৎ

আজকালকার দুনিয়ায় কোন্ কোন্ আর্থিক সমস্যা বিশ্ববাসীর আর ধনবিজ্ঞানসেবীর বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে গত বৎসর "আর্থিক উন্নতি"র পাতায় পাতায় তাহার চিহ্নোৎ রহিয়াছে যথেষ্ট। বার্ষিক সূচীটা দেখিলেই মালুম হইবে।

কিন্তু এই সূচীও এক বিশ্বকোষ বিশেষ। তাহার ভিতর হাতড়াইতে হাতড়াইতে হয়রান হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আর বাস্তবিক পক্ষে

আজকালকার ধন-সাহিত্যে আলোচিত হয় না এমন জিনিষ নাই। তাহার ভিতর হইতে দুই চারটা দফা আলগা করিয়া দেখাইতে গেলে হয়ত আধুনিক পাণ্ডিত্যের উপর অবিচার করা হইবে।

তাহা স্বত্বেও দুই চারটা দফা স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিতেছি। প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে,—খাঁটি "থিয়োরি" বা দার্শনিক "তত্ত্ব" আজকালকার ধন-সাহিত্যে অল্পমাত্র ঠাঁই অধিকার করে। যে কোনো ধন বিজ্ঞান-পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় যে,—তত্ত্বাংশ প্রায়ই নাই। গ্রন্থপঞ্জী হইতেও বুঝা যায় যে, তত্ত্বের দিকে নজর আজ-কালকার পণ্ডিতদের খুবই অল্প। বিশ্ববাসীর মাথাটা আজকাল খেলিতেছে বেশী করিয়া তথ্যের দিকে, অঙ্কের দিকে, ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের দিকে।

আর একটুকু খুলিয়া বলা দরকার। এই ক্ষেত্রে "তত্ত্ব" বলিলে একমাত্র মূল্য-তত্ত্ব বুঝিতেছি। প্রাকৃতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের যে ইজ্জৎ, আর্থিক জগতে মূল্যতত্ত্বের ইজ্জৎ ঠিক সেইরূপ। কি রেলের মাস্থল, কি ব্যাঙ্কের সুদ-ডিস্কাউন্ট, কি মজুরদের বেতন, কি চাষীর কর, কি মালিকের মুনাফা,—সবই "ভ্যাল্যু" বা মূল্য-তত্ত্বের অন্তর্গত। আর একমাত্র এই তত্ত্বটাই হইতেছে ধনবিজ্ঞানবিদ্যার আসল দার্শনিক ভিত্তি।

"আর্থিক উন্নতি" যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই যুগে এই মূল্য-তত্ত্ব বেশী আলোচিত হয় না। এই সম্বন্ধে যে কয়টা মতামত বাজারে চলিয়া আসিতেছে সেই সবেরই ঘষামাজা কিছু কিছু ঘটিতেছে। তবে সেই দিকেও নজর অল্প। নজরটা কত অল্প তাহা আমাদের বার সংখ্যায় কিছু কিছু জানা গিয়াছে।

দুর্যোগ-তত্ত্ব নবীন ধনবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড

আজকালকার পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন "ক্রাইসিস" বা আর্থিক দুর্যোগ-তত্ত্ব। ধূমকেতুর মতন কয়েক বৎসর পর পর সংসারে এই দুর্যোগ দেখা দিয়া থাকে। এই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণ করা, আর সম্ভব হইলে সেটাকে পাকড়াও করিয়া ঘাড় মটকাইয়া দেওয়া হইতেছে এখনকার ধন-চিন্তার এক বড় সমস্যা।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে,—মূল্য-তত্ত্বের আলোচনাও এই দুর্যোগ-তত্ত্বের আনুষঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, ধনোৎপাদন, ধন-বিতরণ, মজুরির হার, বাজারের দর,— সব-কিছুই আর্থিক ধূমকেতুর আকার-প্রকার বিশ্লেষণের এপীঠ-ওপীঠ বিশেষ। আর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা-নীতি নোট ছাড়িবার কৌশল, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্ম এই সব কথাও দুর্যোগ তত্ত্বের বড় কথা। কারেন্সী আর ব্যাঙ্কিং স্বাধীন ভাবেও আজকাল খুব বেশী আলোচিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু "ক্রাইসিস"-তত্ত্বের সঙ্গে এই টাকাকড়ি-তত্ত্বের যোগাযোগ আজকাল বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

মোটের উপর ক্রাইসিস-বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বকে নবীন ধন-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলিতে পারি। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার জন্য আমেরিকায় আর জার্ম্মাণিতে স্বতন্ত্র পরিষৎ কায়েম হইয়াছে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্য ও তত্ত্ব

"আর্থিক উন্নতি"র সংখ্যায় সংখ্যায় দেখা গিয়াছে যে,—বেকার-সমস্যার তত্ত্বকথা বুঝিবার জন্য জগতের পণ্ডিতেরা উঠিয়া পড়িয়া

লাগিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তথ্য বা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ মাত্র সংগ্রহ করিয়া ধনবিজ্ঞানসেবীরা নিশ্চিন্ত নন। অনেক ক্ষেত্রেই "বেকার" আর আর্থিক ধূমকেতুটা এক সঙ্গে আলোচিত হইয়া থাকে।

আর একটা বড় আলোচ্য বিষয়,—সমসাময়িক শিল্প-বিপ্লব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিতেছে। এই বিপ্লবের একটা তরফ হইতেছে নয়া নয়া যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। অপর দিক্ হইতেছে ট্রাষ্ট, কার্টেল ইত্যাদি নামধারী সঙ্ঘ-গঠন। এই সকল বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে বুঝা কঠিন। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু কিছু দেওয়া গিয়াছে।

নবীন ধনবিজ্ঞানের তৃতীয় কথা-বস্তু হইতেছে আর্থিক জীবনে গবর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ। "সেকেলে" ধনবিজ্ঞান ছিল "স্বাধীনতা"-পন্থী। অর্থাৎ গবর্মেণ্টকে নরনারীর আর্থিক জীবন শাসন করিতে না দেওয়াই দেশোন্নতির উপায় বিবেচিত হইত। ইহারই নাম রিকার্ডো-প্রমুখ পণ্ডিতদের "ক্লাসিক" নীতি। আর আজকাল দেশোন্নতির রীতিনীতি হইতেছে ঠিক উল্টা। কি "ক্রাইসিস," কি বেকার, কি সঙ্ঘ-শাসন—সর্ব্বত্রই চাওয়া হইতেছে গবর্মেণ্টের তদবির ও রক্ষণাবেক্ষণ। ইহাকে বলা যাইতে পারে সোশ্যালিষ্ট দর্শনের জয়জয়কার।

দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্র

তথ্যই হউক বা তত্ত্বই হউক, দেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, "আর্থিক উন্নতি"র সকল প্রকার আলোচনার লক্ষ্য এক। সে হইতেছে দেশোন্নতি আর দেশোন্নতির যন্ত্রপাতি নির্দ্ধারণ। এক বৎসর ধরিয়া "আর্থিক উন্নতি" দেশোন্নতির অর্থশাস্ত্রই প্রচার করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বিশেষ কোনো মত বা পথ সম্বন্ধে প্রচারের ঝাণ্ডা খাড়া করিবার দিকে এই পত্রিকার ঝোঁক নাই। খোলা মাঠে প্রত্যেক মত আর প্রত্যেক পথ আলোচিত হইয়াছে,—ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবে।

ফলতঃ "আর্থিক উন্নতি" কুটির-পন্থীও বটে, আবার ফ্যাক্টরি-নীতিও এই পত্রিকা জোরের সহিতই প্রচার করে। হস্তশিল্প সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"র সংবাদ-পরিমাণ কম নয়, অথচ যন্ত্রপাতির দর্শন চর্চ্চা আর লোহালক্কড়ের গুণগানও এই আসরে খুব বেশীই চলিয়াছে। দেশের নানা কেন্দ্রে ছোট বড় মাঝারি ব্যাঙ্ক কায়েম করিয়া স্বদেশী পুঁজির ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার দিকে "আর্থিক উন্নতি"র ঝোঁক প্রবল,—কিন্তু ভারতে বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও এই পত্রিকা যথেষ্ট আস্থা দেখাইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি" মজুর-পন্থী আর মজুর-সেবক সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি-নিষ্ঠা আর মধ্যবিত্তের উৎকর্ষ প্রচার করাও এই পত্রিকার স্বধর্ম্ম। জমিজমার আইনকানুন শুধরাইবার কাজে "আর্থিক উন্নতি" চরম বৈজ্ঞানিক উপায় আমদানি করিতে চাহে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী ও অন্যান্য নরনারীকে পুনর্গঠিত সমাজের জন্য কর্ম্মদক্ষ করিয়া তুলিতেও আগাগোড়াই এই পত্রিকার প্রয়াস রহিয়াছে।

বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের এম, এ

"আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের ভিতর যদি কেহ ম্যাট্রিকুলেশন-ইণ্টার্মীডিয়েট বিদ্যা মাত্রের অধিকারী থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা রিকার্ডো ইত্যাদি সম্বন্ধে এম, এ'র বিদ্যাই দখল করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের দেশে এম, এ ক্লাসে যাহা-কিছু মুখস্থ

করানো হয় তাহা ইহার চেয়ে বেশী কিছু নয়। বাংলাভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলে এম, এ বিদ্যার অনেক-কিছুই ম্যাট্রিকুলেশন বা ইণ্টার্মীডিয়েটে চালানো সম্ভব।

বস্তুতঃ "আর্থিক উন্নতি"তে যাহা কিছু বাহির হয় তাহার অধিকাংশই কম সে কম ভারতীয় এম, এ মাপের মাল। অথবা এমন কি এম, এ'র পরবর্ত্তী গবেষণা, অনুসন্ধান বা "রীসার্চ" ধাপের তথ্য ও তত্ত্ব রূপে বিবৃত করিলেই এই পত্রিকার অধিকাংশ সংবাদ, টিপ্পনী, সমালোচনা বা প্রবন্ধের যথার্থ চরিত্র প্রকাশ করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার হোমরা-চোমরারা যাহা কিছু বলিতেছে বা করিতেছে প্রধানতঃ বা একমাত্র তাহাই "আর্থিক উন্নতি"র সওদা। অর্থাৎ ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চরম কথাগুলা এই পত্রিকার মারফৎ বাংলা সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

মাসের পর মাস, জগতের ধনবিজ্ঞান পত্রিকায় যে সমুদয় তথ্য আলোচিত হইয়া থাকে সেই সমুদয় দেড় দুই আড়াই বৎসর পর পর গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। আর বিদেশে বইগুলা প্রকাশিত হইবার পাঁচ সাত বৎসর পর,—অনেক সময়ে দশ বিশ বৎসর পর,—আমরা সেই সব বই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্স্ট্‌বুক নির্দ্ধারিত করিতে অভ্যস্ত। কাজেই যাঁহারা বাংলা ভাষার সাহায্যে ফী মাসেই ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ ও জাপানী পণ্ডিতদের রচনাগুলা সংক্ষেপে গণ্ডূষ করিতে পারিতেছেন তাঁহারা যথাসম্ভব বর্ত্তমাননিষ্ঠ রূপে এই বিদ্যার আসরে চলাফেরা করিতে সমর্থ।

আর বিশ্ব-সাহিত্যের গতিটা কোন্ দিকে তাহা জানিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক অবস্থার যথোচিত সমালোচনা করিবার সুযোগও

তাঁহাদের জুটিতেছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ দেশী-বিদেশীর চর্চ্চা এক সঙ্গে চালানো আমাদের আর এক বড় ধান্ধা।

তবে "আর্থিক উন্নতি''র অসম্পূর্ণতার কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। প্রতি মাসে মাত্র আশী পৃষ্ঠা। আর ধনবিজ্ঞান বিদ্যার গবেষক বাঙালী সমাজে এখনো বিরল। যদিও বা দু'একজন দেখা যায় তাঁহারা বাংলা ভাষায় কলম চালাইতে বোধ হয় রাজি নন। কিন্তু যদি ধন-বিজ্ঞানের বিশ্ব-সাহিত্য সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়া বাংলার ধনবিজ্ঞান-সেবীরা বাংলাভাষায় পাঁচ-সাতখানা সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক চালাইবার পথে অগ্রসর হন তাহা হইলে অল্পকালের ভিতর ধনবিজ্ঞানে বাঙালী স্বরাজ কায়েম হইতে পারে।

৪। নয়া বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি ও অর্থশাস্ত্র *

প্রঃ—মফঃস্বলের কাগজগুলো পড়ে' দেখ্‌লাম। তার বেশীর ভাগই বাজে মাল নয় কি?

উঃ—কিন্তু এই কাগজ গুলোকেই "আর্থিক উন্নতি''র "বাঙ্গলার সম্পদ''-বিভাগের ল্যাবরেটরী বলা চলে। কল্‌কাতায় ব'সে কল্‌কাতার কাগজপত্র পড়ে' কল্‌কাতার বাইরের বাঙ্গলার আর্থিক জীবন কেমনভাবে চল্‌ছে, তা ধারণা করা শক্ত। এই কাগজগুলোর ভেতর দিয়েই বাঙ্গলার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা অনেকটা বোঝা যায়।

---

* গ্রন্থকারের সহিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের আলোচনা ("স্বদেশী বাজার", কলিকাতা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯২৮)।

প্রঃ—তা সত্যি, বাঙ্গলাদেশ বাস্তবিক যে কি অবস্থায় আছে,তার সম্বন্ধে ধারণা এই ধরণের কাগজের সাহায্যেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর্থিক খবর তেমন বেশী পরিমাণে এই সমস্ত কাগজে পাওয়া যায় না; রাজনীতিক চর্চ্চাই প্রধান স্থান পায়।

উঃ—রাজনীতিক চর্চ্চাও খুব উঁচু ধরণের হয় না; নিতান্ত তরল আলোচনারই আধিক্য দেখা যায়। তবে আথিক তরফ থেকে এদের কাছে যতটুকু সাহায্য পাই, তার দাম কম নয়। বাঙ্গলার প্রত্যেক স্থানে লোকজনের অবস্থা কেমন উঠ্ছে নাম্ছে, কোথায় নতুন ফ্যাক্টরী বা সহর গ'ড়ে উঠছে, এই সব খবর আমি সংগ্রহ ক'রে বাঙ্গালীর সাম্নে টাট্কা টাট্কা ধর্তে চাই। আর এ কাগজগুলো ছাড়া এই ধরণের খবর যোগাড় কর্বার আপাততঃ আর কোনও উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় লোক পাঠিয়ে অথবা নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করাও অবশ্য সম্ভব, কিন্তু তাতে পয়সা লাগে, কাজেই তত সহজ নয়।

প্রঃ—কেন, গবর্ণমেন্টের রিপোর্টগুলো থেকে ত অনেকটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে?

উঃ—পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু রিপোর্টগুলোতে সাধারণতঃ টাট্কা খবর পাওয়া যায় না, ওগুলো হ'তে যা কিছু জানা যায়, তা সাধারণতঃ রিপোর্ট বেরুবার অন্ততঃ বছর দুয়েক আগেকার' ঘটনা। আর ওগুলো এক একটা বিষয় সম্বন্ধে সমগ্র ভারতের অথবা সমগ্র বাঙ্গলার কথা আলোচনা করে। কিন্তু তাতে বিশেষ বিশেষ স্থানের বা বিশেষ বিশেষ জাতের ও সম্প্রদায়ের কেমন উঠানামা চল্ছে, তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। সেই জন্যে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র যদি ধনবিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শী লোকদেরকে সংবাদদাতারূপে পাওয়া যেতে পারতো, তা হ'লে তাদের নিয়মিত পাঠানো রিপোর্টের

সংগ্রহ থেকে বাঙালীর আর্থিক জীবনের ধারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেমনভাবে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, তা নিখুঁতভাবে ও বিনা বিলম্বে ধরা যেতে পার্‌তো।

প্রঃ—তাহ্‌লে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালীটাই দেখ্‌ছি আপনার হাতে একদম বদ্‌লে যাচ্ছে।

উঃ—ব্যবসাপাড়ার ধরণ-ধারণাটা ইস্কুলপাড়ার ভেতর আনতে পার্‌লেই আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রণালী আর আর্থিক জীবন আগাগোড়া বদ্‌লে যেতে পারবে। সেই দিকেই আমার এখন বেশী লক্ষ্য।

আমি চাই লালদীঘির জল গোলদীঘিতে এনে ঢালতে। কৃষি-শিল্পবাণিজ্যের অভিজ্ঞতাগুলো লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মগজে প্রবেশ করানো আমার এক বড় ধান্ধা। আমার প্রণালী হচ্ছে একসঙ্গে বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের আথিক জীবনের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া। "আথিক উন্নতির" প্রথম তিনটী ভাগে ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্ব" (থিওরি) একটুও স্থান দিই না। ওগুলো শুধু নিছক "ঘটনা"য় আর "অঙ্কে" ভরা - এ সবের সাহায্যেই মানুষের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে নিরেট পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়।

প্রঃ—নামজাদা ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতদের বই পড়া সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

উঃ—ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় ওস্তাদ হ'তে গেলে শুধু বই পড়লেই চল্‌বে না। ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি—যেমন ব্যাঙ্কিং, ইন্‌শিওরেন্স, বহির্ব্বাণিজ্য, যন্ত্রপাতি, মজুর-সমস্যা প্রভৃতি—এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া চাই। আর তার জন্যে দরকার প্রথম -- ভ্রমণ, পর্য্যবেক্ষণ, দেখাশুনা, আর দ্বিতীয়—নানা রকম লোকের সঙ্গে আলোচনা। প্রত্যেক কারবারের বা চিন্তা-প্রণালীর সকল প্রকার প্রতিনিধির সঙ্গে মোলাকাৎ

স্বদেশ-সেবকের পক্ষে ইয়োরামেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাকিয়া উঠা যারপর নাই জরুরী। এ জন্যেই আমি হামেশা ব'লে থাকি,—"হ'তে চাস্ স্বদেশী, ত আগে হ' বিদেশী"। মানুষের আর্থিক উন্নতি কতদূর আর কোন্ পথে সম্ভব, সেটা ধারণা হবে ইয়োরামেরিকাকে জান্‌লে, ইয়োরা-মেরিকার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হ'লে। আর যখন এই ধরণের জ্ঞান দখলে আসবে, তখন যে কোনো দেশে গিয়ে—তা সে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই হোক, জাপানই হোক্ বা মক্কাই হোক্—তার আর্থিক জীবন সম্বন্ধে চর্চ্চা করবার, আর্থিক প্রচেষ্টাগুলোকে ঠিক পথে চালিত করবার ক্ষমতা জন্মাবে। যাকে 'ইকনমিক আই' (অর্থনৈতিক দৃষ্টি) বলা যেতে পারে তা কেবল এই ধরণের লোকেরই জন্মেছে। এই ধরণের লোক ছাড়া আর কেহ বাঙ্গালার বা ভারতের আর্থিক জীবন আলোচনা করবার ও তার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করবার যোগ্য অধিকারী বিবেচিত হ'তে পারে না। যারা আর্থিক জীবনের যে উন্নত অবস্থা এ পর্য্যন্ত জগতে লব্ধ হয়েছে তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারে নি, তারা বাঙ্গলার বা ভারতের আর্থিক অবস্থা বুঝতেও পারবে না, সামাজিক পরিবর্ত্তন-গুলোর তাৎপর্য্যও ঠিক ধরতে পারবে না, আর আর্থিক উন্নতির উপায়ও ঠিক নির্দ্দেশ করতে পারবে না।

প্রঃ—"আর্থিক উন্নতি"তে "দুনিয়ার ধনদৌলত" বিভাগটা "বাঙ্গলার সম্পদ" আর "আর্থিক ভারত" এই দুই বিভাগের ঠিক পরে দিবার মানে কি? অবস্থার পার্থক্যটা বোঝাবার জন্যে?

উঃ—হাঁ, আমাদের অবস্থার আর ইয়োরামেরিকার অবস্থার মধ্যে কতটা পার্থক্য, তা' বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্যে। প্রথম দুই বিভাগ থেকে আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, সে সম্বন্ধে নিরেট বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান পাওয়া যায়। তৃতীয় বিভাগ থেকে ইয়োরামেরিকার

আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তেমনই নিরেট বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান জন্মাবে। তারপর আপনা থেকেই মনে প্রশ্ন জাগ্‌বে—ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কি ক'রে লাভ কর্‌তে পারি ?

প্রঃ—তা হ'লে কি বল্‌তে চান, এখন ওরাই আমাদের আদর্শ ?

উঃ—আপাততঃ তাই, কারণ ওরা এখন ৫০।৬০।৭০ বছর এগিয়ে আছে। যখন ওদের আমরা নাগাল ধরতে পারবো, তখনই কেবল ওদের চেয়ে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে ; আর তখনই কেবল আর্থিক জীবনের বিকাশে ভারতীয় প্রতিভার যদি কিছু দেবার থাকে, তাই দেবার সময় আস্‌বে।

প্রঃ—আর্থিক কর্ম্মকাণ্ডে নিছক অনুকরণ বৃত্তিই আমাদের তা'হলে অবলম্বন করতে হবে।

উঃ—অনেকটা বটে, কিন্তু একেবারে নয়। কারণ, ইয়োরোপকে আমেরিকাকে আমাদের দেখ্‌তে বুঝ্‌তে জান্‌তে হবে—কিন্তু তা ওদের চোখ দিয়ে নয়, কেবল ওদের বইয়ের ভেতর দিয়ে নয়—ওদের জীবনের সঙ্গে আমাদের নিজেদের-ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। কাজেই আমাদের বুদ্ধি বা প্রতিভা প্রয়োগ করার বিশেষ দরকার হবে। তারপর আমাদের বৈদেশিক অভিজ্ঞতা যখন ভারতীয় বা বঙ্গীয় অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে, তখনও ত' বুদ্ধি খেলাবার বিশেষ প্রয়োজন হবে, নিছক অনুকরণবৃত্তি ত' তখন কাজে লাগবে না।

প্রঃ—তা হ'লে আপনি আর্থিক জীবনের "বস্তু-নিষ্ঠ" আর "দুনিয়া-নিষ্ঠ" জ্ঞানের উপর জোর দিতে চান ? অর্থাৎ নিজেদের জীবনের গণ্ডীর মধ্যে না থেকে বাইরের জগৎটাকেও দেখ্‌তে হবে, আর তা দেখ্‌তে হবে "তত্ত্বের" ভিতর দিয়ে নয়, আর্থিক জীবনের বিভিন্ন দিকে

যেমন যেমন বিকাশ হয়েছে—তুনিয়াতে আর্থিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে সব ঘটনা নিত্য ঘটছে—সেগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে'।

উঃ হাঁ ঠিক্ তাই ; তবে 'থিওরির' দিকটাও আমি একেবারে বাদ দিতে চাই না। সেই জন্যে "আর্থিক উন্নতি"তে "পত্রিকা-জগৎ" আর "সমালোচনা" এ তুটী বিভাগও রেখেছি—প্রথমটীর সাহায্যে নানাপ্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক আর্থিক পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় হবে, তাদের ভেতর কি ধরণের মাল মশলা থাকে তাও জানা যাবে। দ্বিতীয়টীর সাহায্যে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালি রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যাণ্ডে যে সব ধনবিজ্ঞানবিষয়ক বই বেরুচ্ছে, তাদের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় হবে। আর এতুটী বিভাগের সাহায্যেই ধনবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত "তত্ত্ব" আর ধনবিজ্ঞানের "ভাষা"—যা অনেক পরিমাণে আমাদের গ'ড়ে নিতে হচ্ছে ও হবে—তাও কিছু কিছু বশে আসবে।

প্রঃ—"পত্রিকা-জগতে" অনেক সময় বিভিন্ন পত্রিকায় কি কি প্রবন্ধ আছে, কেবল তার তালিকা দেখ্‌তে পাই, এ রকম শুধু প্রবন্ধের তালিকায় কি শেখবার কিছু পাওয়া যায় ?

উঃ—সব প্রবন্ধেরই সার মর্ম্ম দেওয়া এই ছোট পত্রিকায় সম্ভব নয় ; তা ছাড়া,বিভিন্ন পত্রিকার নাম আর প্রবন্ধের তালিকা দিয়ে আমি বাঙ্গলা দেশের লোককে ধনবিজ্ঞানবিগ্যার বিস্তারটা দেখাতে চাই। এটাও লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে যে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান পত্রিকা সমূহের প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রায়ই দেওয়া হয়, কারণ এগুলি পড়্‌বার ইচ্ছা থাকলেও সাধারণের নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে।

প্রঃ—ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা সম্বন্ধে আমাদের লোকের উৎসাহ কেমন দেখ্‌ছেন ?

উঃ—এখনো খুব বেশী নয় ; কারণ এবিষয়ের চর্চ্চা আমাদের দেশে

একপ্রকার ছিলই না। জীবনের আর্থিক দিকটাকে আমরা বিশেষতঃ বাঙালীরা বরাবরঃ অল্পবিস্তর অবহেলা ক'রে এসেছি। সেইজন্য আর্থিক আলোচনা দেশের পক্ষে কতটা মঙ্গলজনক, সে সম্বন্ধে এখন কিছু ধারণা হলেও খুব গভীর ধারণা জন্মায় নি। এ বিষয়ে দেশের লোকের নিশ্চেষ্টতা আমি একেবারে ভাঙ্গাতে চাই। আমি তাদেরকে এই সামান্য কথাটা বোঝাতে চাই যে, আর্থিক উন্নতি হচ্ছে শারীরিক নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির এমন কি আধ্যাত্মিক উন্নতিরও এক প্রকাণ্ড খুঁটা।

প্রঃ—একমাত্র লেখালেখির জোরে অথবা বক্তৃতার সাহায্যে বাঙ্গালীর মতিগতি ফেরানো সম্ভব কি ?

উঃ—আমার কাজ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমতঃ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত —সকল প্রকার লোককেই কৃষি শিল্প-বাণিজ্যের কাজে নানা উপায়ে উৎসাহিত করা আর কিছু কিছু হদিস্ জোগানো। এদিকে বাঙালীর মেজাজ আজকাল বেশ একটু খেলছেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীধারী অনেক যুবা বহির্ব্বাণিজ্যে, ফ্যাক্টরির কাজে, বীমা-এজেন্সীতে, চাষ-আবাদে, ব্যাঙ্কের ব্যবসায় ঝুঁকেছে। নয়া বাঙ্গলার ঐ এক বিশেষ সুলক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আর তাহার অন্তর্গত অর্থ-শাস্ত্র বা ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করা আর লেখক গড়ে' তোলা হচ্ছে আর এক কাজ। এ কাজের ফলাফল অবশ্য রাতারাতি দেখা যাবে না। তবে সুবাতাস বয়েছে. লেখালেখির কাজে পয়সা রোজগারের সম্ভাবনা এক প্রকার নাই। তাই লোক জোটা কঠিন।

প্রঃ—এই দুই দিকে বাঙালীর ভবিষ্যৎ কেমন মনে হচ্ছে ?

উঃ—ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ। বাঙালীরা এতদিন এই সকল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মাথা খেলায় নি। প্রধানতঃ এই জন্যই আমাদের

আজ দুর্ব্বলতা। কিন্তু আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাটা যেন বুঝতে পেরেছি। আর এই দুর্ব্বলতা শুধরবার জন্যও বাঙ্গালী সমাজের ছোট-বড়-মাঝারি সব মহলেই সজ্ঞানে চেষ্টা সুরু হয়েছে। আমার বিশ্বাস আগামী বিশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বাঙালী বেপারী, বাঙালী ব্যবসাদার, বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার, বাঙ্গালী ব্যাঙ্কার, বাঙ্গালী অর্থশাস্ত্রী খুব উঁচু ইজ্জৎ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে। তা ছাড়া, বাংলা দেশে অ-বাঙালী বেপারীদের প্রভুত্বও লোপ পেয়ে যাবে।

৫। ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হইতে বাংলায় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার মুক্তিলাভ*

প্রায় আড়াই বছর পর আবার দেশে ফিরে এলাম। আবার পুরাণো ঘানিতে জুড়ে যাব। পুরাণো কথাই আর একবার নতুন করে' বলি। আমার ব্যবসা মজুরের কাজ করা। মজুরগিরি আমার বিভিন্ন প্রকারের। কখনও আছি শিক্ষা-প্রচারে। কখনও বা বর্ত্তমান ভারতের জীবন কি রকম এবং চীন-জাপানের সহিতই বা এর যোগাযোগ কিরূপ, তা আলোচনা করি। আমার আর এক রকমের মজুরগিরি হচ্ছে আর্থিক জগতে কোন্ দেশ কোন্ পথে চল্‌ছে তার সন্ধান রাখা।

---

* বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স ভবনে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত চা-সভায় সম্বর্দ্ধনার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম (৭ নবেম্বর ১৯৩১)। দ্বিতীয়-বারকার ইয়োরোপ-প্রবাসের পর কলিকাতায় প্রত্যাগমন উপলক্ষে এই সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

"বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ" প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেমন মজুর, এ রকম আরও পাঁচ সাত দশ জনকে মজুর রূপে গড়ে' তোলা। এ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমাদের কারবার,—ধনদৌলত সম্বন্ধে কেতাব পড়া, খবরের কাগজ পড়া। এজন্য, ধনোৎপাদন যেখানে যেখানে ঘট্‌ছে সেই সব কর্ম্মকেন্দ্রে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মোলাকাৎ করা আর লেখাপড়া করা ইত্যাদি।

ধনদৌলত সৃষ্টি করা এই পরিষদের কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত নয়, বলাই বাহুল্য। তাহার জন্য ব্যবস্থা চাই অন্য রকমের। জ্ঞানবৃদ্ধি আর সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া এই পরিষদের আর কোনো মতলব থাক্‌তে পারে না।

ধনদৌলতের আলোচনা করার চরম উদ্দেশ্য কি? ধনবিজ্ঞান চর্চ্চায় বাঙালীকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম হ'তে হবে।

বাঙালীরা ধনদৌলতের চর্চ্চায় অগ্রগামী জাতিদের অন্যতম হ'তে পারে কিনা, এবং যদি পারে তা হ'লে কি ক'রে হ'তে পারে এবং কবে হ'তে পারে, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার একটা নেশার মধ্যে পরিগণিত। আর একটা গুরুতর কথা আছে। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হ'তে মুক্তি দেওয়াও আমার একটী উদ্দেশ্য।

অর্থনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা চালাতে হবে বাংলা ভাষার বাহনে, ইংরেজী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'রে। কতদিনে কি উপায়ে বাঙালীর উচ্চতম শিক্ষা-ক্ষেত্রে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র,—কি কৃষি-বিষয়ক, কি শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক,—একমাত্র বাংলা ভাষার মারফৎ আলোচিত হবে, একথা আমার মাথায় যার পর নাই বড় স্থান অধিকার করে।

প্রশ্ন ওঠে, এম-এ ক্লাসে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্ভবপর কি?

১৯১০ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। তখনকার কথা ছিল,—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার ধাপে প্রত্যেক বিষয়ে বাংলা ভাষা কায়েম করতে হবে। সেই প্রস্তাবটাই আজ সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে চালাবার কথা বলছি। অন্যান্য বিদ্যার কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সম্বন্ধে সেই বিশ একুশ বছর আগেকার প্রস্তাবই আবার খাড়া করছি।

আমি যেমন মজুর এই ধরণের মজুর বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কাজে আর সাতজন আছে। তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য করিৎকর্ম্মা যুবা।

কিন্তু, আজই সারা বাংলা দেশ থেকে এই সাত জনেরই সমান সত্তর কি ষাট, কম্‌সে কম্ পঞ্চাশ জন সংগ্রহ ক'রতে পারি। এদেরই সমান তাদেরও কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, মাথাও আছে। কিন্তু এই পঞ্চাশ জনকে ভুপেট খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

তারপর তাদের কাজে লাগানো কঠিন নয়। যদি এদের প্রত্যেককে মাসে ১৫০৲ ক'রে দেওয়া যায়,—অধ্যাপক হ'লে এই রকমই বেতন পেয়ে থাকে,—পঞ্চাশ জনে তা হ'লে অঘটন ঘটাতে পারে।

দশ বছর যদি এদেরকে রাখা যায়, তা হ'লে খরচ পড়ে নয় লাখ টাকা। এই পঞ্চাশ জন গরুকে শুধু বাহাল রাখ্‌লে হবে না, এদের "গোচারণের মাঠ" চাই। এদের মাঠে নিয়ে যাওয়া চাই, কাউকে ব্যাঙ্কে, কাউকে বীমায়, কাউকে ফ্যাক্টরীতে পাঠানো হবে। আবার, কেউবা যাবে বেড়াতে জামসেদপুরে, কেউবা পাঞ্জাবে, আর এক-আধজন যদি পারে, সমুদ্র সাঁতরে ওপারটা ঘুরে আসবে—জাপানে, আমেরিকায় রুশিয়ায়, বলকান-জনপদে, ইতালি-জার্ম্মাণিতে কিছু কিছু ঘাস খেয়ে আস্‌বে।

এই যে পঞ্চাশটী গরু এরা দুধ দেবে কি রকম ?

প্রথমতঃ এদের কাজ হবে অন্যান্য ভাষায়,—ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রের যে সব কেতাব আছে তাদের বাংলা ভাষায় তর্জমা করা। এর ফলে বাংলা ভাষার মারফৎই ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী বইগুলা পাওয়া যাবে। তারপর, "আর্থিক উন্নতি" যে রকম মাসিক পত্রিকা এরকম দশ বারখানা বিভিন্ন কাগজ এক সঙ্গে চালানো সম্ভবপর হবে। তার ফলে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিষয়ক বহুবিধ রচনা বাঙ্গালীর সাহিত্যে দাঁড়িয়ে যাবে।

এই ভাবে কাজ চালাতে পারলে ১৯৪০ সনের মধ্যে বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'রবে। পরের এই তর্জ্জমা করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। স্বাধীন গবেষণার ফলও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে।

'রিসার্চ্চ' বস্তুটা কি এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কম। গবেষণার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কিছু নেই। প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মগুলা লক্ষ্য কর'লেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পাশ্চাত্য দেশের ব্যাঙ্ক, বীমা-ভবন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ-বিভাগের কর্ম্মপদ্ধতি দেখলেই এটা সহজে উপলব্ধি করতে পারা যায়। অতি সাধারণভাবে সিগারেট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি তারা লিপিবদ্ধ ক'রে যাচ্ছে। সেইগুলাই আবার কাগজে পত্রে বেরোয়।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই স্কুলমাষ্টার জনকতক নিয়োজিত আছে, ধনবিজ্ঞান বিষয়ক খবরাখবর সঞ্চয় করবার জন্যে। তারা খবরের কাগজের কাটিং দিনের পর দিন জড় ক'রে 'কাটিং'এর লাইব্রেরী অনেক সময়ে খাড়া ক'রে তোলে। 'কাটিং'গুলার সারমর্ম্ম আবার প্রবন্ধাকারে বা পুস্তকাকারে বাহির হয়।

ইয়োরোপের নানা প্রদেশে এইভাবে গবেষণা চালানো হয়। বিলাতের

আর জার্ম্মাণির মজুরদলের কর্ম্মকেন্দ্রে এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ হামেশা চলেছে।

বার্লিনের আর ভিয়েনার 'ক্রাইসিস্ ইন্‌ষ্টিটিউট' ত আছেই। ইতালিতেও মুসলিনি মোটা টাকা ঢেলে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন।

তারপর, ব্যাঙ্কের কেরাণীরাও পৃথিবীর কোথায় উৎপাদন,—কৃষি-সংক্রান্ত, শিল্প-সংক্রান্ত, বা অন্য কোন বস্তু-বিষয়ক, কিরূপ কোথায় বাড়তি, কোথায় কম্‌তি ইত্যাদির এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য খবরাখবর সঞ্চয় করে। সেইগুলা যখন আবার কাগজে বেরোয় আমরা অবাক হ'য়ে যাই—ভয়ানক মিষ্টিরিয়াস্ ব'লে বোধ হয়। আসল কথা,—রোজ রোজ মামুলি সংবাদ সংগ্রহ কর্‌তে কর্‌তে লোকেরা আর্থিক জীবনের উঠানামা আঁকবার বিদ্যায় পেকে উঠে।

আর একটা বৃহৎ পরিষদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—আন্তর্জ্জাতিক মজুর পরিষৎ। সমস্ত দুনিয়ার খবর এখানে সংগৃহীত হয়, মজুর থেকে পুঁজিপতির খবর পর্য্যন্ত। আর একটা পরিষৎ—লীগ অব নেশ্যন্‌সের আফিস। প্রত্যেক দেশের লোক এখানে পাওয়া যাবে ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্ম্মাণ ইত্যাদি এবং ওখানকার অনেকেই তিন চারটা ভাষা জানে। এই দুইটা পরিষৎ গবেষণার বাথান বিশেষ। দুঃখের বিষয় ভারতবাসীরা যে কয়জন এখানে স্থান পেয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রায় কেরাণী-স্থানীয়। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে মাথা খাটিয়ে কাজ করার দায়িত্ব তারা পায় না।

যে-সব ঘটনাবলী এইভাবে ইয়োরোপের পরিষদে পরিষদে সংগৃহীত হচ্ছে, সেইগুলাই আবার 'ব্লু-বুক্' হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌ছে। গবেষণার কোনো ধাপেই রহস্যময় অতি-কিছু নাই। সকলেই কাজ ক'রে চলেছে হাতে তুড়ি দিতে দিতে।

গবেষণা বস্তুটা হাতী ঘোড়া নয়। বাঙ্গালীর ধনবিজ্ঞান-গবেষণাও ঠিক এইরূপ মামুলি জিনিষে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, যদি বাংলা ভাষার সাহায্যে তথ্য-সংগ্রহ, অঙ্ক-সংগ্রহ, তথ্য-বিশ্লেষণ আর অঙ্ক-বিশ্লেষণ চালাবার ব্যবস্থা করা যায়। "আর্থিক উন্নতি"র মতন দশ বারখানা ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রচারিত হ'তে থাক্‌লেই বাংলা দেশে গবেষণা জুজুর ভয় আর থাকবে না। বিদেশী অর্থশাস্ত্রীদের সঙ্গে টক্কর দিবার কাজে বাঙ্গালী ধনবিজ্ঞানসেবী মাত্রেই সাহসী হ'তে পার্‌বে।

আমি বলছি না ইংরেজীকে বয়কট বা বর্জ্জন করতে। বস্তুতঃ, আমি শুধু ইংরেজী কেন, অন্যান্য ভাষা শিক্ষায়ও উৎসাহ দিয়ে থাকি। তবে মার্কিণ যেমন তাদের দেশীয় ভাষায় নিজেদের শিক্ষাকার্য্য চালায়, জাপানীরা যে রকম নিজের দেশে নিজের ভাষা দ্বারা শিক্ষা প্রচার করে, বাঙ্গালী আমরা সেইরূপ বাংলা ভাষাকেই শিক্ষাদীক্ষার একমাত্র বাহন মনে করবো। আমাদের দাবী এই যে আগামী ৫, ৭, ১০ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রত্যেক বিষয়কেই ইংরেজী ভাষার দাসত্ব হ'তে মুক্তি দিতে হবে। ধনবিজ্ঞানের উচ্চতম আলোচনায় ও পঠনপাঠন-গবেষণার সকল স্তরেই চাই বাংলা, চাই একমাত্র বাংলা।

এই গেল ধনবিজ্ঞান-গবেষণায় যুবক বাংলার পক্ষে চরম লক্ষ্য ও আদর্শের কথা। এইবার কয়েকটা গবেষণার ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলব। নিম্নলিখিত দুই তিনটা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে পারলে আমাদের একটা বড় অভাব পূর্ণ হয়। আগামী তিন চার বৎসরের ভিতর এই সকল আলোচনাই আমার কার্য্য-তালিকায় প্রধান ঠাঁই দখল কর্‌বে।

প্রথমতঃ ১৯০৫ সন হ'তে আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখকেরা বাংলায় ও ইংরেজীতে ধনবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাহা কিছু চিন্তা করেছেন তাহার একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক। তাহার নাম হ'তে

পারে "যুবক বাংলার অর্থনৈতিক চিন্তা।" ১৯৩০-৩১ সনে মিউনিকে অধ্যাপনার সময়ে এই বিষয়টার দিকেই বিস্তৃততররূপে দেশবাসীর নজর টেনে আনতে চেষ্টা করেছি।

"হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স-হ্বিস্‌সেনশাফ্‌ট্‌লিখার গেডাঙ্কেনগাঙ ডেসইণ্ডাস্‌ জাইট ১৯০৫" (ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তা—১৯০৫ সনের পরবর্ত্তীকাল) নামে জার্ম্মাণ ভাষায় একটা বই লিখবার মতলব ছিল। তাই এক্ষণে বাংলা ভাষায়—একমাত্র বাঙ্গালীর চিন্তা-বিষয়ক রচনার আকার গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়তঃ মাথাপিছু বাঙ্গালীর আয় কত এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে চাই। এজন্য দরকার হবে জেলায় জেলায় খুঁটে খুঁটে তথ্য সংগ্রহ করা। মেহনৎ লাগবে খুব। অনেক গবেষকের সমবেত কাজ আবশ্যক হবে।

তৃতীয়তঃ, দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান সাহিত্যের যে সকল ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান ও অন্যান্য জাতীয় বই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহার ভিতর গ্রন্থকারদের মৌলিক (বা স্বকীয়) কতখানি আর ধার করা (বা পরকীয়) ই বা কতখানি তা জরীপ করে' বাংলা ভাষায় একখানা বই প্রকাশ করা আবশ্যক। এই দিকেও দেশের লোককে মাথা খেলাবার জন্য ডাকছি। এই ধরণের বই বেরিয়ে গেলে বাঙ্গালী লেখক, পাঠক আর মাষ্টার মশায়রা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বিদেশী গ্রন্থকারদের মতন বাংলাভাষায় গ্রন্থকার গড়ে' তোলবার জন্য বাংলা দেশকে বিশ পঁচিশ বৎসর বসে' থাকতে হবে না। বাঙ্গালী জাতি আজই ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সমর্থ।

৬। "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ

"আত্মায়ত্তৌ বৃদ্ধি-বিনাশৌ"

(নিজের উপরই নির্ভর করে বৃদ্ধি ও বিনাশ)

চাণক্যসূত্র।

"কত ফিরিলাম—

কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্ব ছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর
প্রতি কণ জড় জীবে রন্ধ্র এক করি,
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়বাহু ওই জেলে ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু তলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলাশস্ত ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।"

—সতীশচন্দ্র রায়।

পরিষদের উদ্দেশ্য

ক। সমাজতত্ত্ব, শাসনব্যবস্থা ও আইন-কানুন সম্বন্ধে লেখাপড়া ও অনুসন্ধান চালানো।

খ। এই সকল লেখাপড়া ও অনুসন্ধান চালাইবার জন্য বাংলাভাষাকে মুখ্য বাহনরূপে ব্যবহার করা।

গ। (১) বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে লেখাপড়া ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিবেচনা করা।

(২) বর্ত্তমান জগতের নানাবিধ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন এবং বিশ্বশক্তির সঙ্গে বাঙ্‌লার নরনারীর যোগাযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো।

ঘ। গবেষক বাহাল করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে এই সকল বিদ্যার রাজ্যে বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালী চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা করা।

পরিষদের আলোচনা প্রণালী

লেখাপড়া ও অনুসন্ধান চালাইবার জন্য আবশ্যক বিবেচিত হইবে :—

ক। পর্য্যটন,—এবং বস্তু, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মীয়তা স্থাপন ;

খ। নানাপ্রকার দেশী-বিদেশী নরনারীর সঙ্গে মোলাকাৎ, কথোপকথন ও তর্ক-প্রশ্ন ;

গ। ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ (অঙ্ক-তালিকা-বিজ্ঞান), নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, অপরাধ-বিজ্ঞান (ক্রিমিনলজি), অনুশাসন-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, অন্তর্জ্জাতিক বিধি-ব্যবস্থা, চল্‌তি ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যাবিষয়ক ভারতীয় ও অ-ভারতীয় পত্রিকা পাঠ ;

ঘ। বিভিন্ন আধুনিক ভাষায় জ্ঞান লাভ, যথা :— (১) হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাতী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ; ২) চীনা, জাপানী, ফার্শী, আরবী ইত্যাদি ; (৩) ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ, স্পেনিশ ইত্যাদি।

পরিষদের কার্য্য-তালিকা

ক। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ভগ্নী-প্রতিষ্ঠান হিসাবে "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের অনুসন্ধান-গবেষণা চলিবে। দুয়ের আলোচনা প্রণালী একইরূপ,—কেবল আলোচ্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে দুই পরিষদে প্রভেদ থাকিবে। বস্তুতঃ একের আলোচ্য ক্ষেত্র বিষয়ক অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিতে পারিবে।

খ। কোনো প্রকার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক বা অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে এই পরিষদের কিছুমাত্র সংশ্রব থাকিবে না। বিশেষ কোনো নির্দ্দিষ্ট মত অথবা কর্ম্মকৌশল প্রচার করা এই পরিষদের মতলব নয়।

গ। সকল প্রকার আন্তর্জ্জাতিক বিদ্যাবিষয়ক এবং নৃতত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব, আইনতত্ত্ব, অপরাধ-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজ-বিদ্যা-বিষয়ক দেশ-বিদেশের পণ্ডিত-পরিষৎ, সেমিনার, কংগ্রেস, বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিনিময় কায়েম করা এই পরিষদের কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত থাকিবে।

ঘ। "বিশ্বশক্তি" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন।

পরিষদের উৎপত্তি

ক। ১৯১০ সনে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বর্ত্তমান লেখক "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে উহা লংম্যান্স গ্রীণ অ্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক "দি সায়েন্স অব হিষ্টরি অ্যাণ্ড দি হোপ অব ম্যান-কাইণ্ড" নামে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় (১৯১২)। এই রচনায় বিশ্বশক্তির চর্চ্চা আছে।

খ। ১৯১৪ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সেই প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা "বিশ্বশক্তি" নামক বইয়ের আকারে বাহির হয় (১৯১৪)।

গ। পরবর্তীকালে বিশ্বশক্তিবিষয়ক নানা কথা তাঁহার বারখণ্ডে সম্পূর্ণ "বর্তমান জগৎ' গ্রন্থাবলীর ভিতর (৪০০০ পৃষ্ঠা) এবং "দি ফিউচারিজম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা, ৪১০ পৃষ্ঠা, লাইপৎসিগ ১৯২২) ও অন্যান্য ইংরেজী গ্রন্থে ঠাঁই পাইয়াছে। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত "দুনিয়ার আবহাওয়া" আর "গ্রীটিংস টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের প্রতি সম্ভাষণ) গ্রন্থ দুইটায়ও তাহার আলোচনা বিস্তর আছে।

ঘ। ১৯২৭ সনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যৌবন সম্মেলনের অধিবেশনে (মাজু, হাওড়া) তিনি সভাপতিরূপে "যুবক বাঙ্লার কর্মক্ষেত্র" নামক প্রবন্ধ * পাঠ করেন। তাহাতে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে "আন্তর্জাতিক ভারত" পরিষৎ কায়েম করিবার কথা ছিল।

ঙ। ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র সাংবাদিকের সঙ্গে মোলাকাতে বর্তমান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প উল্লেখ করেন।

চ। সেই সঙ্কল্প ১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে (৯ এপ্রিল ১৯২৩) "আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ নামে মূর্ত্তি গ্রহণ করিল।

পরিষদের গবেষক

ক। প্রত্যেক গবেষককেই একসঙ্গে (১) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ আর (২) মানবজীবন বিষয়ক বিদ্যার নানা শাখা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইতে হইবে।

---

* বর্ত্তমান খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধ।

খ। গবেষকগণকে কোনো দু একটা বিজ্ঞান-শাখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ-রূপে গড়িয়া তোলা পরিষদের লক্ষ্য নয়। *

গ। তবে পরিষদের জন্মকালে কয়েকটা বিজ্ঞানশাখা নিম্নলিখিত গবেষকগণের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল :—

১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ (নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো, আমেরিকা), সামাজিক অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য ও অঙ্ক।

২। শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন।

৩। শ্রীহরিদাস পালিত, "আদ্যের গম্ভীরা" নামক বাঙ্লার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ-প্রণেতা, আর্থিক নৃতত্ত্ব।

৪। শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ, মজুরির অর্থকথা।

৫। শ্রীপ্রমোদকুমার রায়, বি, এল, অপরাধ-বিজ্ঞান।

৬। শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, এম, এস-সি, বি, এল, জাতি ও শ্রেণী।

পরিষদের সম্পাদক

১। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী

২। শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ

বর্ত্তমান লেখক।

পরিষদের ঠিকানা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

আর্থিক জীবনে পরের ধাপ *

আমি এঞ্জিনিয়ার নই, রাসায়নিক নই। রেল চালানো আমার ব্যবসা নয়, লাঙ্গল চালাইতে আমি জানি না। কারবার গড়িয়া তোলায় আমার অভিজ্ঞত নাই। বিদেশী মাল দেশে আনিয়া বেচা আর দেশী মাল বিদেশে পাঠানো আমার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। ব্যবসা যদি থাকে, তবে কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি, বই মুখস্থ করা ইত্যাদি। ব্যস্। কাজেই আমার মতন লোকের কাছে ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের সভ্যেরা কিছু কাজের কথা আশা যদি করেন তার জন্য তাঁরাই দায়ী। আমার তাতে কোন দোষ নাই। আমি বেশ জানি যে, আমার মতন লোকের পক্ষে এই বণিক-সঙ্ঘে আসিয়া আর্থিক জীবন সম্বন্ধে দু'চারটা কথা বলা ঠিক তেমনি যেমন আজকে যদি কেহ আসামে বা জলপাইগুড়িতে চা লইয়া ব্যবসা করিতে যায়। আমি যদি ইংরেজ হইতাম তা' হইলে বলিতাম নিউ কাস্‌ল মুল্লুকে কয়লা লইয়া যাওয়া যা, বণিক-সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে একটা "পড়ুয়া" লোকের ব্যবসা সম্বন্ধে কথা বলাও তাই।

আর একটা দুর্ব্বলতা কিছু গুরুতর রকমের। বণিক-সঙ্ঘের কেহ হাজার-পতি, কেহ দশহাজার-পতি, কেহ পঞ্চাশহাজার-পতি, কেহ লক্ষ-পতি, কেহ কোটিপতি। টাকা ঢালাঢালি করা, টাকা চালাচালি করা হইতেছে তাঁদের কাজ। আর আমার যে নসিব তাতে টাকার মুখ না দেখিতে পাওয়াই হইতেছে এক প্রকার স্বধর্ম্ম। আমরা হইতেছি

---

* বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স ভবনে প্রদত্ত বক্তৃতার শর্টহাণ্ড বৃত্তান্ত। ৮।৩।২৭)। শর্টহাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

বেকার-দলের লোক, আমরা চাকরি-গত প্রাণ। চাকুরী জোটে না, যদি বা জোটে তাতে পেট ভরে না। এই অবস্থায় টাকাওয়ালা লোকের কাছে আসিয়া কেমন করিয়া অর্থলাভ হইবে আমার মতন লোকের পক্ষে তার আলোচনা করা নেহাৎ ধৃষ্টতা। ধৃষ্টতা যদিও বটে তবু এসব বিষয়ে আলোচনা না করিয়া আমাদের উদ্ধার নাই। কেননা, টাকাওয়ালা আপনারা নতুন নতুন পথে টাকা খাটাইতে যদি না ঝুঁকেন তাহা হইলে বেকারের দল বাঁচিতে পারে না। কাজেই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা আমাদের চরম স্বার্থ।

দেশোন্নতির সীমানা

আর্থিক জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া বছর বিশেক আগে ১৯০৫।৬।৭ সনে আমরা যে ধরণের কথা বলিতাম, অন্ততঃ আমি যে ধরণের কথা বলিয়াছি,—সে কথা আজ আর বলিতে পারি না। তখনকার সুর ছিল—"দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমার নিজের আশার কোনো সীমা নাই, সাহসের কোন ভয় নাই।" আজ বলিতে বাধ্য হইতেছি,—দেশের সাধারণ উন্নতি কতটা সম্ভব কিংবা দেশ আর্থিক হিসাবে কত বড় হইবে সেই সম্বন্ধে আমার চোখের সামনে কতকগুলা সীমানা দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমানে আমার আশার সীমা আছে। জোর জবরদস্তি করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও সে সীমানার বাহিরে দেশকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিব না।

প্রথম কথা—আর্থিক হিসাবে দেশকে যত বড় করিয়াই তুলি না কেন, ১০।১২।১৫।২০।৩০ বৎসরের ভিতর ম্যাঞ্চেষ্টার বা লীড্‌সের বড় বড় ফ্যাক্টরী-কেন্দ্রকে কোন মতেই ধ্বসাইতে পারিব না। ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা বাঙালী বা ভারতবাসী যত বড় হই না কেন, লয়েড্‌স ব্যাঙ্ককে

কোন দিনই পটল তোলাইতে পারিব না। এই যে বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী আছে তাদের জাহাজে জাহাজে তালা লাগাইতে পারিব না। এই সঙ্গে আর একটী কথা বলিতে চাই। ইংরেজের সম্পদ্ আজ যা আছে তা বোধ হয় থাকিবে। তা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা চোখের সামনে দেখা যাইতেছে না। বরং ভবিষ্যতে আরো বাড়িবে বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ ধারণা। আমাদের ভারতের উন্নতি যাকিছু হইতে থাকিবে তা ইংরেজের স্বার্থপুষ্টির বিরোধী কিনা সন্দেহ। ইংরেজদের লাভালাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-সন্তানের লাভালাভ সুজড়িত। এইরূপই আমি বুঝিতে পাইতেছি।

দেশোন্নতির আর একটা সীমানার কথা বলা আবশ্যক। আজকালকার দুনিয়ায় আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এই চার দেশ যা কিছু করিয়াছে, আথিক হিসাবে, এঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে, রাসায়নিক কারখানা হিসাবে, ব্যাঙ্ক হিসাবে যা কিছু খাড়া করিয়াছে, তার কাছাকাছি যাওয়া আমাদের যুবক বাংলা বা যুবক ভারতের পক্ষে অনেকদিন পর্য্যন্ত অসম্ভব। এরা দুনিয়া চালাইতেছে। আমরা দূরে থাকিয়া দুনিয়া কি ভাবে চলিতেছে দেখিতে পারি, মাথা যদি থাকে হয়ত কিছু বুঝিলেও বঝিতে পারি। কিন্তু ওদের কাছাকাছি যাওয়া আগামী বিশ ত্রিশ বৎসরের ভিতর কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এই সব কথা হয়ত অনেকের ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু দেশোন্নতির একটা সীমানা স্বীকার করা আমার স্বদেশসেবার গোড়ার কথা। এই সব জাতি আজ সমাজের সু-কু, রাষ্ট্রের ভালমন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আদর্শ বা কার্য্য-প্রণালী প্রচার করিয়া থাকে, যে ধাপে দাঁড়াইয়া তারা ফ্যাক্টরির মোসাবিদা করে, ব্যাঙ্কের সংগঠন করে আর আর্থিক জীবনের সংস্কার কায়েম করে, সে ধাপ বুঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা সে ধাপের

অনেক নীচে রহিয়াছি। যেসব ধাপে আমরা রহিয়াছি সেই সব ধাপ ইংরেজ ফরাসী জার্মাণ আমেরিকান জাতিসমূহ ষাট-সত্তর বৎসর আগে পার হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আজ আমরা ভারতে যে ধাপে রহিয়াছি সেই ধাপ দুনিয়ার ১৮৪৮।১৮৭০ সনের কাছাকাছি। এই তুলনা বা অনুপাতটা যদি বুঝি তা হইলে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া আমাদের দেশকে কৃষি-শিল্পের কোন্ পথে, এঞ্জিনিয়ারিংএর কোন্ লাইনে, ব্যবসার কোন্ ঘাঁটিতে চালাইতে হইবে কিছু কিছু বুঝিতে পারিব।

স্বদেশী আন্দোলন ও মহালড়াই

একটা কথা বারবার মনে হইবে। আমরা এখন রহিয়াছি কোন্ ধাপে? আমরা আর্থিক জীবনের ঠিক কোন্ অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছি? চোখের সামনে যা দেখিতে পাওয়া যায় তা আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বিগত বিশ বৎসরের ভিতর সব চেয়ে বড় বড় দু'টা শক্তি বাঙলায় ও ভারতে কাজ করিয়াছে। (১) স্বদেশী আন্দোলন। আজ এখানে যাঁরা বসিয়া আছেন কিংবা আজ যাঁরা বড়লোক হইয়াছেন, তাঁদের অনেকে কোন না কোন রকমে স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অথবা যাঁরা পুষ্ট করিয়া তোলেন নাই তাঁরা এই স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভাসিয়া নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কৃতিত্ব-প্রভাব আজকে যুবক বাংলার ও যুবক ভারতের আর্থিক জীবনে খুব বেশী। (২) স্বদেশী আন্দোলনের মত আর একটা বড় শক্তি কাজ করিয়াছে। সেটা হইতেছে মহালড়াই (১৯১৪-১৮)। কুরুক্ষেত্রের এই চার পাঁচ বৎসরের ভিতর আমাদের দেশের যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক - কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ রসায়নবিদ্, কেহ ব্যাঙ্কার, কেহ ব্যবসাদার—তাঁরা এক একটা "দাঁও" মারিয়াছেন। সেই

সুযোগে আমরা অনেক জিনিষ কিছু না কিছু করিয়া তুলিয়াছি। ১৯২৭ সনে এই দুই শক্তিকে বাদ দিলে আমরা কিছু বুঝিতে পারিব না।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। স্বদেশী আন্দোলন হউক কি মহালড়াই হউক,—দুই ধাক্কাতেই আমরা কৃষি শিল্প বাণিজ্যে যা কিছু করিতে পারিয়াছি তার সঙ্গে ইংরেজ এবং বাঙালী (ও ভারতবাসী) উভয়ে জড়িত আছে। অর্থাৎ ইংরেজকে বয়কট করিয়া আমরা বড় হইতে পারি নাই। আমাদের আর্থিক জীবনের ধারা ইংরেজ-বাঙালীর, ইংরেজ-ভারতবাসীর মেলমেশে পরিপুষ্ট। যতই বয়কট করিতে চেষ্টা করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতেছে এই ঃ— আজ ১৯২৭ সনে যে কয়জন করিৎকর্ম্মা ভারতবাসী দু'পয়সা করিয়া খাইতেছে তাদের কর্ম্মদক্ষতা, কৃতিত্ব, পটুত্ব, সব জিনিষ ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-সম্পদ্ ব্যাঙ্কের প্রসারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ নাই এমন এক ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি ; প্রেসিডেন্সি কলেজ সরকার-প্রতিষ্ঠিত কলেজ। এই জিনিষটার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ইত্যাদি বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সকল কলেজের প্রভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজটার বেঞ্চগুলা খালি হইয়া গিয়াছে কি? হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কলেজ,—যাকে আপনারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজ বলিয়া থাকেন—চলিয়াছে। ঠিক সেইরূপই আমি বলিতেছি যে, স্বদেশী আন্দোলন অথবা মহালড়াইয়ের হিড়িকে যে কয়জন করিৎকর্ম্মা লোক আমাদের দেশে খাড়া হইয়াছে আর নতুন নতুন উপায়ে সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে তারা অনেকেই লয়েডস্ ব্যাঙ্ক বা নর্থ-বৃটিশ ইন্‌শিওর্যান্স কোম্পানী বা অন্যান্য বিদেশী কারবারের ছায়ায় আস্তে আস্তে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই হইতেছে প্রথম স্বীকার্য্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি

আজকাল পৃথিবীতে কোন্ শক্তির কাজ চলিতেছে বেশী? আর্থিক হিসাবে কোন্ শক্তি দুনিয়াকে প্রভাবান্বিত করিতেছে? প্রতিদিন একটা স্বদেশী আন্দোলন আসে না। প্রতিদিন দুনিয়ায় মহালড়াই উপস্থিত হয় না। তীর্থের কাকের মত কেহ বসিয়া থাকে না কবে স্বদেশী আন্দোলন আসিবে, কবে মহা লড়াই আসিবে, আর সেই সুযোগে তারা কিছু করিবে। এই রকম একটা একটা মহা-হুজুগের আশায় কেহ জীবন নষ্ট করে না। প্রতিদিন আটপৌরে কর্ত্তব্য করিয়া সকলে চলে। ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ, জার্ম্মাণ, জাপানী চেষ্টা করিতেছে যে,—লড়াই আসুক বা না আসুক, বড় গোছের একটি আন্দোলন আসুক বা না আসুক, প্রতিদিন এমন ভাবে চলিবে যেন যখন যা দরকার পড়ে তার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। ইংরেজ, জাপানী, জার্ম্মাণ, ফরাসী নিজেকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য কত রকমে চেষ্টা করিতেছে সে সব কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। একটী কথা মাত্র বলিতে চাই। কতকগুলা জিনিষ আজকার পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক শক্তি। তার সঙ্গে ভারতবাসীর যোগাযোগ আছে নিবিড় যদিও সে সব শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ কিছু বলিব না। কিন্তু "বৃটিশ এম্পায়ার ডেভেলপমেণ্ট" বা বৃটিশ সাম্রাজ্যপুষ্টি নামে একটা আন্দোলন চলিতেছে। সে জবর শক্তি। গোটা পৃথিবীতে তার প্রভাব রহিয়াছে। ফ্রান্স-জার্ম্মাণি-জাপান-আমেরিকায় কি ভাবে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করিতেছে সেটা দেখাইতে চাই না। এই শক্তিটা ভারতবাসীর উপর যে প্রভাব আনিয়া ফেলিয়াছে সেইটা দেখাইতে চাই। স্বদেশী আন্দোলনে যেমন শক্তি ছিল, লড়াইয়ে যেমন শক্তি ছিল, তেমনি, স্বদেশী আন্দোলন ও লড়াইয়ের উন্মাদনা না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টি নামক আন্দোলন

ভারতের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতে আমাদের আর্থিক জীবন কি রকম ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে অতি সামান্য ভাবে তার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া যাইতেছি।

ইংরেজ বুঝিয়াছে যে ভারতবর্ষকে আর্থিক হিসাবে কিছু মজবুত করিয়া না তুলিলে তারা আর বাঁচিতে পারিবে না। অর্থাৎ ভারতবাসীকে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে, যন্ত্রবীর হিসাবে, চাষী হিসাবে ওস্তাদ না করিয়া তুলিলে, ব্যাঙ্ক পরিচালন হিসাবে তাহাদিগকে খানিকটা প্রশ্রয় না দিলে, জাপানের বিরুদ্ধে, রুশিয়ার বিরুদ্ধে, তুর্কীর বিরুদ্ধে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের প্রয়োজন হইবে তখন ইংরেজ ফেল মারিতে বাধ্য। এই প্রথম কথা। কথাটা প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক, আন্তর্জাতিক, সামরিক। কিন্তু আমি ওদিক থেকে কিছু বলিতে চাই না। ঘোড়াকে দিয়া যদি গাড়ী টানাইতে হয় তা হইলে তার খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক। ঘোড়াকে মারিয়া ফেলা কোনো ঘোড়াওয়ালার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তেমনি ভারতের পল্লী ও শহরগুলি যদি মজবুত হইয়া না উঠে তাহইলে যথার্থ কাজের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু হইয়া যাইবে। আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা ইংরেজ জাতির এই স্বার্থের ভিতর ভারতবাসীর স্বার্থও প্রচুর। ভারতের মধ্যে যদি কোন হুসিয়ার লোক থাকে সে লোক এই শক্তিটাকে নিজ কাজে লাগাইতে পারিবে। আমাদের যাঁরা এঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার, চাষ-ব্যবসায়ী, জমিদার, তাঁরা এই সুযোগে নতুন কিছু দাড় করাইবার সুবিধা পাইতে পারেন। এই শক্তি সম্বন্ধে যদিও আমরা সজাগ নই তবু আমার বিবেচনায় এটা একটা বিপুল শক্তি।

ভারতীয় ও বৃটিশ শুল্ক-নীতি

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'কি কি লক্ষণ দেখিতেছ যাতে আমরা ভাবিতে পারি যে, বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষকে পোক্ত করিয়া তোলা ইংরেজরা নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে?' গোটা কয়েক তথ্যের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ শুল্ক-নীতি—(১) ভারতবর্ষের শুল্ক-নীতি, (২) ইংরেজের শুল্ক-নীতি। ভারতবর্ষের শুল্ক-নীতিতে দেখিতে পাই "সংরক্ষণ শুল্ক" নামক বস্তু একরকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। আমাদের দেশে ছাপাখানার কাগজ, বই লিখিবার কাগজ যে যে ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় তাকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক বসানো হইয়াছে পাউণ্ডে এক আনা। তারপর টিন প্লেটের কারবার বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক আছে। দিয়াশলাইয়ের শিল্পেও সংরক্ষণ বসিয়াছে। লোহা লক্কড়ের ব্যবসাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। যাতে এদেশে কতকগুলি কারবার দাঁড়ায় এবং তাতে কতকগুলি লোক, যেমন এঞ্জিনিয়ার, কেমিষ্ট ইত্যাদি পটুত্ব লাভ করে তা দেখা বৃটিশ সাম্রাজ্য-পুষ্টির একটা অঙ্গ। তা ছাড়া কোন কোন তাঁত শিল্প, বয়ন শিল্পের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্র আনিতে হয়, না আনিলে চলে না। সেই যন্ত্রপাতি যদি সস্তায় পাওয়া যায় তা হইলে আমাদের শিল্প-বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়। তাঁত শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য আগে যেখানে শতকরা ১৫ টাকা শুল্ক দিতে হইত এখন সেখানে ২॥০ টাকা দিতে হয়। এই শুল্ক-নীতি আমাদের দেশের কোন কোন কারবারকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে।

এইবার বৃটিশ শুল্কনীতির দিকে তাকানো যাক্। ইংরেজের মাথায় ঢুকিয়াছে তার স্বপক্ষে ভারতবাসীকে পক্ষপাতী করাইতে হইবে। ইংরেজ তার লোহালক্কড় সস্তায় বেচিবার জন্য আমাদের ভজাইতে চেষ্টা করিতেছে, একথা ঠিক। কিন্তু অপর দিকে, আমাদের কোন কোন জিনিষও

পক্ষপাতমূলক শুল্কনীতির দ্বারা নিজেদের ঘরে আমদানি করিতে ইংরেজরা চেষ্টিত। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতেও বিলাতে চা কফি যায়। কিন্তু তারা যে শুল্ক দেয় ভারতবর্ষের চা কফি দেয় তার ⅚ অংশ মাত্র। ভারতীয় কিসমিস, মনাক্কা বা অন্যান্য শুকনা ফল—এ সব জিনিযের সঙ্গে বিলাতে অন্যান্য দেশের মালকে যদি টক্কর দিতে হয় তা হইলে শুল্ক দিয়া ঢুকিতে হইবে। কিন্তু ইংরেজ বলিতেছে, "এই ধরণের মাল ভারতবর্ষ থেকে আসিলে আধ পয়সাও শুল্ক লইব না।" তারপর রেশমের জিনিয ধরুন। চীন-জাপানের মাল যদি বিলাতে যায় পুরো শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের রেশম গেলে তিন-চতুর্থাংশ শুল্ক দিতে হয় মাত্র। ফিতা, তামাক, সিগার ইত্যাদি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ বিলাতের পক্ষপাত ভোগ করে। এই শুল্কনীতি হইতে বুঝা যায়, কতটা কোন্ দিকে সাম্রাজ্য-পুষ্টির কাজ চলিতেছে। এই হিসাবের ভিতর ভারতবষের লাভের কথা একদম ফেলিয়া দিলে চলিবে না। অবশ্য আমি বলিতেছি না যে, এতে আমরা স্বর্গে উঠিয়াছি। শুধু বলিতে চাই যে বৃটিশ সাম্রাজ্য বুঝিয়াছে যে ভারতবর্ষকে একটা কর্ম্মক্ষম অঙ্গ করিয়া তোলা আবশ্যক। সেই জন্য ভারতবর্ষকে অল্প বিস্তর সুযোগ সুবিধা, "পক্ষপাত" ইত্যাদি বিতরণ করা দরকার। একথা যদি বুঝি তা হইলে আমাদের ভিতর যাঁরা করিৎকর্ম্মা লোক, জোয়ান লোক, তাঁরা এই শক্তিকে নতুন শক্তি বিবেচনা করিয়া আজকালকার সংসারে উল্লেখযোগ্য অনেক কিছু করিতে পারেন।

যাঁরা হাজারপতি, দশহাজারপতি, লক্ষপতি, কোটিপতি তাঁরা ভাবিয়া দেখুন, বাস্তবিক এ সব সুযোগের কোন্ দিকে কাজ করিলে নিজেরা লাভবান হইতে পারিবেন। টাকাওয়ালা লোকেরা যদি লাভবান হয় তা হইলে বেকারের অন্ন জুটিবে। আগেই বলিয়াছি টাকাওয়ালা লোকের টাকা জোটানো আমাদের স্বার্থ।

চাই বিদেশে বাঙালী আড়ৎ

এইবার কয়েকটা টাকা খাটাইবার পথের কথা বলিব। প্রথমতঃ বহির্ব্বাণিজ্যের কথা, মাল আমদানি রপ্তানি করার কথা। তিন হাজার রকমের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে লম্বা চওড়া অনেক বক্তৃতা চলিতে পারে। সে সব কথা না বলিয়া বহির্ব্বাণিজ্যের একটা সামান্য অঙ্গের কথা বলিতেছি। সেটা হইতেছে এই যে, বিদেশে আড়ৎ কায়েম করা লাভবান হওয়ার একটা বড় উপায়। কি রকম? ধরুন আমেরিকার সওদাগরেরা আমাদের দেশে মাল বেচে। তারা বলিতে পারে বাঙালী ব্যবসাদার রহিয়াছে, চিঠি লিখিলে মাল পাঠাইলেই হইবে। এই বলিয়া তারা নিজ মুল্লুকে বসিয়া রহিয়াছে কি? তারপর ভারতে আমেরিকার কনসাল রহিয়াছে। তার কাজ হইতেছে ভারতবর্ষের ভিতর কতগুলি দোকান, বাজার ও কোম্পানী আছে কত রকমের আর্থিক আইন হইল, সে সব কথা তার নিজের দেশকে জানানো। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কোন্ জিনিষ এখানকার বাজারে চলিতে পারে, এখানকার লোকেরা কোন্ কোন্ জিনিষ পছন্দ করে ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ দেশে পাঠানো কনসালের কাজ। কিন্তু কনসাল ত দুচারজন মাত্র। আমেরিকা দশকোটি নরনারীর দেশ। সকলে এই কয়জন কনসালের উপর নির্ভর করিতে পারে না। তাই মার্কিণ সওদাগরেরা এখানে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায়। দুই রকমের প্রতিনিধি। কেহ এদেশে আসিয়া দোকান করিয়া বসে। আর যারা দোকান করিয়া বসে না, তাদের প্রতিনিধিরা শীতকালের দু'তিন মাসে গোটা ভারত ঘুরিয়া ঘুরিয়া খবর সংগ্রহ করে, অর্ডার পর্য্যন্ত লইয়া যায়।

এইবার জাপান দেখুন। জাপানীদের ধরণ ধারণও মার্কিণদেরই

মতন। এরা কলিকাতায় একটা প্রকাণ্ড দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। নাম "ইণ্ডো-জাপানীজ কমার্শ্যাল মিউজিয়াম"—ইন্দো-জাপানী প্রদর্শনী। এই এই জিনিষ এখানে আছে, অর্ডার দাও, দূরে যাইতে হইবে না। যে মাল জাপান বেচে সেটা বাড়ীতে আনিয়া দেখাইবে। ইংরেজের ত কথাই নাই। মুল্লুকই ত ওদের। জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইতালিয়ান ইত্যাদি জাতের ধরণ ধারণ কি? তা এই। যে দেশের সঙ্গে ব্যবসা করিবে সে দেশে গিয়া এরা সকলেই আড়ং গাড়িবে। তাতে নিজেদের ব্যবসা পাঁচসাত গুণ পর্য্যন্ত বড় করিয়া তোলে।

ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি?

জাপান, আমেরিকা জার্ম্মাণি ইত্যাদির সঙ্গে বাঙালীর যে যে কারবার চলিতেছে সেই সব কারবার যদি ভাল করিয়া চালাইতে চাহেন তা হইলে তার জন্য এক একটা আড্ডা বা দোকান বিভিন্ন বিদেশে হাজির করা চাই। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কোন্ কোন্ দেশে বাঙালীর আড়ং প্রতিষ্ঠা করা দরকার? বিলাতের কথা বলিতেছি না। ও ত হাতের পাঁচ। ওদেশে যাইতে ত হইবেই। দেখিতে হইবে আমাদের বাজার সব চেয়ে বড় কোন্ কোন্ জায়গায়। ভারতবর্ষ বিদেশে যত মাল বেচে তার $\frac{২০}{১০০}$ যায় বিলাতে। জাপানে যায় $\frac{৫}{১০০}$। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশী রাখা উচিত, কারণ তারা বড় খরিদ্দার। খরিদ্দার চটানো ব্যবসাদারের স্বার্থ নয়। আমেরিকায় যায় $\frac{১০·৪}{১০০}$। ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণিতে গিয়াছে $\frac{৭}{১০০}$ অংশ। আগামী বৎসর যাইবে হয়ত শতকরা ১০।১০॥০।১২। ফ্রান্সে $\frac{৫·৫}{১০০}$ আর ইতালিতে $\frac{৫}{১০০}$। শতকরা ৫ অংশের মানে এই, ২০ ক্রোর টাকার মাল ভারত ইতালিতে বেচে। এই পাঁচটী দেশে বাঙালী ব্যবসাদারদের দশবিশটা আড়ং চলিতে পারে যদি

বলি তা হইলে বেশী বলা হয় না। বিদেশে যারা এজেন্সী কায়েম করিয়াছে তারা প্রত্যেকে কোটিপতি নয়। খুব কম খরচে দুনিয়ায় কারবার চালাইতে পারা যায়। মাসিক হাজার টাকায়ও একটা আড়ৎ চলিতে পারে। হুসিয়ার লোকদের মনে রাখা উচিত যে, আড়ৎ কায়েম করা একটা বড় ব্যবসা।

যানবাহনের ব্যবসা

এখন অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। গোটা ভারতে কোটি কোটি টাকার মাল চলাচল করে। আমাদের মতন মামুলি লোকের বিবেচনায় লাখটাকা লাখটাকা দু'কুড়ি দশ টাকা। কাজেই মোটা মোটা টাকার তোড়ার কথা বলিতে চাই না। অন্তর্বাণিজ্যের এমন একটা দিকের নাম করিতে চাই যেটা সম্বন্ধে আমাদের ধনী লোকেরা সাধারণতঃ কখনও বেশী ভাবেন না, বা এত কম ভাবেন যে, তাকে ভাবনার মধ্যেই গণ্য করা চলে না। আমরা জানি যে, বরিশালের মাল কলিকাতায় আনিয়া বেচা হয়। আবার কলিকাতার বিদেশী মাল ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে যায়। এই কেনা-বেচাই কি বাণিজ্যের একমাত্র অঙ্গ? না। আর একটা অঙ্গ রহিয়াছে সেদিকে সাধারণতঃ আমাদের নজর পড়ে না। মালটা যায় কি করিয়া? যাতায়াতের পথ, গমনাগমনের সুযোগ, যানবাহন নামক বস্তু একটা বিপুল ব্যবসার সামগ্রী। তাতে কোটি কোটি টাকা খাটে, লাভও হয় তদ্রূপ। বিদেশীরা লাভ করে এই পথে বিস্তর। এই ব্যবসাটার সাদা ইংরেজি নাম ট্রান্সপোর্ট। মালপত্র চলাচলের সুবিধা যারা করে তারা বড় মোটা হারে লাভ করে। একথা বাঙ্গালীর মগজে বসা আবশ্যক। সহজেই প্রশ্ন উঠিবে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান মাঝিমাল্লা এরাই আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিতেছে। এতে টাকাই বা কোথায় আর লাভই বা কোথায়?

ছোট রেল

প্রথম নম্বর বলি স্থলপথের কথা। রেলের নাম শুনিয়া অনেকে আঁৎকিয়া উঠিবেন। ই, বি, আর. বি, এন আর এসব বাঙ্গালীর ক্ষমতায় কুলাইবে না। রেল মস্ত কাণ্ড। আমি কিন্তু অতি-কিছু— কোটি কোটি টাকার কথা বলিতে চাই না। বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন লোকে মনে করিত রেলে চড়িলে জাত যাইবে, ধর্ম্ম যাইবে। এখন এইটুকু হইয়াছে যে, রেলে গেলে জাত যায় না, লোকে চড়িতে চায়। অতএব ব্যবসাদার হিসাবে সকলেই বুঝিতে পারে যে, রেল যদি সৃষ্টি করা যায় তা হইলে লাভ আছে। কিন্তু রেল করা সোজা কথা নয়। ভারত সরকার বৎসরে হাজার মাইল রেল করিতেছে। এখন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের যে বরাদ্দ রহিয়াছে তাতে দেখা যায় প্রতি বৎসর হাজার মাইল রেল হইবে। আজ ৩৮ হাজার মাইল রহিয়াছে। ছয় বৎসরে ৪৪ হাজার মাইল হইবে। এই যে বৎসরে হাজার মাইল হইতেছে বা হইবে, এর খরচপত্র লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। সে সব এলাহি কারখানা। আমি দেখিতে পাই বরিশালের লোক রেল চায়, খবরের কাগজ পড়িয়া বুঝিয়াছি রেল না হইলে তাদের অসুবিধা। গোয়ালন্দ জলপাইগুড়ির লোকেরা রেল হইবে হইবে শুনিয়া খুসী। আমার বক্তব্য এই যে, ছোট খাট রেল চালানো অতি-কিছু নয়। ওরা হাজার হাজার মাইল রেল করিয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে। আমাদের টাকা নাই. কিন্তু বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলাতে এমন সুযোগ রহিয়াছে যে অনেক জায়গায় ২০।২৫ মাইল ব্যাপী ছোট ছোট রেল চালানো যাইতে পারে। না হয়, কেরোসিন তেল দিয়াই চালানো যাইবে, তাতেও হাতে খড়ি হইতে পারে! ১৯০৫ সনে রেল

চালাইবার কথা শুনিলে বাঙালীরা ভয় পাইত। কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে ভয় হয়ত বেশী পায় না। বড় হাট কিংবা বড় জমীদারি কাছারী কিংবা বড় ষ্টেশন হইতে রেল চালানো যাইতে পারে। প্রত্যেক জিলাতে ১০।১৫।২০।২৫ মাইলের এইরূপ পথ ৫।৭।১০টা আছে। যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে অথবা পার্টনারশিপ হিসাবে কেহ যদি মফঃস্বলে কিছু টাকা ঢালিতে চান তা হইলে তাঁরা লাভবান হইবেন এবং আমাদের ন্যায় বেকার লোকেরও অন্ন জুটিবে। উপেনবাবু যশোহর-ঝিনাইদহ রেল চালাইতেছেন। তাঁর কাছে অনেক হদিশ পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স যে ধাপে দাঁড়াইয়া আছে, সে ধাপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। শিলিগুড়িতে দাঁড়াইয়া ২৯০০২ ফিট দেখিতে চেষ্টা করিলে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। ১৯১৭ সনের দুনিয়ায় এরোপ্লেনের যুগ আসিয়াছে। এখন যেন রেলের দরকার কিছু কমিয়া আসিতেছে। রেলে যাইবে মাল। লোক যাইবে বোধ হয় উড়িয়া।

ষ্টীম-নৌকা

এরোপ্লেনের যুগ হইলেও জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান কেহ পানিকে ভুলে নাই বরং দরিয়া আর খালের ইজ্জৎ বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সব উন্নত দেশের ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবসা খালে-দরিয়ায় বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল আগে বিলাতে কমিশন বসিয়াছিল,—খাল-ও-দরিয়া তদন্ত করিবার জন্য। এই কমিশনের ফর্দ্দ উঁচু দরের জিনিষ। এ বিষয়ে ফরাসীরাও বেশ আগুয়ান হইয়াছে। রোণ উপত্যকাকে খাল কাটিয়া কি করিতে হইবে তাতে তারা মাথা খাটাইতেছে। সকলকে হারাইয়াছে জার্ম্মাণি। রাইণ ইত্যাদি চার পাঁচটা নদী যা দক্ষিণ হইতে উত্তরের সাগরে গিয়া পড়িয়াছে, সেগুলাকে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে খালের

সাহায্যে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাতে পশ্চিম জার্ম্মাণি থেকে খালে খালে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব। জার্ম্মাণিতে রেলের অভাব নাই। তা সত্ত্বেও তারা খাল কাটিয়াছে, আরও কাটিতেছে। জার্ম্মাণিতে খাল প্রধানতঃ তিন কেন্দ্রের অন্তর্গত। একটা রাইণের দিক্‌কার, একটা হেবজারের দিক্‌কার আর একটা এলবের দিক্‌কার। আর এই তিনটাকে ডানিয়ুবের সঙ্গে জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তা হইলে বাল্‌টিক সাগরের নোনা পানিতে না গিয়াও আর ইংলণ্ডের উত্তর সাগরের জল না মাড়াইয়াও জার্ম্মাণি একেবারে রাইণ হইতে ব্ল্যাক-সীতে আসিয়া হাজির হইতে পারিবে। তার ফলে,—পরবর্ত্তী যে লড়াই আসিতেছে তাতে জার্ম্মাণিকে আটলান্টিকে আসিতে হইবে না। বলকান অঞ্চলটা হাতে রাখিয়া জার্ম্মাণি একদিকে রুশিয়ার আর অন্যদিকে তুর্কীর খাদ্যশস্য টানিয়া আনিতে পারিবে।

যাক্ এসব লম্বাচৌড়া কথা। কিন্তু এই যে আমাদের ছিপ, বজরা, পান্সী রহিয়াছে, এগুলিকে রাতারাতি ষ্টীম লঞ্চে পরিণত করিতে পারা যায়। জাপানে তাই হইয়াছে। জাপানের তোকিও থেকে পল্লীতে বেড়াইতে যাইবার সময় ঠিক মনে হইয়াছে যেন বিক্রমপুরের মামুলী 'গয়নার নাওয়ের সওয়ারি'! শুধু তার ভিতর রহিয়াছে একটা এঞ্জিন। অর্থাৎ মেঘনায় আমাদের যে সব নৌকা চলে তার ভিতর একটা কেরোসিনের বা রেড়ীর তেলের এঞ্জিন যেই বসাইবেন অমনি আপনাদের লাভের পথও হইবে, মাল চলাচলের সুবিধাও হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের কর্ম্মক্ষেত্রও সৃষ্ট হইবে। আজ বাঙ্‌লাদেশের অন্ততঃ দশ হাজার লোক এই ভাবে অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহায়তা করিতে পারে। যানবাহনের ব্যবসায় প্রত্যেকেই কিছু কিছু টাকা নিজের ঘরে আনিতে পারে।

মোটর বাস্

আর একবার ডাঙ্গায় আসা যাক্। রেল খাল রহিয়াছে, তা সত্ত্বেও সড়ক রাস্তা চলিতেছে। সড়ক রাস্তাগুলিতে মাল চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সে ব্যবস্থা—আপনারা জানেন—একালে অমনিবাস্, অটোমোবিল, মোটর লরী। মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলাতে যেখানে সরকারী কাছারী, বড় হাট বা গঞ্জ, অথবা কারবারের স্থান রহিয়াছে, সে সকল জায়গায় যেমন ছোট ছোট রেল চালাইবার সুযোগ আছে, তেমনি এক একজন লোক কিংবা এক একটা কোম্পানী গোটা পাঁচেক মোটর লরী লইয়া বসিলে দু'পয়সা লাভ করিতে পারে। আট দশ বিশ মাইলের যাওয়া আসার পথে এই রকম করা অতি-কিছু নয়। বাংলায় ১৯০১ সনে অটোমোবিল বস্তুটাকে বিলাসের বস্তু বিবেচনা করা হইত। আজ তা করা হয় না। ১৯২৬ সনের খবর দিতেছি। এই বৎসর আমরা আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স এবং বিলাত হইতে বিশ হাজার "অটোমোবিল" যার দাম ৪৷৷০ কোটি টাকা, হজম করিয়াছি। ১৯১২-১৩ সনের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়,—যেখানে দু'হাজার অটোমোবিল, এক হাজার মোটর সাইকল ছিল, বাস্ নামক বস্তু তখন ছিলই না,—আজ সেখানে তের হাজার অটোমোবিল, দু হাজার মোটর সাইকল ও পাঁচহাজার বাস্ আসিতেছে। যারা চলাফেরা করে তারা সকলে বিলাসের জন্য করে না। ডাক্তার, উকিল, ব্যাঙ্কার, ব্যবসাদার যারা বাস্ বা অটোমোবিলে চলাফেরা করে, তারা নিজ কর্ম্মদক্ষতার জন্য নিজের আয়-বৃদ্ধির পথ করিয়া লয়। অটোমোবিলের বিরুদ্ধে লোকের কোন রকম বিদ্বেষ আর নাই। বাংলার প্রত্যেক জেলাতে যদি পাঁচটা করিয়া কোম্পানী খাড়া হয় তা হইলে গোটা বাংলা দেশে কমসে কম একশ'টা কোম্পানী হইবে। এই একশ'

কোম্পানীর প্রত্যেকে যদি এক একটী জেলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি অঞ্চল বাছিয়া লয়, চার পাঁচ খানি করিয়া অটোমোবিল বা মোটর লরী চালায়, তা হইলে অন্তর্ব্বাণিজ্যের স্থবিধা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লাভবান হওয়ার পথ বাহির হইয়া পড়িবে।

ইয়োরামেরিকার একাল

এখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখা মন্দ নয়। ইয়োরামেরিকা আজকাল যে ধাপে রহিয়াছে তার তুলনায় আমি যা-কিছু বলিয়া যাইতেছি সবই নেহাৎ ছেলে খেলা মাত্র। সবই সেকেলে ব্যবস্থার সামিল ছাড়া আর কিছু নয়। ওসকল দেশে রেল কোম্পানীগুলো মিলিয়া একটা বিপুল "ট্রাষ্ট" গড়িয়া তুলিতেছে। খালের আর একটা "ট্রাষ্ট।" সড়ক দিয়া যানবাহন চালাইবার আর একটা "ট্রাষ্ট" আছে। এই সকল প্রকার ট্রাষ্টের সমবেত কারবার আবার একটা বিপুল ট্রাষ্টরূপে দেখা দিতেছে। আর তার মাথায় রহিয়াছে গবর্মেণ্ট। অর্থাৎ যাতায়াতের যত প্রণালী হইতে পারে সবই এক মাথা হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমি অত উঁচু কথা বলি না। আমি বলিতেছি বাঙ্‌লা দেশে ছোট খাট রেল চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। ষ্টীমচালিত নৌকা চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। অটোমোবিল চালাইতে পারে গোটা শয়েক বাঙালী কোম্পানী। এই তিনশ' কোম্পানী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ কারবার চালাইতে সমর্থ।

তারপর কি করিয়া বিদেশের বেপারীরা অটোমোবিল বেচে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। একটী বড় মার্কিণ ব্যাঙ্কের চিঠি পাইয়াছি। এক কোম্পানী এক বৎসরে দু'লক্ষ অটোমোবিল বেচিয়াছে। এর জন্য একটা স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক খাড়া হইয়াছে। তার নাম অটোমোবিল ফিনান্সিং

কোম্পানী। কি ভাবে তাদের কারবার চলে? যারা মাল খরিদ করিতেছে তাদের কাছে আসিয়া কোম্পানী বলে "পয়সা না থাকে কোম্পানী পয়সা দিবে। দু'হাজার কি চার হাজার টাকার মাল তুমি কিনিয়া লও, লইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দাও। মাসে মাসে অত করিয়া দিও।" অটোমোবিলটা তক্ষুণি বীমা করিতে হইবে। বীমার সার্টিফিকেট ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রাখিয়া দেয়। দু'খানা কাগজ:— (১) মাসে মাসে অত টাকা শুধিবে (২) ইনশিওর সার্টিফিকেট। সে মাসে মাসে গুনিয়া এই টাকা কোম্পানীকে দিবে, ব্যস। অটোমোবিল কোম্পানী এই প্রণালীতে দু'দশ বিশ কোটি টাকার কারবার করিতেছে। এই ধরণের ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্র নানা দিকে কতটা ফুলিয়া উঠা দরকার ভাবিয়া দেখুন। ভারতবর্ষে এই ঢঙের ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা দরকার কিনা তার আলোচনা করিতেছি না। সামান্য ভাবে ৪।৫ খানি অটোমোবিল খরিদ করিয়া ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা চলিতে পারে কিনা তাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। তারপর যথাসময়ে উঁচু ধাপে পা ফেলা যাইবে। এইভাবে চলিলে কারবার টেঁকসই হইবার সম্ভাবনা আছে।

যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি

ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ইত্যাদি বড় বড় জাতির "এলাহি কারখানা" যুবক বাঙলায় আজ সম্ভবপর নয়। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সর্ব্বনিম্ন ধাপগুলায় হাত মক্‌স করা আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকা রোজগার করা বর্ত্তমানে আমাদের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। সেই ধাপেরই কতকগুলা শিল্পফ্যাক্টরি চালাইবার দিকে আমাদের প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন লোকের মোতায়েন থাকা চলিতে পারে।

ছোট রেল, ষ্টীম নৌকা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা চালাইবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই সকল "ব্যবসা"র সঙ্গে সঙ্গে অথবা পশ্চাতে কিছু কিছু "শিল্প"ও আবশ্যক। এঞ্জিন, লঞ্চ, গাড়ী, কলকব্জা ইত্যাদি জিনিষের হিকমত করিবার জন্য চাই নানা প্রকার কারখানা। যে কয়টা ব্যবসার কথা বলিয়াছি তাহার সবগুলাই যন্ত্রপাতির সন্তান, দাস বা আত্মীয়। অতএব প্রত্যেক জেলায় চাই কতকগুলা কারখানা। গ্যাস বা বিজলীর কলকব্জা, রবারের জিনিষ, লোহা লক্কড়ের মাল, স্ক্রু-প্যাচ ইত্যাদি বস্তু মেরামত করিবার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সোজা কথায়, গাড়ীর পায়া ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার চিকিৎসাও চাই আর হাস-পাতালও চাই। এই সব কারখানাকে এক কথায় "এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্" বলা হইয়া থাকে।

এই ধরণের কারখানা বাঙ্লাদেশে একদম নতুন নয়। আজকাল ১৩৫টা ফ্যাক্টরি চলিতেছে। তাহাতে মজুর খাটে ২১,৮১৭ জন। আর টাকা খাটে বোধ হয় প্রায় ২৫ কোটি। কিন্তু এইগুলার কম-সে-কম ১০০টা বিদেশী তাঁবে। মাত্র ৩০।৩২টা বোধ হয় বাঙালীর পরিচালিত। বাঙালীর অধীনস্থ কারখানায় বোধ হয় মাত্র ১,২০০।১,৫০০ মজুরের অন্নসংস্থান হয়। অর্থাৎ বেশী লোকের অন্ন জুটে বিদেশীদের কারখানায়।

যাহা হউক, এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্গুলার প্রায় সবই কলিকাতা আর হাবড়া অঞ্চলে অবস্থিত। মফঃস্বল একপ্রকার এঞ্জিনিয়ারিং-হীন। মাত্র দশ জেলায় এই সকল কারখানার কাজ চলিতেছে। তাহার বোধ হয় একটাও বাঙালীর কারবার নয়।

এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দিকে যুবক বাংলার মতিগতি ফিরিলে নানাপ্রকারে আমরা লাভবান হইতে পারি। মফঃস্বলের নরনারীকে

যন্ত্র-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র উপায় হইতেছে এই সকল কর্ম্মকেন্দ্র।

সরকারী তাঁবে রেল বাড়িতেছে। বাঙালীর তাঁবেও রেল, ষ্টীমার, মোটর বাড়াইবার সুযোগ দেখিতেছি। কাজেই মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে এক সঙ্গে বহুসংখ্যক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার খোরাক জুটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু কারখানা দাঁড়াইয়া গেলে স্থানীয় লোকেরা নতুন নতুন কলকব্জা কিনিবার দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে। টিউব-ওয়েল বা জলের জন্য নলকূপ বসাইবার খেয়াল মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মাথায় সহজেই বসিতে পারিবে। পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীর জন্য বিজলীর সরঞ্জাম, গ্যাসের সরঞ্জাম ইত্যাদি "আধুনিক" জিনিষপত্রের খরিদ্দার হইতে সুরু করিবে। তাহা ছাড়া সাবান, রং, কালী, ওষুধপত্র, কাচ, দেশলাই, পেন্সিল, বরফ, মোমবাতী, কৃত্রিম ঘী ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা-প্রকার রাসায়নিক আর নিম-রাসায়নিক কারবারেও যন্ত্রপাতির ডাক পড়িতে বাধা। এমন কি আজকালকার দিনের কৃষিকর্ম্মও যন্ত্রপাতির সঙ্গে সুজড়িত। অর্থাৎ এঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান যুগের কোনো আর্থিক আয়োজন চলিতে পারে না। কাজেই বৈদ্যুতিক অথবা অন্যবিধ যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং-ঘটিত কারখানা খুলিলে যুবক বাঙলার পক্ষে লাভবান হইবার পথ প্রশস্ত।

এইখানে আমি খোলাখুলি আরও বলিতে চাই যে, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক আর অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা না বাড়িলে যুবক বাঙলা সভ্যতার সিঁড়ির উঁচু ধাপে পা ফেলিতে পারিবে না। যন্ত্রপাতি আমার চিন্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের অস্থিমজ্জা। বাঙলার নরনারীকে মানুষের বাচ্চা হিসাবে মজবুদ করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিবিড় কুটুম্বিতা স্থাপন। লোহালক্কড়ের সালসা

কিছু বেশী মাত্রায় পেটে না পড়িলে বাঙালীর কব্জায় জোর আসিবে না। যুবক বাঙলায় যন্ত্র-সাধনা আর যন্ত্র-দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধনবিজ্ঞানের সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার পরস্পর মেলমেশ কায়েম করা আমি নিজ জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। আনুষঙ্গিক ভাবে বলিতে পারি যে, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কাজেও যন্ত্র-চালিত পাম্পের সাহায্যে খানাডোবার জল নিষ্কাসন আবশ্যক হইবে। আর তাহার জন্য জরুরি কলকব্জার কারখানা আর এঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মদক্ষতা।

নতুন ঢঙের জমিদার

ছোট খাটো চাষে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুযোগ কতটা আছে বলা কঠিন। প্রথমতঃ হয়ত জমিই নাই। দ্বিতীয়তঃ চাষ-আবাদ সুরু করিতে হইলেও কম্‌সে-কম হাজার দেড় দুই টাকা পুঁজির দরকার হয়। তাহা প্রায় কোনো বি. এ., বি. এস্‌-সি. পাশ করা যুবার ট্যাঁকে নাই।

দেড়-দুই-তিন বিঘা জমি যে সকল চাষীর আছে তাহাদের পক্ষে "সমবেত" ঋণ আর ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করা আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। তবে সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার উন্নতি নির্ভর করিতেছে শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের উপর। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা গড়িয়া উঠিলে, ফরাসী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতন তাহাকে বাধ্য করাইয়া সমবায়-ব্যাঙ্কের জন্য সস্তায় টাকা ধার দিবার আয়োজন করা চলিতে পারে। মোটের উপর বুঝিয়া রাখা দরকার যে, দেড়-দুই-তিন-বিঘা জমি হইতে রগড়াইয়া রগড়াইয়া বেশী কিছু টাকা রোজগার করা অসম্ভব।

কিন্তু চাষবাসকে এঞ্জিনিয়ারিং আর রসায়নের আওতায় আনিয়া ফেলিতে পারিলে বাঙলায় কৃষিকর্ম্ম নবীন ধনদৌলতের সূত্রপাত করিবে।

শত শত বা হাজার হাজার বিঘার মালিকেরা নয়া ঢঙের জমিদার দাঁড়াইয়া যাইতে পারিবেন। এই বিষয়ে যুবক বাঙলার মাথা খেলানো অন্যায় হইবে না।

প্রথমেই চাই যন্ত্রপাতি। তারপর চাই সার। আমাদের গোবরের সারে আর চলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাঙলার গরুগুলা খায় কি? তার আবার গোবরের কিস্মৎ কতটুকু? চাই রাসায়নিক সার। এই দুয়ের জন্য নগদ টাকা ঢালিতে হইবে—বলাই বাহুল্য।

জার্ম্মাণিতে মামুলি জমিদার অর্থাৎ রাইয়ত-শাসক রাজাবাহাদুর আর নাই। অথচ জমিজমার আয় হইতেই লক্ষপতি লোক আছে অনেক। এই সব লোক মজুর বাহাল করিয়া হাজার হাজার বা শত শত বিঘার জমিতে শাক শব্জী হইতে ফলমূল, গম, ভূট্টা পর্য্যন্ত সবেরই আবাদ চালায়। তাহার সঙ্গে থাকে গরু, শূয়র, মুর্গী, মৌমাছি ইত্যাদির "চাষ"। দুধ, মাখম, পনির, ডিম, মাংস ইত্যাদি সবই উৎপন্ন হয়। নিজেরা কারবার তদবির করে, রোজ আট-দশ-বার ঘণ্টা করিয়া খাটে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক যেমন করিয়া যতখানি খাটে জমিদারেরাও ঠিক তেমন করিয়া ততখানি খাটিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস আমাদের বাঙালী জমিদার সমাজে পয়দা হইয়া গেলে চাষ ব্যবসাটা আধুনিকতা লাভ করিতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মে প্রচুর উপার্জ্জনও চলিতে থাকিবে। তবে এই ব্যবসা সাধারণ লোকের হাড়ে পোষাইবে না। যে সকল ব্যক্তি দুই চার বৎসর টাকা রোজগার না করিয়াও কারবারে টাকা ঢালিতে পারেন একমাত্র তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের নবীন চাষ বাঙালী জাতিকে উপহার দেওয়া সম্ভব।

খদ্দরে টাকা রোজগার

মামুলি পাড়াগেঁয়ে "কুটির-শিল্পে" যুবক বাঙলার ভাত কাপড় জুটিতে পারে কিনা তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। আমার বিশ্বাস এই দিকে আমাদের অনেকের কিছু কিছু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। টাকা রোজগারের পথ হিসাবে কি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক আর কি অন্যান্য শ্রেণীর লোক সকলেরই এই সম্বন্ধে মাথা খেলানো উচিত।

যন্ত্র-নিষ্ঠা আর যন্ত্র-দর্শন যুবক বাংলায় আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে "হস্ত-নিষ্ঠা" আর "হস্ত-দর্শন" আজও দুনিয়ার উচ্চতম দেশসমূহ হইতে সমূলে লোপাট হইয়া যায় নাই। আজও ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র হাতের কাজ, কুটির-শিল্প, পরিবার-গত ছোট-খাটো কারবার চলিতেছে। চরম ভবিষ্যপন্থী ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিতেরা আজও এই সবের স্বপক্ষে "যথাস্থানে" আর "নির্দ্দিষ্ট সীমানার ভিতর" রায় দিতে লজ্জিত বোধ করেন না।

দুনিয়ার সাগরে সাগরে দেখিয়া আসিয়াছি পালের জাহাজ আজও হাওয়ার জোরে চলিতেছে। অর্থাৎ বিজলী, গ্যাস, কেরোসিন তেল আর ডীজেল মোটর এখনও ধরাখানাকে মামুলি মধ্যযুগের আর্থিক জীবন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারে নাই। ইতালির কোনো কোনো পল্লীতে মেয়েরা আজও ঘাড়ে বাঁক বহিয়া বাল্‌তি বাল্‌তি জল টানে। আর ব্যাহ্বেরিয়ার মফঃস্বলে মফঃস্বলে গরুর গাড়ীও দুএকটা চোখে পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের ওৎলোয়ার জেলায় প্রায় আশী হাজার লোক হাতের তৈয়ারি ফিতার কাজে প্রতিপালিত হয়। মেয়েরা এই শিল্পে ওস্তাদ। শিল্পটার কিছুকাল ধরিয়া দুর্গতি চলিতেছিল। প্যারিসে থাকিবার সময় লক্ষ্য

করিয়াছি যে, ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট হইতে স্বরু করিয়া নামজাদা শিল্প-পতি পর্য্যন্ত সকলেই এই শিল্প আর ব্যবসাটাকে বাঁচাইবার জন্য যারপর নাই চেষ্টিত।

তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা নিম্নরূপ :—"মেয়েরা কৃষিকার্য্যের অবসরে বা অন্য অবকাশে ঘরে বসিয়া এই সকল শিল্প-কারুময় ফিতা তৈয়ারী করিতে অভ্যস্ত। অধিকন্তু শীতকালে যখন চাষ-আবাদ চলে না, তখন মেয়েদের পক্ষে হস্তশিল্পই প্রধান কাজ। এই শিল্পটা ফ্রান্স হইতে বিলুপ্ত হইলে দেশের মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনের একটা বড় উপায় নষ্ট হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতে যন্ত্রচালিত কলকারখানা যতই বাড়ুক না কেন হাতের কাজ বড় শীঘ্র লুপ্ত হইবে না। পাশ-করা ডাক্তারের যুগেও "হাতুড়ে" ডাক্তাররা পয়সা রোজগার করিতেছে। "সেকেলে" ছুতার, মিস্ত্রী, ঘরামি, নুনিয়া, চুণিয়া, কামার, কুমার ইত্যাদি কারিগর এখনো বহুকাল আমাদের সমাজে থাকিবেই থাকিবে। তবে যন্ত্রকলায় তাহাদের কিছু কিছু উন্নতির সম্ভাবনাও আছে।

হাতের তাঁত বাংলাদেশে আজও চলিতেছে বিস্তর। কাপড়ের কলে মাত্র ১৩,৭৩৬ জন মজুরের অন্ন জুটিয়া থাকে। কিন্তু হাতের তাঁতী ২,১১,৪৯৯ জন। এই সকল কুটির-শিল্পে প্রায় ৫,০০,০০০ নর-নারীর অন্ন সংস্থান হয়। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১১,০০০ হাতের তাঁতে কাজ চলিতেছে। ঢাকা আর ময়মনসিংহে প্রায় ১২,০০০ করিয়া হাতের তাঁত চলে। ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১২,৫০০।

কাজেই যাহারা খদ্দরের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন তাঁহারা আহাম্মুক নন। খদ্দর-শিল্পে বহু পরিবারের ভাত কাপড় জুটিতেছে। কুমিল্লার এক "অভয় আশ্রমের" ব্যবস্থায়ই ফী মাসে গড়পড়তা প্রায় ১০।১১ হাজার

টাকার খদ্দর বিক্রী হয়। খদ্দর তৈয়ারি হয় মাসিক ১৩ হাজার টাকার। এই কারবারটা বর্ত্তমান জগতের হিসাবে বড় কিছু নয়। কিন্তু যুবক বাংলার আর্থিক মাপকাঠিতে ইহাকে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিবেচনা করিতেই হইবে। অধিকন্তু "খাদি-প্রতিষ্ঠানের" অঙ্ক হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৯২১ সনের তুলনায় আজ খদ্দরের দাম কমিয়াছে প্রায় অর্দ্ধেক। অপর দিকে খদ্দর টেক্‌সই হইয়াছে ডবল। অর্থাৎ এই চার পাঁচ বৎসরে খদ্দরের উন্নতি চার গুণ।

খদ্দরের কারবারে একদিক হইল শিল্পের তরফ অর্থাৎ মালটা তৈয়ারি করা, অপর দিক হইতেছে ব্যবসা বা বাণিজ্য। অর্থাৎ বাজারে মাল ফেলা, ফেরি করিয়া বেচা, দোকান করা, হাটে যাওয়া এই কারবারের দ্বিতীয় দফা। সুতরাং খদ্দরে একমাত্র তাঁতী, জোলা অথবা শীতকালের অবসরওয়ালা চাষীর অন্ন সংস্থান ঘটিতেছে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। ইহাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আর ষ্টোর্সের যোগাযোগও আছে। অর্থাৎ সহুরে নর-নারীর, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদি পাশ-ফেলকরা লোকের মেহনৎ আর আয়ের পথও আছে।

খদ্দরের কারবারটা ভাল করিয়া চালাইতে পারিলে নানা শ্রেণীর অনেক বাঙালীরই দু'পয়সা আসিতে পারে। এই জন্য খদ্দরের কথা পাড়িলাম। কিন্তু কলের কাপড়ের সঙ্গে খদ্দর দাম হিসাবে অথবা গুণ হিসাবে টক্কর দিতে পারিবে কি না সে কথা স্বতন্ত্র। বাঙ্‌লাদেশের লোক আমরা যতই গরীব হই না কেন, আমাদের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কোনো না কোনো দিকে কিছু না কিছু বিলাসভোগ আছে। বিলাসের অর্থ সোজা। হয় অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক জিনিষ খরিদ করা হইয়া থাকে, অথবা হয়ত দরকারী জিনিষের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দেওয়া হয়। এক কথায় আর্থিক হিসাবে বিলাসের অর্থ অপব্যয়। খদ্দরকে আমি

সম্প্রতি এইরূপ "বিলাসের" সামগ্রীই বিবেচনা করিতেছি। অন্যান্য হাজার রকমের বিলাস-সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত আর ধনী বাঙালী পরিবারের ভিতর খদ্দরের বাতিক যদি কিছুদিন ধরিয়া লাগিয়া থাকে তাহা হইলে বহুসংখ্যক তাঁতী, জোলা, চাষী আর তথাকথিত শিক্ষিত "ভদ্রলোকে"র ঘরে হাড়ী চড়িবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। সুতরাং "খদ্দর-বিলাসে" গা ঢালিবার জন্য আমি যুবক বাংলার যে কোনো মহলে পাঁতি দিতে ইতস্ততঃ করি না।

বাংলাদেশের সকল কারিগর, সকল মিস্ত্রী, সকল তাঁতী আর সকল চাষীকে অল্পদিনের ভিতর আধুনিকতম যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত কারবারে চালিত করিবার ক্ষমতা বাঙালী জাতির তাঁবে নাই। কাজেই "সেকেলে" "হাতুড়ে" "আদিম" আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে যেখানে কিছু কিছু লাভজনক দেখিতে পাই সেইখানেই যুবক বাংলার অন্নের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান-নিষ্ঠা আমাদের আর্থিক ভাঙন-গড়নের ভিত্তি। দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়া বর্ত্তমানের সুযোগগুলা তুচ্ছ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মফঃস্বলে জীবন বীমা

বীমা-ব্যবসা সম্বন্ধে একটা কথা মাত্র বলিব। বীমা-ব্যবসায় ফেল হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এমন আইন-কানুন হইয়াছে যে, কোন কোম্পানীর পক্ষেই ফেল হওয়ার যো নাই। খরচপত্রের আঁকজোক ইত্যাদি কারবার সম্পর্কিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্স পাঠাইতে হয় বিলাতে। সেখানকার "অ্যাকচুয়ারী" বলিয়া দেন—"সাবধানে চল, ভুল হইতেছে। এইভাবে চলিলে মারা যাইবে, এই ভাবে কাজ কর" ইত্যাদি। বীমা-ব্যবসার নানা বিভাগ আছে। আমরা তার সা রে গা মা সাধিতে সুরু করিয়াছি মাত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণিতে গরু ইন্‌শিওর হইতেছে। আমাদের দেশে তা হইবে কবে তা এখনও জানি না। লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া

একটা সামান্য কথা বলা যাইতে পারে। সে হইতেছে মফঃস্বলে জীবন-বীমার বিস্তার। বীমা লইয়া মফঃস্বলে মফঃস্বলে অনেক কিছু করিবার আছে। তাহাতে টাকা রোজগারও করা যাইবে আর দেশের মধ্যবিত্ত ও চাষী-পরিবারের উপকারও সাধিত হইবে।

এইখানে জীবনবীমার দুনিয়া সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য দিতেছি।

শ্রীযুক্ত হল্যাণ্ড আমেরিকার ন্যাশনাল লাইফ ইনসিওর্যান্স কোম্পানীর সভাপতি। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে অনুষ্ঠিত আমেরিকার বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রেসিডেণ্টদের এক বৈঠকে অনেক দেশের বীমা-ব্যবস্থার একটা পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশের লোক কত টাকা বীমা করিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

যুক্তরাষ্ট্র	৬৩ ৭৭৯,৭৪১,০০০	ডলার
গ্রেটবৃটেন	৯,৫৩৭,০৫৯,০০০	”
কানাডা	৩,২৮৫,০২৮,০০০	”
জাপান	২,৪০৪,৭৬২,০০০	”
অষ্ট্রেলিয়া	১,৭০৮,৩৮২,০০০	”
নেদারল্যাণ্ডস্	৯৬১,২৬২,০০০	”
সুইডেন	৮৬৪,১০৭,০০০	”
জার্ম্মাণি	৭১৩,৭৪৮,০০০	”
ফ্রান্স	৭০১,৮৫৫,০০০	”
ব্রেজিল	৪২৬,৯৯৭,০০০	”
সুইট্সারল্যাণ্ড	৩৯৭,৮০৬,০০০	”
ডেনমার্ক	৩৯২,৫৪৭,০০০	”
নরওয়ে	৩৯২,১১১,০০০	”
ইতালি	৩৩৭,৪৭১,০০০	”

দেখা যাইতেছে যে, ১৯২৪ সনে চোদ্দ দেশের লোকে ২৭০০ কোটি টাকা বা ৯০,০০০,০০০,০০০ ডলার বীমা করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানই সেরা। এই হিসাবের সমগ্র বীমা কারবারের ২/৩ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন হয় এবং ১/১০ অংশ গ্রেটবৃটেনে ও ১/৩০ অংশ কানাডায় সম্পন্ন হয়। গোটা ইংরেজীভাষাভাষী দেশ ধরিয়া দেখা যায় যে, তুনিয়ার ৬ ভাগের ৫ ভাগ বীমা কারবার ঐ সকল দেশে চলে। অর্থাৎ ইংরেজ সন্তান ১৯২৪ সনে ৭৮,০০০,০০০,০০০ ডলার বীমা করে।

মাথা পিছু নানাদেশের নরনারী নিম্নলিখিত হারে জীবনবীমা করিয়াছে। ১৯২৫ সনের হিসাব দিতেছি (জার্ম্মাণ বইয়ের নজির হইতে)।

১।	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭৮	মার্ক বা শিলিঙ্
২।	কানাডা	১২৬৪	"
৩।	অষ্ট্রেলিয়া	১০৩৩	"
৪।	ইংল্যাণ্ড	১০২০	"
৫।	সুইডেন	৭২৯	"
৬।	নর্‌ওয়ে	৪৯৫	"
৭।	ডেনমার্ক	৪৮০	"
৮।	সুইটসারল্যাণ্ড	৪৫৬	"
৯।	হল্যাণ্ড	৪৫২	"
১০।	জাপান	১৩৩	"
১১।	ফিনল্যাণ্ড	১২৬	"
১২।	জার্ম্মাণি	১০১	"
১৩।	ফ্রান্স	৯০	"
১৪।	ইতালি	৪৫	"
১৫।	স্পেন	১৯	"

১৬।	বুল্‌গারিয়া	১২	„
১৭।	রুমাণিয়া	৬	„*
১৮।	রুশিয়া	১	„

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায়, ভারতসন্তান বীমা-ব্যবসায় যারপর নাই খাটো। এই দিকে আমাদের এখনো অনেক কিছু করিবার আছে। যাঁহারা টাকা খাটাইবেন তাঁহারা ত লাভবান্ হইবেনই। অধিকন্তু ভারতের অসংখ্য বিধবা ও অনাথ বালকবালিকার আর বুড়াবুড়ীর সুগতি ঘটিতে পারিবে। জীবন-বীমা মানুষমাত্রের পক্ষেই কর্ম্মদক্ষতার ও নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা প্রণালীর সব-সে সেরা হাতিয়ার। জীবন-বীমার ব্যবসাটা যাঁহারা বাঙালী সমাজের হাড়মাসে বসাইতে পারিবেন তাঁহারা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-সেবক।

আজকাল ভারতবাসীর তাঁবে জীবনবীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৮৯। তাহার ভিতর ৬৫টা মালিকানা (প্রোপ্রাইটরী) আর ২৪টা পারস্পরিক (মিউচুয়্যাল)। জীবনবীমার ব্যবসায় ভারতবাসীর বাড়্‌তি নিম্নের তালিকায় স্পষ্ট হইবে :—

বৎসর	নয়া কারবার	বর্ষশেষে গোটা কারবার
১৯২০	৫১,৭০০,০০০ টাকা	৩১০,০০০,০০০ টাকা
১৯২৫	৮১,৫০০,০০০ „	৪৭০,০০০,০০০ „
১৯২৯	১৭২,৯০০,০০০ „	৮২০,০০০,০০০ „

এই বিশেষ আশাজনক কথাটা ব্যবসায়ী মাত্রেরই মনে রাখা আবশ্যক।

---

* ১৯২৯ সনের ভারতে ৪৷৷০ টাকা (৬৷৭ মার্ক বা শিলিঙ্‌)।

আজকালকার ভারতে দেশী ও বিদেশী দুই প্রকার বীমা-কোম্পানী সমবেত ভাবে যত কারবার করিতেছে তাহার অধিকাংশই দেশী কোম্পানীর হাতে। ১৯২৬ সনে মোট প্রীমিয়াম আদায় হয় ৫ কোটি টাকার কিছু উপর। তাহার প্রায় সাড়ে ৩।৹ কোটিই স্বদেশী বীমা-কোম্পানীর কব্জায় আসিয়াছে। কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে,বীমাক্ষেত্রে—স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে—বিদেশীরা মাত্র ৩/৭ অংশ ভোগ করিতেছে। অবশিষ্ট ৪/৭ অংশ স্বদেশী কোম্পানীর তাঁবে রহিয়াছে। বীমা-ব্যবসায় ভারত-সন্তান আজ বিদেশীকে তাহার একচেটিয়া অবস্থা বা প্রাধান্য হইতে সরাইতে পারিয়াছে। এই কথাই ১৯২৯ সনের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে আরও বেশী উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়িয়াছে।

গোটা ভারতে ১৯২৯ সনের শেষে ৬৫৬,০০০টা জীবন-বীমার পলিসি ছিল। সমবেত জীবন-বীমার কিম্মৎ ছিল ১,৪২০,০০০,০০০ টাকা। বার্ষিক চাঁদা আদায় হইত ৭৩,৩০০,০০০ টাকা। এই ব্যবসায় ভারতীয় কোম্পানীগুলার হিস্যা বেশ পুরু। তাহাদের তাঁবে ছিল ৪৭২,০০০ পলিসি। এইগুলার মোট দাম ৭৮০,০০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ সমবেত কিম্মতের অর্দ্ধেকেরও বেশী। চাঁদায় আদায় হইত ৪০,০০০,০০০ টাকা। এই খাতেও ভারতীয় কোম্পানীগুলি বিদেশী কোম্পানীদের চেয়ে বেশী পরিমাণ কাজ করিয়াছে।

মাথা পিছু ভারতবাসীর জীবনবীমার কিম্মৎ দেখা যাইতেছে ৬।৭ মার্ক বা শিলিঙ (৪॥৹ টাকা) অর্থাৎ রুমাণিয়ার কাছাকাছি।

১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা বিষয়ক আইনটা শোধরাইয়া ১৯২৮ সনে নতুন আইন কায়েম হইয়াছে।

এই আইন অনুসারে কতকগুলা নতুন প্রণালীতে বীমা ব্যবসায়ীরা কার্য্য চালাইতে বাধ্য। (১) নতুন কোনো কোম্পানী স্থাপিত হইবামাত্রই

তাহাকে গবর্মেণ্টের নিকট মোটা হারে টাকা কড়ি আমানত রাখিতে হয়। (২) এতদিন বিদেশী বীমাকোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট টাকা জমা রাখিতে বাধ্য ছিল না, কিন্তু নতুন আইনে তাহারাও স্বদেশী কোম্পানীর মতনই বাধ্য। (৩) জীবনবীমা ছাড়া আগুন-বীমা, দৈববীমা বা অন্যান্য বীমা-ব্যবসায়ে যে সকল কোম্পানী লিপ্ত, তাহাদিগকেও টাকা আমানত রাখিতে হয়। পুরাণো নিয়মে তাহাতে একমাত্র জীবন-বীমাব্যবসায়ীরাই বাধ্য ছিল। (৪) বিদেশী বীমাকোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ এতদিন ভারত-সরকারের নিকট ভারতীয় ব্যবসা হইতে পাওয়া টাকার স্বতন্ত্র হিসাব দিত না। নতুন আইন তাহাদিগকে ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে পাওয়া টাকার পৃথক্ হিসাব রাখিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছে। (৫) জীবনবীমা এবং মজুরদের ক্ষতিপূরণ-বীমা এই দুই ব্যবসার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী স্বতন্ত্র খাতা-পত্র রাখিতে এবং হিসাব প্রকাশ করিতে বাধ্য। (৬) কোনো বীমা-কোম্পানীর কাজ-কর্ম্ম অসন্তোষজনক হইলে তাহার দুয়ার বন্ধ করাইবার ক্ষমতা বীমাকারীদের হাতে কিছু কিছু আসিয়াছে। অধিকন্তু, জনগণের স্বার্থ-রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্টের এক্তিয়ার বাড়িয়া গিয়াছে। (৭) কোনো বীমাকোম্পানীর নিকট হইতে তাহার ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কিম্বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী কখনো কোনো কর্জ্জ লইতে পারিবে না। (৮) প্রত্যেক বীমা-কোম্পানী পাশকরা "অ্যাক্চুয়ারি" বা হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া নিজ আর্থিক অবস্থা যাচাই করাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

ভারত-গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে জীবনবীমা-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পঁচিশ হাজার হইতে দুই লক্ষ পর্য্যন্ত আমানত আদায় করিতে অধিকারী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদেশী কোম্পানীর শাখা সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমানতের নিয়মটা জনগণকে "ভূয়ো" কোম্পানীর আওতা হইতে বাঁচাইবার কল স্বরূপ হইবে। আমাদের স্বদেশী কোম্পানীগুলা এই নিয়ম হজম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নবজীবন

এখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজ বাংলা দেশে কমসে কম তিনচারশ' লোন আপিস আছে। "সেকালে" অর্থাৎ আমার বিদেশে যাইবার যুগে যেখানে এসবের নাম নেহাৎ অল্প শুনিয়াছি, এখন সেখানে এই ব্যবসাটা বেশ গুল্‌জার। বাঙলার নরনারী লোন আপিস বা ব্যাঙ্ক নামক ব্যবসা-কেন্দ্রকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। লোকেরা নিজের টাকা কোম্পানীর হাতে ফেলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে শিখিয়াছে। এটা আর্থিক জীবনের ক্রমবিকাশ হিসাবে বড় কথা। টাকা পুঁতিয়া নিজের ঘরে রাখিব সে ভাব আর বেশী নাই। "আমার ট্যাঁকের টাকা ব্যাঙ্কের ঘরে পরের হাতে রাখিলে মারা যাইবে না। বঙলা দেশের সব কয়টা লোকই বাট্‌পার নয়"—এই ধারণা বড় কথা। এ কথাটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারীরা স্থদ বাবদ কিছু কিছু টাকা রোজগার করিতে শিখিয়াছে। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বাঙালী জীবনকে নতুন আকারে গড়িয়া তুলিতেছে একথা বলিতে আমি বাধ্য।

এখনকার সমস্যার কথা বলি। আমদানি রপ্তানির মাল বন্ধক রাখিয়া আমাদের লোন আফিস যদি টাকা দিতে পারে তা হইলে বলিব যে খাঁটী ব্যাঙ্কের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। কোন লোন আফিস তা করিতেছে না তা' বলিতেছি না। করিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই

দিকে আমাদের লোন আফিসের গতি বড় বেশী নয়। মাল বন্ধক রাখা এক জিনিষ আর মাল সম্বন্ধে যে কাগজ, মাল চলাচল যে হইতেছে তার সার্টিফিকেট,—সেটা দেখিয়া তাকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়া আর এক জিনিষ। খাঁটি ব্যাঙ্কের কারবার এই দিকেও অনেক বেশী। শ' তিন চারেক ব্যাঙ্ক মফঃস্বলে জন্মিয়াছে। টাকাওয়ালা লোক যাঁরা তাঁরা যদি মনে করেন যে, এই সব নূতন লাইনে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো দরকার, আর এজন্য কিছু টাকা ঢালিয়া তাঁরা নতুন ঢঙের ব্যাঙ্ক করেন, তা হইলে মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে লোন আফিসগুলা নবজীবন লাভ করিতে পারিবে।

আমার বিশ্বাস, এইদিকে আমাদের মতিগতি অল্পকালের ভিতরই চালিত হইতে থাকিবে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কের পুঁজিতে এক একটা নতুন বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিতে থাকিবে। তাহা হইলে পাঁচসাত বৎসরের ভিতর বাঙলাদেশের কোথাও বাঙালীর তাঁবে কোটি টাকা মূলধনে ব্যাঙ্ক খাড়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হাজার হইতে কোটিতে উঠিলাম আশ্চর্য্য হইবেন না। কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক আজ ভারতবাসীর তাঁবে চলিতেছে। নাম মাত্র মূলধন নয়, আসল সত্যিকার আদায় করা মূলধন। সে জিনিষ কঠিন নয়। যদি দু'চার জন পয়সাওয়ালা লোক নিজে বেশ মোটা টাকা লইয়া পুঁজি সৃষ্টি করেন আর অন্যান্যেরা কেহ পাঁচ হাজার, কেহ দশ হাজার করিয়া তাতে টাকা দেন, তা হইলে লাখ পঞ্চাশেক টাকা মূলধন কায়েম হয়। মফঃস্বলের লোন আফিস বা ব্যাঙ্কগুলা হইতে তখন অপর পঞ্চাশ লাখ পুঁজি স্বরূপ তুলিবার চেষ্টা চলিতে পারে। তবে ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের কারবারে নতুন নতুন দফার আবির্ভাব হওয়া চাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদেশী কোম্পানীর শাখা সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমানতের নিয়মটা জনগণকে "ভূয়ো" কোম্পানীর আওতা হইতে বাঁচাইবার কল স্বরূপ হইবে। আমাদের স্বদেশী কোম্পানীগুলা এই নিয়ম হজম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নবজীবন

এখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজ বাংলা দেশে কমসে কম তিনচারশ' লোন আপিস আছে। "সেকালে" অর্থাৎ আমার বিদেশে যাইবার যুগে যেখানে এসবের নাম নেহাৎ অল্প শুনিয়াছি, এখন সেখানে এই ব্যবসাটা বেশ গুল্‌জার। বাঙলার নরনারী লোন আপিস বা ব্যাঙ্ক নামক ব্যবসা-কেন্দ্রকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। লোকেরা নিজের টাকা কোম্পানীর হাতে ফেলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে শিখিয়াছে। এটা আর্থিক জীবনের ক্রমবিকাশ হিসাবে বড় কথা। টাকা পুঁতিয়া নিজের ঘরে রাখিব সে ভাব আর বেশী নাই। "আমার ট্যাঁকের টাকা ব্যাঙ্কের ঘরে পরের হাতে রাখিলে মারা যাইবে না। বাঙলা দেশের সব কয়টা লোকই বাট্‌পার নয়"—এই ধারণা বড় কথা। এ কথাটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারীরা সুদ বাবদ কিছু কিছু টাকা রোজগার করিতে শিখিয়াছে। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বাঙালী জীবনকে নতুন আকারে গড়িয়া তুলিতেছে একথা বলিতে আমি বাধ্য।

এখনকার সমস্যার কথা বলি। আমদানি রপ্তানির মাল বন্ধক রাখিয়া আমাদের লোন আফিস যদি টাকা দিতে পারে তা হইলে বলিব যে খাঁটী ব্যাঙ্কের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। কোন লোন আফিস তা করিতেছে না তা' বলিতেছি না। করিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই

আর্থিক গড়নের দ্বিতীয় কথা মূলধন। আমি যে সব কারবারের কথা বলিয়াছি তাতে সাধারণতঃ কত টাকা লাগা সম্ভব? ছোট খাট কুটির-শিল্প যে যা পারিতেছে করিতেছে। কিন্তু আপনারা হাজার-পতি, লক্ষ-পতি। ছোট খাট রেল, মোটরলরী, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি ইত্যাদি যদি চালাইতে হয় তা হইলে কমসে কম ২৫ হাজার টাকা দরকার। পাচ সাত বার শ'য়ে এ সব কারবার চলিতে পাবে না। ব্যক্তিগত হিসাবে যাঁরা বড় কারবার ফাঁদিতে চান, তাঁদের জন্য আমার মোসাবিদার বরাদ্দ সাধারণতঃ পাঁচ লাখ। পঁচিশ হাজার থেকে পাঁচ লাখ—এই গণ্ডীর ভিতর টাকা ফেলিতে পারে বাংলা দেশে অন্ততঃ শ' পাঁচেক লোক। আমাদের যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে যদি হুসিয়ার ভাবে কাজে লাগাইতে চাহেন তা হইলে পঁচিশ হাজার হ'তে পাঁচ লাখ টাকা লইয়া মফঃস্বলে মফঃস্বলে কোম্পানী খাড়া করা দরকার। ব্যক্তিগত ভাবে না হইলে পার্টনারশিপ বা জয়েণ্ট ষ্টক ভাবে চলিতে পারে। টাকা ঢালিতে না পারিলে বেকার-সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। লক্ষপতিরা যদি কারবার খুলেন তা হইলেই সুখের কথা।

এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও ধনবিজ্ঞানসেবীর সমন্বয়

আর্থিক সংগঠন বা বিজ্‌নেস অর্গ্যানিজেশ্যনের পিছনে আর একটা জিনিষ আছে। সেটা বলা দরকার। ভারতবর্ষে আমরা একটা শব্দ যখন তখন কায়েম করিয়া থাকি। এই বক্তৃতায় সে শব্দ আমি ব্যবহার না করিলে আপনারা হয়ত সুখী হইবেন না। কাজেই বলিতেছি সেটা "আধ্যাত্মিকতা।" আর্থিক সংগঠনের কথা বলিতেছি। এর পিছনেও একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে। তাকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আজকাল যে দিন পড়িয়াছে তাতে একমাত্র টাকার জোরে টাকা রোজগার

করা সম্ভব নয়। লাভবান হইতে হইলে চাই বিদ্যা, চাই অভিজ্ঞতা, চাই কর্ম্মদক্ষতা। "আধ্যাত্মিকতা" বলিতে আমি এই সব গুণই বুঝি। বাজারের মামুলি অর্থে আমি এই শব্দ প্রয়োগ করি না। বিদ্যা, কর্ম্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা—এর নাম আধ্যাত্মিকতা।

এখানে আর একটু খোলাখুলি ভাবে বলা আবশ্যক। কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিরূপ আধ্যাত্মিকতা চাই? আমার বিবেচনায় যিনি যে কারবারই করুন না কেন, আজকালকার দিনে সকল ক্ষেত্রেই কথঞ্চিৎ বড় গোছের কারবারের জন্য এঞ্জিনিয়ার একজন চাই-ই চাই। ধরা যাক, একব্যক্তি আসিয়া বলিল "আমি জাপান, বিলাত বা আমেরিকা থেকে এই এই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছি। অত হাজার টাকা দিলে কারবার চালাইয়া দিতে পারি। এই এই যন্ত্র চাই ইত্যাদি।" কিন্তু পুঁজিপতি যিনি কারবার করিতেছেন তিনি ঐ কথায় মজিলে লাভবান হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। না বুঝিয়া যদি টাকা ঢালা যায় তা হ'লে টাকার বরবাৎ হইতে পারে। কেননা একমাত্র এঞ্জিনিয়ারের জোরে কোনো ব্যবসা চালানো সম্ভবপর নয়। চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য অনেক কারবারে আজকাল রাসায়নিকেরও দরকার। অধিকন্তু যে লোক ব্যবসা বুঝে, টাকার বাজার বুঝে, বিজ্ঞাপন-প্রণালী বুঝে আর বাজারদর বুঝে এইরূপ লোকও আবশ্যক। ১৯২৭ সনে পঁচিশ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা লইয়া যাঁরা কারবারে নামিবেন তাঁরা যদি এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ধনবিজ্ঞানবিৎ এক যোগে এই তিন-শ্রেণীর ওস্তাদ লোক না আনিতে পারেন তবে এক মাত্র টাকার জোরে কিছু সুফল লাভ করিতে পারিবেন না।

গত বিশ বৎসরের ভিতর বাঙলা দেশে যত "স্বদেশী" কারবার ফেল মারিয়াছে তার বৃত্তান্ত যদি হিসাব করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন যে, সকল ক্ষেত্রেই যে টাকা গ্যাঁড়া মারার জন্য কারবার ফেল মারিয়াছে

তা নয়, ফেল মারিয়াছে আমাদের আধ্যাত্মিকতায় গণ্ডগোলের জন্য। অর্থাৎ ধরুন, আমি এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক বা ধনতাত্ত্বিক, তিন বৎসর কি সাড়ে তিন বৎসর জাপানে ছিলাম, আমেরিকায় ছিলাম। আসিয়া বলিলাম, যদি পনর হাজার টাকা তুলিয়া দিতে পারেন তবে কারবার চালাইয়া দিতে পারি। দিলেন আপনারা টাকা আমায় বিশ্বাস করিয়া। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি একা কি করিতে পারি? হয়ত, বড় জোর মালটা তৈয়ারা করিয়া দিতে পারি। কিন্তু মালটা বাজারে চালাইবে কে? সে কথা ভাবিবার ভার ত আমার ঘাড়ে নাই। আপনিও ভাবেন না। আমি অঙ্ক কষিয়া দেখাইতে পারি ল্যাবরেটরীতে এই এই হয়। কিন্তু আমার পাল্লায় পড়িয়া আপনি আমার হাতে সব-কিছু ছাড়িয়া দিলেন। ফলতঃ, সব-জান্তা রাসায়নিকের দৌরাত্ম্যে, সব-জান্তা এঞ্জিনিয়ারের দৌরাত্ম্যে কারবার ফেল মারে। এদের পাল্লায় পড়িলে যখন তখন পটল তুলিতে হইবে। ছোট কাজ হউক, বড় কাজ হউক, তাতে তিন রকমের অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লোক চাই সমানভাবে। তাকে তিন দিয়া গুণ করিয়া ৩×৩=৯ অথবা ১৪ দিয়া গুণ করিয়া ৩×১৪=৪২ করিতে পারেন। কিন্তু কমসে-কম তিনটি তিন শ্রেণীর, তিন ঢঙের মাথা চাই। এই তিনটি মাথা পরস্পর তর্ক করিয়া সহযোগ চালাইয়া কারবার যদি করিতে পারে, তা হইলে কারবার টিকিয়া যাইবে।

বাঙ্গালীর শিল্পনিষ্ঠায় বক্কান-কথা ও মাড়োয়ারি-সমস্যা *

বহরমপুরে শিল্প প্রদর্শনার উদ্বোধন করার গৌরব আমাকে দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রারম্ভে আমার প্রধান কর্ত্তব্য বহরমপুরের

* বহরমপুরে অনুষ্ঠিত "প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মেলন" সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতার সার মর্ম (৪ ডিসেম্বর, ১৯৩১)।

মহানুভব, শ্রেষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদের অন্যতম, কাশিমবাজারের পরলোকগত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। স্বর্গীয় মহারাজা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাউনহলে জাতীয়তাবাদীদিগের সভায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিয়া যুবক বাংলার সৃষ্টি বিষয়ে সহায়তা দান করেন। ঐ সময় হইতে যুবক বাংলা রাজনীতি অর্থনীতি ও অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমাগত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। আজ বঙ্গদেশে যা-কিছু শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, আজ যে সকল বস্ত্র ও চটকল, কয়লার খনি রাসায়নিক কারখানা, চা-বাগান, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মহাজনী প্রতিষ্ঠান, জীবনবীমা কোম্পানী, শ্রমজীবী-সঙ্ঘ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, সেগুলি প্রধানতঃ ১৯০৫ সনের দেশপ্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যন্ত্র ও হাতিয়ার প্রস্তুত বিষয়েও বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীরা উল্লেখযোগ্য গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আন্তর্জ্জাতিক জগতে বাঙ্গালীর নানা প্রকার কৃতিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বর্ত্তমানে যে সকল মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা সমসাময়িক শিল্প-জগতে হয়ত ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু প্রথমেই একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা বাঞ্ছনীয় যে, কেবলমাত্র জগতের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী জাতির তুলনায় বাঙ্গালীরা শিল্প ও সৃষ্টি-কৌশল বিদ্যায় নিকৃষ্ট। বুলগেরিয়া, রুমাণিয়া, পোলাণ্ড ও অন্যান্য বল্কান দেশ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপ এবং রুশিয়া—এ সকল স্বাধীন স্থানের তুলনায় বাংলা একেবারে নগণ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিষয়ে ইয়োরোপের শতকরা ৬০ জন লোকের অবস্থা অল্পাধিক পরিমাণে বাঙ্গালীদের অবস্থারই মত।

তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠার দিক্ দিয়া বাঙ্গালীর অবস্থা খুব খারাপ নহে।

ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনা করিলেও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে বাংলার অবস্থা নৈরাশ্যজনক নহে। শিল্প-বিষয়ক কৃতিত্বের কথা বিবেচনা করিলে মারাঠা কিংবা দাক্ষিণাত্যবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালার মধ্যে এবং তামিল কিংবা অন্ধ্রবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলা যায় না। কেবল পার্শী, গুজরাটি ও ভাটিয়ারা এ বিষয়ে বাঙ্গালীদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। তাহারা মারাঠা, পাঞ্জাবী এবং ভারতের অন্যান্য জাতিরও অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন যে, মারাঠা, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালীরা শিল্পবিষয়ে পশ্চাৎপদ বলিয়া তাহারা গুজরাটি, ভাটিয়া ও পার্শীদের তুলনায় সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্যমূলক বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীদের শিল্প-সম্বন্ধীয় অনুন্নতি তাঁহাদের শিল্পবিমুখতারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীদের অনুন্নতির ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যে কারণেই হউক বাঙ্গালীদের অর্থনৈতিক উদ্যম ও কর্ম্মকৌশল আধুনিক শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচালিত না হইয়া অপরাপর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। মাত্র সেদিন শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের উদ্যম দেখা দিয়াছে। এই বিলম্বের জন্যই বাঙ্গালীরা প্রধানতঃ বর্ত্তমানযুগসুলভ শিল্প-ব্যবসায় অনুন্নত রহিয়াছে।

এই অনুন্নতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু আমি ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা বাঙ্গালীদের দোষস্খালন করিব না। বাঙ্গালীদের শিল্প-বিষয়ক শোচনীয় অনুন্নতি দূর করিতে হইবে। আজ যুবক বাংলার সম্মুখে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ রহিয়াছে। শিল্প বিষয়ে যুবক বাংলাকে

গুজরাটী, ভাটিয়া পার্শীদিগের সমকক্ষ হইতে হইবে। কেবল তাহা নহে, যুবক বাংলাকে শিল্প-ব্যবসা বিষয়ে বৈদেশিক উচ্চ আদর্শ অনুসারেও চলিতে হইবে।

আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উপায়ও অস্পষ্ট নহে। ১৯০৫ সনের আন্দোলনে যে সকল ভাব সূচিত হইয়াছিল ঐগুলির মধ্যেই যুবক বাংলার প্রধান শিল্প-নীতি নিহিত আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সকল প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই শিল্প ও ব্যবসার আগ্রহ বদ্ধমূল ও প্রসারিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যুবক বাংলার পক্ষে সরকারকে জাতীয় শিল্পের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। আধুনিক ও মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী নীতি অনুসারে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের পুনর্ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কেবলমাত্র অনুসন্ধান, প্রচার, পরীক্ষামূলক কার্য্য প্রভৃতি এই কার্য্যের অন্তর্গত হইবে না। সরকারের ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্য, সরকার কর্ত্তৃক ব্যবসার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, গঠনমূলক শুল্ক, ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্য্যে মিউনিসিপ্যালিটীর ক্ষমতার প্রসার, শিল্প ব্যবসার সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি বিষয়গুলিও ঐ কার্য্যের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত।

আমি এখানে কেবলমাত্র এই আভাস দিতেছি যে, কৃষি-সংক্রান্ত ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত রকমের যন্ত্র-পাতি অবিলম্বে জিলায় জিলায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। এই সকল যন্ত্রপাতির চাহিদা প্রবল এবং ঐগুলি দেশের কারিগর ও মিস্ত্রী দ্বারা সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, কলিকাতায় ও বাংলার অন্যান্য ব্যবসাপ্রধান অঞ্চলে "শিল্প-পুঁজিসঙ্ঘ" স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ যে সকল ব্যবসা উন্নতিলাভে সমর্থ হইতেছে না, সেগুলিকে অর্থ-সাহায্য প্রদান করা ঐ সকল সঙ্ঘের প্রধান কাজ হইবে। তরুণ বাংলার কতিপয় ব্যবসায়ী

এইরূপ কয়েকটা সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম ও ব্যবসায়-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এক্ষণে পাঁচ ছয়টা "শিল্পপুঁজিসঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। সঙ্ঘগুলা অংশীদারদের কোম্পানীরূপে কাজ করিবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য শ' পাঁচেক টাকার কম হওয়া উচিত নয়।

এখানে আরও একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সহযোগ লাভের চেষ্টা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। বাংলার সকল প্রকার আন্দোলনে মাড়োয়ারীরা বাঙ্গালীদের মতই আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছেন। আমাদের স্বার্থের জন্যই আরও অনেক দিন তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া আবশ্যক হইবে।

ইহুদীরা ইয়োরোপে ও আমেরিকায় যে কার্য্য করিতেছেন, মাড়োয়ারীরা আর্থিক ভারতে তাহা করিতেছেন। মাড়োয়ারীকে 'নিখিল ভারতীয়' ব্যক্তি বলা যায়। কেবলমাত্র বাঙ্গালীরা নহেন, মারাঠা, পাঞ্জাবী, তামিল, বিহারী ও অন্যান্য প্রদেশবাসীরা মাড়োয়ারীদের অর্থের উপর অল্পাধিক নির্ভর করেন। যুবক বাংলার পক্ষে মাড়োয়ারীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসা আবশ্যক।

এ কথায় যেন ভুল না হয় যে, বাঙ্গালী আমরা অনেকদিন বিলম্বে আধুনিক শিল্প-ব্যবসার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। আমরা ইহাও যেন না ভুলি যে, গ্রেটবৃটেনের অধিবাসীদের তুলনায় ফরাসী ও জার্ম্মাণগণ শিল্প-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রায় দুই পুরুষ পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইতালীয় ও জাপানীরাও শিল্পব্যবসায় বিলম্বে ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গালীরা বিভিন্ন বিদ্যা ও কলায় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, কৃষি, রাজনীতি

প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বাঙ্গালীরা বিলম্বে শিল্প-ব্যবসার পাঠ আরম্ভ করিলেও তাহারা জার্ম্মাণ জাপানীদের মতই শিল্প ব্যবসার ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবেন, আমি এরূপ বলিতে সাহসী হইতেছি।

যুবক বাংলার শিল্প-ব্যবসা-বিষয়ক কার্য্যকারিতা ভারতের অনুন্নত লোকদিগকে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত অধিবাসীদিগকে উদ্দীপনা প্রদান করিবে। বাংলাব স্বদেশী আন্দোলন রুশীয় গসপ্লান ও ফাশিষ্ট ইতালীয় আর্থিক স্বদেশপ্রেমের মত জগতে স্মরণীয় হইবে।

এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি যুবক বাংলাকে ত্যাগ ও সংগঠন-মূলক কার্য্যে আহ্বান করিতেছি। বাংলার যৌবনশক্তি আধুনিক শিল্প ও ব্যবসা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকুক।

বীর-পূজা

১। ক্ষীরোদপ্রসাদের নয়া দুনিয়া *

(১)

রাত হ'য়ে গেছে, ক্ষীরোদবাবুর সম্বন্ধে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যত রকম যা-কিছু থাকতে পারে সব আলোচনা হয়ে গেল, বিশ্লেষণের বাকী আর কিছু নাই। এই অবস্থায় আমি যদি কিছু না বলি তাহলেই বোধ হয় ভাল হয়। কিছু যদি বল্‌তে হয় তবে একমাত্র সে কথা বল্‌তে পারি, যে কথা চব্বিশ ঘণ্টা আমার মনে আসে। সেটা হচ্ছে যুবক-বাংলার কথা। যুবক-বাংলার শক্তিযোগই আমার একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

১৯০৫ সন হ'তে আজ পর্য্যন্ত এই বাংলা দেশ কবে কোথায় কতটুকু বেড়েছে এবং আজ তার আর কতটুকু বাড়বার সম্ভাবনা দেখ্‌ছি, ইহাই আমার একমাত্র আলোচনার বস্তু। বাংলা দেশ বেড়ে চলেছে, বাংলাদেশ বাড়্‌ছে, বাঙ্গালা জাতি বাড়বে। এই বাড়্‌তির হিসাব রাখা আমার প্রধান আনন্দের জিনিষ এবং সেটা আমার ব্যবসাও বটে। বাড়্‌তিটা কেবল মাপা—জরাপ করা নয়, বাড়্‌তে বাড়্‌তে কোন্ অবস্থায় এসে পড়্‌ল, তার হিসাব করাও আমার কাজ। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী,—এদের তুলনায় যুবক-বাংলা বিশ-বাইশ বৎসরের সাধনার ফলে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা খোঁজ করাও আমার সাধনার অন্তর্গত।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)।

আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে অনেকবার এই মনে হয়েছে যে, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বর্ত্তমান জগতের অন্যতম পহেলা নম্বরের কবি। কথাটা আরো সোজা ক'রে বলি।

১৮৭০ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত এই সাতান্ন বৎসরের ভিতর ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায়, বিলাতে, ইতালীতে, রুশিয়ায়, জাপানে যতগুলি পহেলা নম্বরের নাট্যকার বা কবি,—ঐতিহাসিকের কথা নয়, অর্থ-শাস্ত্রীর কথা বল্‌ছিনা,—পহেলা নম্বরের নাট্যকার বা কবি জন্মেছে, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহাদের অন্যতম।

(২)

কষ্টি-পাথরটা কিছু খুলে' দেখানো দরকার। কিসের জোরে তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম পহেলা নম্বরের কবি বল্‌ছি? ক্ষীরোদবাবু স্বদেশ-সেবক ছিলেন। যাহারা তাঁহাকে জান্‌তেন তাঁহারা জানেন, তিনি স্বরাজ-সাধক ছিলেন। এখানে বলে' রাখ্‌ছি, স্বরাজ-সাধক বা স্বদেশ-সেবক হলেই কোন লোক বড় কবি বা নাট্যকার হতে পারে না। তার একটা দৃষ্টান্ত দিব। মান্ধাতার আমলের হোমার আর বৈদিক সাহিত্যের যুগ হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পহেলা নম্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্রষ্টা জন্মেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ-সেবক বা স্বরাজ-সাধক ছিলেন না! যারা একাধারে স্বরাজ বা স্বাধীনতার সেবকও বটে তাহাদের ভিতর বোধ হয় মধ্যযুগের ইতালিয়ান কবি দান্তে এক বড় দৃষ্টান্তস্থল। ইনি ঘোড়-সওয়ার হয়ে দেশের জন্য লড়েছেন, দেশ-দেশান্তরে নির্ব্বাসিতও হয়েছেন; তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন কাব্যশিল্প সৃষ্টি করেছেন, যা দেখে' দুনিয়ার সকলে বলেছে, আর আজও বল্‌ছে—তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর

জার্ম্মাণীতে একজন মস্ত বড় কবি ও নাট্যকার জন্মেছেন, যার জোরে যুবক-জার্ম্মাণীর জীবনে ফোয়ারা ছুটেছে—নাম তাঁর শিলার। তাঁর নাট্য, জগতের অদ্বিতীয় নাট্যশ্রেণীর অন্যতম বটে। কিন্তু দান্তে যে হিসাবে জগতের পহেলা নম্বরের কবিদের মধ্যে অন্যতম, শিলার সে হিসাবে বড় হতে পারেন নি। আমার বিবেচনায়,—দান্তে ছাড়া আর কেহ এক সঙ্গে স্বদেশসেবক আর পহেলা নম্বরের কবি নন। স্বরাজ-সেবক বা স্বাধীনতার পুরোহিত হ'লেই যে কবি হিসাবে কেহ অমর হবে, তা বলা চলে না।

(৩)

আমাদের ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যে এবং সাহিত্যে রকমারি জিনিষ আছে। তার ভিতর একটা জিনিষ স্বদেশ-সেবা ও স্বরাজ-সাধনার কথা। লোকেরা স্বদেশ-সেবক না হলেও কাব্যের ভিতর, সাহিত্যের ভিতর, উপন্যাসের ভিতর স্বদেশের কথা প্রচার করতে পারে। কিন্তু ক্ষীরোদ-প্রসাদ নিজে স্বদেশ-সেবক ও স্বরাজ-সাধক ত বটেনই। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্য-সাহিত্যে স্বরাজ-সাধনার প্রেরণা হাজার হাজার ছড়িয়েছেন। কিন্তু স্বদেশ-সেবার কথা প্রচার করার জোরেই কোনো লোক জগতে অদ্বিতীয় সাহিত্যবীর, কবি বা নাট্যকার হতে পেরেছে কিনা জানি না। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রায় একশ' বৎসর আগে ফ্রান্সে একজন নাট্যকার ছিলেন, তিনি স্বদেশ-সেবক ও কবি। তাঁর সাহিত্য অতি-মাত্রায় বিপ্লব-পন্থী। নাম দলাভিন। কিন্তু এই নামটি পর্য্যন্ত অনেকে শুনেন নি। মাদ্রাজে অস্পৃশ্য পারিয়া নামে যে জাতি আছে, তার সম্বন্ধে তিনি নাটক লিখেছেন। উদ্দেশ্য এই,—ফ্রান্সে যে বিপ্লব-যুগ চলেছে একটা বিদেশী জাতির চরিত্র দিয়ে তিনি তা ফুটিয়ে তুলবেন।

অবিচার, অত্যাচার আর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কি ভাবে বিপ্লব চালাতে হয়, তিনি নাটকে তার প্রতিমূর্ত্তি দিয়েছিলেন (১৮২১)।

স্বদেশ-সেবায় অনুপ্রাণিত করেছে এমন অনেক নাটক জগতের সাহিত্যে আছে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুবক-জার্ম্মাণীকে কেমন করে' ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে হয়, জার্ম্মাণ কবি ক্লাইষ্ট তাহা ভাল জান্‌তেন। জার্ম্মাণীতে তাঁর গান ছাড়া কোন কাজ চল্‌ত না। কিন্তু তাঁর নাম আজ কয়জনে জানে? তিনি একাধারে স্বদেশ-সেবক ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। ফরাসীর "লা পারিয়া" নাটকও উচ্চ অঙ্গের নাট্য বটে, তা সত্ত্বেও সেটা ক্লাইষ্ট পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছে নি। ফরাসী নাটকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য।

তবে যে বল্‌ছি,—আমাদের ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম, সেটা কোন্ মাপকাঠিতে? স্বদেশ-সেবা আর স্বদেশসেবাবিষয়ক সাহিত্য-রচনার মাপকাঠি প্রথমেই বর্জ্জন করে' নেওয়া গেল।

কবিতা জিনিষটা ইতিহাস নয়—এই কথাটা প্রথমে বুঝা দরকার। কবিতা জিনিষ চৈতন্য-চরিতামৃতের দোহা নয়, উপনিষদের সূক্ত নয়, কোন রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা নয়। সাহিত্য জিনিসটার ভিতর অর্থ-শাস্ত্র কিংবা সমাজ-শাস্ত্র কিম্বা ইতিহাস কিম্বা এই ধরণের জিনিষ খুঁজ্‌তে যাওয়া কোন কোন লোকের মর্জ্জি হ'তে পারে। কিন্তু তাহার জোরে কোনো রচনা, কবিতা বা সাহিত্য দাঁড়ায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের দুনিয়ায় কথা-বস্তু অনেক। আছে সেকাল-একাল, আছে হিন্দু-মুসলমান, আছে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, আছে হাসি-ঠাট্টা-ছ্যাবলামি, আছে গুরু-গাম্ভীর্য্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের বই পড়ে' কেহ মধ্যযুগের বাংলা বুঝ্‌তে চেষ্টা করে। কেহ বর্ত্তমান সাঁওতাল, ডোম, বাগ্‌দীর ইতিবৃত্ত জান্‌তে চেষ্টা করে। কেহ ইতিহাস হিসাবে, কেহ সমাজতত্ত্ব হিসাবে, কেহ পুরাণ

হিসাবে, কেহ বেদান্ত-দর্শন হিসাবে, কেহ বৈষ্ণবতত্ত্ব হিসাবে ক্ষীরোদ-সাহিত্যের ভিতর এক একটা চরিত্র দেখ্তে চেষ্টা করেন। আমি বলি সে সব দেখা যায় ব'লেই ক্ষীরোদপ্রসাদ অমর হয়েছেন তা নয়, অথবা অমর থাক্বেন তাও নয়। এসব থাকা না থাকা অবান্তর কথা। এই ব্যক্তির অমরতার আসল ভিত্ অন্যত্র ঢুঁড়তে হবে। সেটা এই,—সাহিত্য এবং কাব্য জিনিষটার একটা স্বাধীনতা ও স্বরাজ। অর্থাৎ সাহিত্য জিনিষটা কোন ইতিহাসের জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব জারী করে না। কাব্য জিনিষ দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রচার করে না। যেমন ব্যক্তি-জগতের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আছে, যেমন বস্তু-জগতের স্বাতন্ত্র্য আছে তেমনি শিল্পের ও স্বাতন্ত্র্য, সাহিত্যেরও স্বাতন্ত্র্য আছে।

(৫)

কাব্য এবং সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য বা স্বরাজ পাকড়াও কর্তে পারি কোন্ বিশেষত্বের ভিতর? তাহারই আলোচনা কর্ছি। সংস্কৃত কাব্যের মুদ্রা-রাক্ষস, শেক্সপীয়ারের "কিং লিয়র" এবং জার্ম্মাণদের "হ্বিলহেল্মটেল," এই তিনখানি তিন রকমের কবিতা। ইহার ভিতর আছে তিন তিন রকমের দর্শন। এইগুলার সঙ্গে ক্ষীরোদবাবুর "রঞ্জাবতী"র তুলনা করা যাউক। আপনারা জানেন যে, এটা ডোম ও বাগ্দীর গল্প। আমি দেখাতে চেষ্টা কর্ছি, কেমন করে' ক্ষীরোদপ্রসাদ পহেলা নম্বরের কবি হ'লেন। সাধারণতঃ লোকেরা যখন কবিতা সৃষ্টি করে তখন জোরের সহিত সত্যের দিকটা দাঁড় করানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টো অর্থাৎ অসত্যের দিকটাও দাঁড় করানো হয়। দুয়ে একটা লড়াই চল্তে থাকে। আস্তে আস্তে একটা দিকের নিন্দা দেখ্তে পাই এবং অন্য দিকের সৌন্দর্য্য

ফুটে' উঠ্তে থাকে। এইভাবে সাধিত হয় শেষ পর্য্যন্ত সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয় ইত্যাদি। অনেক বড় বড় কবি এই রীতিতেই একটা জিনিষকে ধ্বংস কর্বে আর একটা জিনিষকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুল্বে যেন সেটা হিমালয় পর্ব্বতের মত অটল। রামায়ণের গল্প দেখুন, রামচন্দ্র ও রাবণে লড়াই, রামের সহায় যত রকমে হ'তে পারে সবগুলিকে এক রকম ভাবে সাজান হ'ল, রাবণের সহায় ঘটনাগুলিকে আর একভাবে ঠিক বিপরীতরূপে সাজান হ'ল, যাতে রাবণ পরাজিত হ'তে পারে।

এই হ'ল এক ঢঙের সৃষ্টি-চাতুর্য্য। এই সৃষ্টির সঙ্গে "রঞ্জাবতী"র ডোম-বাগ্দীর গল্পের তুলনা করুন। একটা নূতনত্ব দেখ্তে পাবেন। যে জিনিষটা যখন আমরা আশা কর্ছি, ঠিক সে জিনিষটা আস্ছে না। আস্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কথার ভিতর দিয়ে এক একটা অপ্রত্যাশিত জিনিষ। প্রত্যেক অঙ্কে, প্রত্যেক কথোপকথনে, প্রত্যেক ঘটনা-সমাবেশে এমন গড়ন এসেছে যে, পাঠক বুঝ্তে পারে না জিনিষটা দাঁড়াবে কোথায়। একবগ্গা সাধু-অসাধু, একবগ্গা ধার্ম্মিক-জোচ্চোর, একবগ্গা বীর-কাপুরুষ, এই রকম কতকগুলা চরিত্র সৃষ্টি করা ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশেষত্ব নয়। তাহার এক একজন লোক সম্বন্ধে পনর জন লোক পনর রকমের কথা বল্ছে এক সঙ্গে। অর্থাৎ ক্ষীরোদের কল্পনায় সে লোকটা এক নয়, সে বহু। নাম এক, কিন্তু বাস্তবিক সে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্বময়। অঙ্কের পর অঙ্কের ভিতর, প্রত্যেক কথোপ-কথনের ভিতর ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্টি-কৌশল এই বহুত্বের রূপ পরিস্ফুট করে' তুলেছে।

সৃষ্টি-কার্য্য অনেক রকমের হ'তে পারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্টি নতুন জিনিষ। মান্ধাতার আমলের মুদ্রারাক্ষস অথবা কিং লিয়রের মত জিনিষ পৃথিবীতে আজকাল আর চলে না। তার জায়গায় আরেকটা জিনিষ

দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছি। মামুলি চিন্তায় রস নয় প্রকার। কিন্তু তুলনামূলক শিল্প-বিজ্ঞান, চিত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা-রকম বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখ্‌ছি যে,—যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রবৃত্তি বা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলি, সেগুলা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ মামুলি ভাগে বিভক্ত করা চলে না। ৯×৯=৮১ অথবা এমন কি নয় হাজার, উনিশ হাজার নানা রকম জটিল চিত্ত-বৃত্তিতে দেখানো যেতে-পারে। আর তাহাতেই কবিরও স্বষ্টিশক্তি সূচিত হয়। কোন ব্যক্তি সহজ-সরল মানুষ নয়। প্রতিমুহূর্ত্তে সে জিলিপীর প্যাচ। দুনিয়া তাকে এক ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করে না, এক সঙ্গে পনর ব্যক্তি ব'লে স্বীকার কর্‌ছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের মাথায় এই রস-বৈচিত্র্যের আর বৈচিত্র্য-স্বষ্টির জ্ঞান এসেছিল। যে-কোন চরিত্র আসুক, যে কোন গল্প বা ঘটনা আসুক, তাকে তিনি এমন ভাবে দাড় করিয়ে দিবেন যাতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা কবির গড়ন-জ্ঞান বা রূপ-বিদ্যা দেখ্‌তে পাব। মামুলা ধরণের চরিত্র-বিশ্লেষণ তাতে পাই না। নানাপ্রকার কথাবস্তু-বিষয়ক আর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও,—এইখানে ঘটনা-স্রষ্টা ও চরিত্র-স্রষ্টা হিসাবে ইবসেনের কথা মনে হচ্ছে।

(৬)

এইবার স্বষ্টি-শক্তি আর স্বষ্টিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু তলিয়ে দেখা দরকার। যে দুনিয়াটা পেয়েছি তাকে ভেঙ্গেচুরে নতুন কিছু কর্‌তে পারি কিনা তাই দেখা হচ্ছে মস্তিষ্ক-শক্তির আসল কথা। ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাই,—নরনারীর চরিত্রগুলাকে ভাঙা-গড়ায়। রামা-শ্যামা-আবদুল-ইস্-মাইল,—এরা যে ধরণের লোকই হউক না কেন, সেই লোকগুলাকে তিনি এমন ভাবে গড়ে' তুল্‌বেন যাতে—পাঠকেরা তার ওস্তাদি বুঝ্‌তে পারবে,

লোকেরা বলাবলি করবে—"এই চেহারা, এই মূর্ত্তি আগে ত কখনও দেখি নি। অমুক চিত্তবৃত্তির সঙ্গে অমুক চিত্তবৃত্তির যোগাযোগ পূর্ব্বে কখনো নজরে পড়ে নি।" এই ভাবে ডজন ডজন চরিত্র সৃষ্টি ক'রে ক্ষীরোদ-প্রসাদ অমরত্ব লাভ করেছেন। বাংলা দেশে পঞ্চাশ-ষাট্ বৎসরের ভিতর যে সমস্ত লোক, মানুষের মতন মানুষ,—"বাপকা বেটা" জন্মেছেন – তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, "যে দুনিয়া দেখ্‌ছি এ দুনিয়া কিছু নয়। এই যে বাংলার নরনারী দেখ্‌তে পাচ্ছি তাও কিছু নয় বাংলা দেশ এমন হওয়া সম্ভব যা এখন নাই। যা নাই তাই ঠিক, যা আছে তা ঠিক নয়। এই হিসাবে এমন কতকগুলি লোক সৃষ্টি করা দরকার যারা বাংলা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে অভিনব রূপে গড়ে' তুল্‌বে।" এই মাপকাঠিতে আশুতোষ মানুষের মতন মানুষ,—"বাপকা বেটা"। তাঁর বুকের পাটার ভিতর যে ভাবুকতাময় বিশাল প্রাণ ছিল তাতে দুনিয়া ভাঙন-গড়নের ওস্তাদি দেখ্‌তে পাই। কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনও আর একজন "বাপকা বেটা"। দেশের ভিতর নতুন প্রাণের গড়ন দেখাতে দেখাতে তাঁর প্রাণ গিয়েছে। ঠিক সেই হিসাবেই, সেই মাপকাঠিতেই বল্‌ছি যে,—"বাপকা বেটা" ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-শিল্প একটা নতুন তাজা দুনিয়া সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে আর সেই শিল্প-দুনিয়ার লোকগুলি যেন রক্তমাংসেরই জ্যান্ত নরনারী,—ঠিক যেমন জ্যান্ত নরনারী আমাদের বৈচিত্র্য-পূর্ণ, বিভিন্নতাময় যুবক ভারত।

২। জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা *

"হুবে দেবীমদিতিং শূরপুত্রাং
সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা যথাসানি।
হুবে সোমং সবিতারং নমোভি
বিশ্বানাদিত্যা অহমুত্তরত্বে।"

(বীরপুত্রের জননী অদিতি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন সহজাত লোকজনের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আসন পাই।

চন্দ্র সূর্য্য আর অন্যান্য আদিত্যগণকে নমস্কার সহকারে ডাকিতেছি, যেন আমি উত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।) অথর্ব্ববেদ ২।৩

আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্যজগতের অন্যতম গুরু-রূপেই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙালীর গৌরব, হিন্দুর গৌরব মনে করি।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইয়োরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি। কলিকাতা, ১৯১৩

দিগ্‌বিজয়ী জগদীশ

দুনিয়ারে কোন্ তত্ত্ব শিখায়ে গেলে তুমি?
গুরুদেব! বুঝিতে পারি না তাহা মূর্খ আমি।
জানি,—বাইরের আঘাত পেলে জীবন দেয় সাড়া,
সেই সাড়া কি তারাও দেয় চেতনা-হীন যারা?
মানুষের মতই নাড়ী-স্নায়ু, ক্লান্তি, স্মৃতি, রোগ
দেখায় কি ধাতু-লতা-পত্রে তোমার যন্ত্রের যোগ?
সঙ্গী তোমার "বন-চাঁড়াল" ঐ ঘুরছে তোমার সাথে সাথে?

* সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে (কলিকাতা, ১ ডিসেম্বর, ১৯২৮)।

জাগা, ঘুমা, নেশা তাহার লিখায়েছ কি তারি হাতে ?
অচেতন দেশটী তোমার, তাই অচেতনের বেদনা
হয়েছে কি বাঙালীর একমাত্র বিজ্ঞান-সাধনা ?
যন্ত্রে ধরেছ, হে যন্ত্রবীর, অচেতনের স্পন্দন-সুর,
তোমার দেশের সাড়াও তাই বিশ্ববাসী পাচ্ছে দূর।
এক জগদীশ নও ভারতের তুমি সে সাড়ার ফলে,
হাজার জগদীশ আজ মায়ের কোলে আধ' আধ' কথা বলে।

নিউ ইয়র্কের পথে (জাহাজ-বক্ষে), নবেম্বর ১৯১৪

বিজ্ঞান-বীর জগদীশচন্দ্র

গম্ভীর বদন তোমার স্থিরনেত্র জগদীশ,
প্রশান্ত হাসিতে তোমার দেখিনা হরিষ।
বেদনার মূর্ত্তি তুমি ওহে সেনাপতি,
সৃষ্টিকর্ত্তার অহঙ্কারে ভরা তোমার মতি।
বাড়াতে চেয়েছ তুমি সীমানা এ দুনিয়ার,
ডেকেছ মল্লযুদ্ধে অন্ধকারে বসুধার।
ঘোর বিপদেরে তুমি বরিয়াছ সাথী,
নির্ভয়ে আকুল হিয়া রাখিয়াছ তায় গাঁথি।
জয়ের জন্য লালায়িত নও চাও পরাজয়,
বিফলতা-নৈরাশ্যেই শক্ত যে হৃদয়।
ধ্যানমগ্ন আঁখি তোমার, উদ্বিগ্ন অন্তর,
শোকে ভরা মহানন্দ প্রাণের সহচর।
ছড়াও স্বদেশে সংগ্রাম, শক্তিযোগ ধীর,
আর বেদনা বিরাট তোমার হে বিজ্ঞান-বীর।

প্যারিস, ১৯২১

৩। স্বদেশনিষ্ঠ কর্ম্মবীর মেজর বামনদাস বসু *

মেজর বামনদাস বসু সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন কয়েকখানা বড় বড় বইয়ের লেখক হিসাবে। কিন্তু এই বই লেখালেখির ভিতরে, পশ্চাতে ও উপরে ছিল তাঁহার বিপুল স্বদেশ-নিষ্ঠা আর চূড়ান্ত স্বদেশ-সেবকের অদ্ভুত কর্ম্মপটুত্ব। বাংলাদেশে, বাংলার বাহিরে আর ভারতের বাহিরে যে কয়জন ভারতসন্তান আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্বদেশসেবার নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মোতায়েন আছেন মেজর বসু ছিলেন তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম।

যুবক ভারতের বহুসংখ্যক বাঙালী-অবাঙালী চিন্তাশীল ও কর্ম্মনিষ্ঠ লোক মেজর বসুর সংস্পর্শে আসিয়া আত্মিক হিসাবে লাভবান হইয়াছেন। মেজর বসুকে নানা সদনুষ্ঠানের ও তাজা তাজা আন্দোলনের উৎস হিসাবে শ্রদ্ধা করেন যুবক ভারতের অনেক লোক। এই সূত্রে তাঁহাকে নিজের পরম আত্মীয় বিবেচনা করাও অনেক ভারতবাসীর দস্তুর।

মেজর বসু যৌবনেই চাকরি ছাড়িয়াছিলেন। চাকরি ছাড়ার সঙ্গেও তাঁহার স্বদেশানুরাগ সুজড়িত।

সর্ব্বদাই মেজর বসুর মাথায় দেশোন্নতি-বিষয়ক দু'একটা নতুন নতুন চিন্তা বা কর্ম্মপ্রণালী খেলা করিত। এই জন্য সর্ব্বদাই তিনি উৎসাহশীল, কর্ম্মপটু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবার ধান্ধায় থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনই কোনো যুবা দুএকটা ছোট বড় মাঝারি নতুন কাজের বরাত না পাইয়া ফিরিয়াছে কিনা সন্দেহ। বরাত-মাফিক্ কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছে কয়জন সেকথা স্বতন্ত্র।

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৩১)

তাঁহার দাদা শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে তিনি এলাহাবাদে পাণিনি আফিস কায়েম করেন। এই কার্য্যালয়ের আসল কাজ ছিল প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ইংরেজি ভাষার সাহায্যে প্রচার করা। কিন্তু মেজর বসুর নিজ গবেষণার প্রধান বস্তু ছিল বর্ত্তমান ভারত। উনবিংশ শতাব্দীর "আধুনিক" ভারতীয় চিকিৎসকগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার ইতিহাস সঙ্কলন করার দিকে তাঁহার একটা বড় ঝোঁক ছিল। এই ঝোঁকের ভিতরও তাঁহার স্বদেশনিষ্ঠা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারিত আর ভারতের অন্যান্য গাছগাছড়ার ওষুধ-গুণ আলোচনা করিয়া তিনি ও তাঁহার মারাঠা বন্ধু কীর্ত্তিকার ভারতীয় চিকিৎসা-পণ্ডিত ও ওষুধ-ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রের গবেষণায় তাঁহাকে অদ্বিতীয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাঁহাকে "দুহিয়া" লইতে পারিলে এক সঙ্গে দশ বার জন পণ্ডিত বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস রচনায় যশস্বী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিজের লেখা যে কয়খানা বই বাহির হইয়াছে সেই সব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অনেকেই বিদ্যাক্ষেত্রের আর কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য নয়া নয়া হদিশ পাইবেন। তাঁহার কোনো কোনো রচনার সঙ্গে রমেশ দত্ত প্রণীত বর্ত্তমান ভারত বিষয়ক রচনাবলীর তুলনা করা চলে। কিন্তু বামনদাস বসু আর রমেশ দত্ত পূরাপূরি এক গোত্রের লেখক নন। দুয়ে প্রভেদ প্রচুর।

মেজর বসুর সঙ্গে আমার অতি-নিকট যোগাযোগ ছিল। সেকালে তাঁহার বাড়ীকেই আমি নিজের বাড়ী বিবেচনা করিতাম। প্রথমবারকার প্রবাসকালে তাঁহার সঙ্গে চিঠি-পত্র চলিত সর্ব্বদা। প্রত্যেক চিঠিই

কাজের চিঠি। দুঃখের কথা একটাও বাঁচাইয়া রাখি নাই। ১৯২৫ সনের শেষের দিকে দেশে ফিরিয়া তাঁহাকে সেই ১৯১১-১৪ সনের উৎসাহ-শীল ভাবুকতাময় স্বদেশনিষ্ঠ আন্তরিকতাপূর্ণ মেজর বসুই দেখিয়াছিলাম। এই কথা অন্যান্য বহুলোকের সম্বন্ধেই বলিতে পারি না। মেজর বসুর বিশেষত্ব যারপর নাই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

একালের কয়েকজন উৎসাহী করিৎকর্ম্মা যুবাদের জন্য মেজর বসুর সঙ্গলাভ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। যুবাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কাজের বরাত দিবার জন্য তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই সামান্য সঙ্গলাভেও যুবারা একজন শ্রেষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ কর্ম্মবীরের জীবন স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয়বারকার প্রবাসেও মেজর বসুর অনেক চিঠি পাইয়াছি। সবই কাজের কথায় ভরা। এবারও কোনো চিঠি রাখি নাই। মেজর বসুর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না এইজন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছি।

মিউনিক, জার্ম্মাণি, নবেম্বর ১৯৩০

৪। যৌবন-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ *

সত্তর বৎসরের মুখে মুখে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ ইয়োরামেরিকার খোলা বাজারে নিজ হাতের আঁকা ছবি ছাড়িয়াছেন। লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক, মস্কো, নিউ-ইয়র্কের নরনারী ১৯৩০ সনে দেখিল যে, সত্তর বৎসর বয়সের বুড়া বাঙালী একজন ছোকরার মতন আত্মহারা হইয়া ছবি

* "জয়ন্তী-উৎসর্গ" গ্রন্থে প্রকাশিত (১৯৩১)।

আঁকিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা নয়া-শিল্পের আসরে স্রষ্টারূপে দেখা দিতে সাহসী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ চৌষট্টি বৎসর বয়সে "রক্ত-করবী"র লাল রঙে নিজ প্রতিভা রাঙাইয়া তাহার সঙ্গে নবজাগ্রত মজুর-বিশ্বের আত্মীয়তা কায়েম করিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। "ফাল্গুনী"র নাচ-গানে মাতিতে পারিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে।

আর ১৯০৫ সনের ভাবুকতায় যখন যুবক বাংলার জন্ম হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স গোটা পয়তাল্লিশ। সেই বয়সেও তিনি রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া হাজার হাজার ছোক্‌রা ও বুড়াকে গান গাওয়াইয়া ভারতে স্বাধীনতার ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলেন।

তাহার আগের কথা আজ তুলিব না। রবীন্দ্র-জীবনীর এই তারিখ ও তথ্য কয়টা বাঙালীর জীবনবত্তার ইতিহাসে অমূল্য। পয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রোজ রোজ নতুন নতুন আগুন জ্বালিতে পারিয়াছেন। আর সেই আগুন জ্বালিয়া বাঙালীকে এশিয়াবাসীকে আর বিশ্ববাসীকে নানা আকার-প্রকারে তাতাইতে পারিয়াছেন। বিশেষ কথা, নিজেও সঙ্গে সঙ্গে আগেই তাতিয়াছেন। জীবন ভরিয়া এইরূপ তাতিবার আর তাতাইবার ক্ষমতা মানব-দুর্লভ। দুনিয়ার যৌবনশক্তি যুগে-যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভায় তাজা তাজা মূর্ত্তি পাইয়া অমরতা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-শিল্পকে কেহ ভাবে পূরবী, কেহ বা সমঝিয়া রাখিয়াছে পশ্চিমা, আবার কাহারো কাহারো মতে উহা পূরবী-পশ্চিমার খিঁচুড়ি। রবীন্দ্র-সংসারে কেহ ঢুঁড়িতেছে সূত্র, কেহ ঢুঁড়িতেছে পঞ্চায়ৎ, বারোয়ারী তলা অথবা জয়েন্ট ষ্টক কৌশল চালাইবার কর্ম্মকৌশল। কেহ বা পাইতেছে, কেহ বা ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া হয়রাণ হইতেছে মাত্র। রবীন্দ্র-শিল্প

কোনো কোনো আড্ডায় স্বদেশ-সেবার পাঁতি জোগাইয়া থাকে। আবার কোনো কোনো মজলিশে উহা বিশ্ব-সেবার হেঁয়ালি মাত্রে ভরা। আর এই সকল মামলায় যাঁর যখন যেমন মর্জ্জি বা খেয়াল তখন তিনি তেমন রবীন্দ্র-সৃষ্ট দুনিয়ার দর কষিতে প্রবৃত্ত হন।

রবীন্দ্র-সৃষ্টি পূরবী-পশ্চিমা, সূত্র-কর্ম্মকৌশল, স্বদেশ-বিদেশ ইত্যাদি সব কিছুই বটে, অথচ আবার এই সবের কোনো একটার গর্ত্তে পড়িয়া রবীন্দ্র-শিল্প কানার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না। জ্যান্ত চোখে দুনিয়া ভাঙিবার ও গড়িবার শক্তি রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বধর্ম্ম। এই সৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেই আমার বারে বারে মনে হয় :—

সুনীতির কুনীতির তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের পারাবার,
বিশ্বকোষ ঘাঁট্‌তে বসে' লোকে করছে হাহাকার!

রবীন্দ্রনাথকে কোনো ফর্ম্মুলায়, কোনো বাঁধিগতে আটকাইয়া রাখা চলিবে না। কোনো শাসন-প্রণালীর মারপ্যাচে এই স্বচ্ছন্দ গতিশক্তিকে পাকড়াও করা সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবন বা যৌবন,—জীবনের ধারা, যৌবনের স্রোত,—সৃষ্টিশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছেন,—প্রতিদিনই জগৎকে রূপে-রঙে বাড়াইয়া চলিয়াছেন,—প্রতিদিনই অনন্ত যৌবনের সৃষ্টিক্ষমতা চাখিয়া ধরাতলকে তাহার স্বাদ পরিবেশন করিতেছেন। দশকের পর দশক ধরিয়া দেশ-বিদেশের যুবারা আর যৌবনশীল প্রবীণেরা এই মহাযুবার তালে তালে রকমারি উদ্দীপনা লাভ করিতেছে।

এইরূপ বিশাল-প্রাণ, অসীম যৌবন-সম্পন্ন বিশ্বগ্রাসী মহাযুবা দুনিয়ার শিল্প-সংসারে বড় বেশী নাই। রবীন্দ্রনাথের জুড়িদার এক ছিল বৈচিত্র্যশীল জটিলতাপূর্ণ জার্ম্মাণ সন্তান গ্যেটে। এই আসরে আর একজনের নামও মনে পড়িতেছে। সে ফরাসী সাহিত্যবীর ভিক্তর উগো।

রোম, ইতালি, ১৯ মার্চ্চ, ১৯৩১

৮। জর্জ্জ ওয়াশিংটন *

(ক) বঙ্গীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন স্মৃতি-পরিষৎ

১৯৩২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মদাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্মতিথি দুই শতাব্দী পূর্ণ করিবে। এই উপলক্ষ্যে মার্কিন নর-নারী আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ও জগতের নানাস্থানে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছে। বিভিন্ন ছোট বড় মাঝারি দেশের নর-নারীও স্বাধীনভাবে এইরূপ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। এই আন্তর্জ্জাতিক উৎসবে যোগদান করা ভারতীয় নর-নারীর পক্ষেও বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের কোনও একটা বা কয়েকটা দিন এই জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা যাইতে পারে। ভারতীয় সার্ব্বজনিক জীবনের প্রাদেশিক ও অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রে "জর্জ্জ ওয়াশিংটন তিথি" পালিত হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা মাফিক অনুষ্ঠানের আকার প্রকার যথাসময়ে বাছিয়া লইলেই চলিবে।

অধিকন্তু একটা অনুষ্ঠানের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় এক একখানা বই প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহার ভিতর থাকিবে আমেরিকার রাষ্ট্র, শিল্প-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন ইত্যাদি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ। জর্জ্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে দুই একটা রচনাও চাই, বলা বাহুল্য। তাহা ছাড়া

* "ফ্রী প্রেস অব ইণ্ডিয়া"র মারফৎ অমৃত বাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার, অ্যাড্ভান্স, দৈনিক বসুমতী, লিবার্টি ইত্যাদি বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক পত্রিকায় প্রকাশিত। এই প্রস্তাব অনুসারে পরিষৎ গঠিত হইয়াছে।

যুবক ভারতের জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্ম্মকাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতখানি ও কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার আলোচনা থাকাও দরকার। এই প্রস্তাব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সহজেই গৃহীত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত বিষয়গুলি মাল ও লেখক হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হইবে। কোনও একটা মূল ভারতীয় রচনার তর্জ্জমারূপে এইগুলা প্রকাশ করা হইবে না, ইহাও জানিয়া রাখা ভাল। তবে প্রত্যেক ভাষায়ই বইয়ের নাম রাখা যাইতে পারে নিম্নরূপ—"জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও আমেরিকা।"

এই সঙ্গে আর একটা প্রস্তাব পেশ করা যাইতেছে। ১৯৩২ সনের ভিতর ভারতীয় প্রকাশক ও সম্পাদকগণ তাঁহাদের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিকের একটা "জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও আমেরিকা সংখ্যা" প্রকাশ করিতে পারেন। ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন তিথির উল্লেখ করা দরকার হইবে। আর সেই সঙ্গে কোন্ তারিখে বিশেষ সংখ্যাটা বাহির হইবে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করাও ভাল।

ভারতের সার্ব্বজনিক সভা-সমিতি, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান-পরিষৎ, শিল্প-বাণিজ্যভবন, গ্রন্থালয় গবেষণা-গৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার দেশকে সম্বর্দ্ধনা করার গৌরব সহজেই অনুভূত হইবে আশা করিতেছি। এই উৎসবে যোগদান করিলে মার্কিন নর-নারীর সঙ্গে ভারতীয় নর-নারীর আত্মীয়তা আরও খানিকটা নিবিড়তর হইয়া উঠিবে, এই বুঝিয়া দেশের জননায়কগণ নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে যথোচিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে উৎসাহী হইবেন, এরূপ ভরসা আছে। শীঘ্রই বাঙ্গলা দেশের জন্য "বঙ্গীয় জর্জ্জ ওয়াশিংটন স্মৃতি পরিষৎ" নামে একটা নাতিবৃহৎ সংগঠন-সভা কায়েম হউক। ইতি—

কলিকাতা, নবেম্বর ১৯৩১।

(খ) ভারতে ওয়াশিংটন-উৎসব ও আগামী ইন্দো-মার্কিন লেনদেন

ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্মভূমি। দেশটা জর্জ্জ ওয়াশিংটন নিজের হাতে গড়িয়া তুলেন। ইয়াঙ্কি নরনারীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং জাতীয় জীবনের ধারা পাকড়াও করিবার জন্য ভারতীয় নর-নারীর আগ্রহ প্রচুর। আমেরিকার আর্থিক জীবনের গতিভঙ্গী, মার্কিণ বাণিজ্যনীতির ধরণধারণ, ইয়াঙ্কি ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল ভারতবর্ষের বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিদিগের কর্ম্ম ও চিন্তা প্রণালীর পক্ষে বিশেষরূপেই মহত্বপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। কেন না আমেরিকা ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের একজন বড় খরিদ্দার। আমাদের দেশবাসী আমেরিকার বাজারে পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, লাক্ষা, নানা ধরণের বীজ, চা, লোহালক্কড় ইত্যাদি চিজ রপ্তানি করে। মোট রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য প্রতি বৎসর ২১১,৪০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমগ্র রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯·৪ ভাগ। আমদানী বাণিজ্যের তরফে আমরা দেখিতে পাই, মার্কিণের হিসাব শতকরা ৯·২ ভাগ। আমেরিকা প্রতি বৎসর ভারতবর্ষকে ১৫১,২০০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করে। ভারত মার্কিনের নিকট হইতে খনিজ তৈল, মোটরগাড়ী, যন্ত্রপাতি, রবার, কার্পাস তুলা, লোহা লক্কড়ের তৈয়ারী জিনিষ, কল-কব্জা ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় করে। এই সমস্ত চিজ আমাদের স্বদেশী শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষকে ক্রমে আধুনিক ধন-দৌলতের দেশে পরিণত করিতেছে। মোট কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ভারতের মধ্যে ফি সন লেন-দেন চলিতেছে ৩৬২,৬০০,০০০ টাকার। অর্থাৎ প্রত্যেক ভারতবাসী মার্কিণ কৃষি, কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে এক টাকা দুই আনার দরের কারবার চালাইয়া থাকে।

ইয়াঙ্কিস্থানে আর ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। লড়াইয়ের পূর্ব্বে ভারতের মোট আমদানীরপ্তানী-বাণিজ্যে মার্কিণের হিস্যা ছিল মাত্র শতকরা ৫·৮ ভাগ, বর্ত্তমানে এই হিস্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৯·৩ ভাগ।

ভারতবর্ষের সহিত মার্কিনের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতেছে। আমেরিকাবাসীর আর ভারতবাসীর পরস্পর-সাপেক্ষতা সমসাময়িক বিশ্বদৌলতের একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় মার্কিন যেমন ভারতবর্ষকে চায়, ভারতবাসীও ঠিক তেমনি আমেরিকাকে চায়। এই দুয়ের পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি তীক্ষ্ণতর ও দৃঢ়তররূপে বাড়িয়া চলিয়াছে।

আর্থিক ভারতের সহিত মার্কিন ব্যবসায় জগতের এই যোগাযোগ কেবল মাত্র ভৌতিক বা বৈষয়িক লেনদেনেই আবদ্ধ নয়। আত্মিক তরফ হইতেও ভারতের সহিত মার্কিনের কম যোগাযোগ সাধিত হয় নাই। আমাদের দেশের অনেক এঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিৎ, ব্যাঙ্কওয়ালা এবং ব্যবসাদারের শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যান ধারণা এবং অভিজ্ঞতা সমস্তই মার্কিন মুলুকের নিকট ঋণী।

বিহার প্রদেশে অবস্থিত পুষার সরকারী কৃষি কলেজের নাম সকলেরই সুবিদিত। জনৈক আমেরিকাবাসীর বদান্যতায় ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সনে বিবেকানন্দের শিকাগো প্রবাস আর ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে ক্রমেই আমেরিকার নরনারী ভারতবাসীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছেন। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় পর্য্যটক, ব্যবসাদার এবং পণ্ডিতগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমেরিকা সুমত পোষণ করিতে অভ্যস্ত। মার্কিন সমাজের বহু পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কুঠি, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গণ্ডাগণ্ডা

ভারতীয় ছাত্র ও গবেষককে প্রেরণা প্রদান করিয়া উহাদিগকে বড় হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতে ইন্দো-আমেরিকান বাণিজ্য-সম্পর্ক আরও নিবিড় হইয়া উঠিবে, এবং এই বাণিজ্যের পরিধি আরও প্রশস্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ ধারণা করিবার কারণও রহিয়াছে যথেষ্ট। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে শিল্প-জগতে মার্কিন মুলুকের সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। আর্থিক জগতে একটি বড় শিল্প-শক্তিরূপে আমেরিকার আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এতদিন ধরিয়া দুনিয়ার সিক্কার বাজারে একটি মাত্র কেন্দ্র ছিল, আজ আর সেই অবস্থা নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে লণ্ডনের ছিল একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু দুই গোলার্দ্ধের আর্থিক কেন্দ্ররূপে লণ্ডনের ইজ্জৎ আজ অতীতের বস্তুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বিশ্বদৌলত এখন অন্যান্য কেন্দ্র হইতেও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। একটি কেন্দ্র সম্ভবতঃ ইয়োরোপে অবস্থিত। প্যারিস কিম্বা আমষ্টার্ডাম ইয়োরোপের এই আর্থিক কেন্দ্র, এমন কি বার্লিন সহরকে পর্য্যন্ত আর্থিক কেন্দ্ররূপে ধরা যাইতে পারে। দুনিয়ার অপর আর্থিক কেন্দ্রটি আটলান্টিকের পরপারে নিউইয়র্ক সহরে অবস্থিত। বর্ত্তমানের বহুকেন্দ্রবিশিষ্ট বিশ্বদৌলত ক্ষেত্রে নিউইয়র্কের আবির্ভাব অতি অল্প দিনের বস্তু এবং ইহার বিকাশ সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ইয়াঙ্কি নরনারীর জাতীয় জীবনধারা নানা মুখে প্রধাবিত হইয়াছে। মার্কিণ সম্প্রসারণের ধারা এবং গতির দিক এখনই কিছু বুঝা যাইতেছে। মন্‌রো-নীতি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম গোলার্দ্ধ আমেরিকার এইরূপ বিস্তার ত দেখিবেই। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সম্প্রসারণ ইয়োরোপেও আত্মপ্রকাশ করিতে চলিল। পরবর্ত্তী দশক দু'এক ধরিয়া গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি এই মার্কিণ সম্প্রসারণের প্রতিই নিবদ্ধ থাকিবে। মানব জাতির আর্থিক প্রচেষ্টা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর আমেরিকার প্রভাব

ফুটিয়া উঠিতেছে। ছনিয়ার মার্কিনীকরণ বর্ত্তমান যুগের এক অতি বড় ঘটনা।

"বল্‌কান্ চক্রে"র অন্তর্গত দেশগুলিতে, পূর্ব্ব ইয়োরোপে এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় আজ নবজাগরণের উন্মেষ দেখা যাইতেছে। মৃতপ্রায় এই দেশ-সমূহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে কোন্ কোন্ রুধির? প্রধান রুধির আমেরিকার পুঁজি এবং আমেরিকার মগজ। মহাযুদ্ধের অবসানে এই সমস্ত দেশে এবং ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলে শিল্প সাধনা, যন্ত্রনিষ্ঠা, প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন-প্রণালী, সামাজিক ও আর্থিক সাম্য ইত্যাদির আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার আগায় ও পাছায় দেখিতেছি আমেরিকা। মার্কিন মুল্লুকের অর্থ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঞ্জীবনী পরশ দ্বারা ইয়োরোপের অনগ্রসর দেশগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে।

ছনিয়াজোড়া আমেরিকার এই প্রভাবের হাওয়া ভারতের গায়েও লাগিবে। আজ ইয়োরোপ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ভারতেও উহা আসিতেছে। আমেরিকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জীবনযাত্রার মাপকাঠি, কর্ম্মদক্ষতা, মজুরদের জীবনধারণপ্রণালী সবই আজ গোটা ছনিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত। ভারত যেদিন আত্মসম্মান বাঁচাইয়া আমেরিকার সহযোগিতা লাভ আর মার্কিন পুঁজি গ্রহণ করিবে, সেদিন ভারতেরও মরা গাঙে বান ডাকিবে। ভারতের হস্তশিল্প, ছোট মাঝারি কলকারখানা, চাষ আবাদ, গ্রাম্য এবং নাগরিক জীবন ইত্যাদি সমস্ত বস্তুতে নূতন কর্ম্মশক্তির, নয়া প্রেরণার আবির্ভাব হইবে। ভারতবর্ষও ছনিয়ার অন্যান্য অংশের মত মার্কিনীকৃত হইতে থাকিবে। ভারতে নানা প্রকারের শিল্প কায়েম হইতে থাকিবে, লক্ষ লক্ষ কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকলেরই ক্রয়শক্তি বাড়িয়া চলিবে। এককথায় ভারতে জগৎ-প্রসিদ্ধ "প্রথম শিল্পবিপ্লব" পরিণতি লাভ করিবে। তাহার এক বড় কারণই থাকিবে আমেরিকায় "দ্বিতীয় শিল্প-

বিপ্লবের” আত্মপ্রকাশ। এই দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের লক্ষণ হইবে আমেরিকার শিল্পবাণিজ্যে “যুক্তিযোগ”। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে দেখিব যে, আমেরিকা জগতের অনুন্নত দেশসমূহে পুঁজি, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক আর যন্ত্রপাতি (অর্থাৎ ধনোৎপাদনের উপায় সমূহ) রপ্তানি করিতেছে।

ভারতীয় নরনারী জর্জ্জ-ওয়াশিংটনের দ্বিশততম জন্মতিথির উৎসবে যোগদান করিতেছে। ইন্দো-মার্কিণ লেনদেনের ইতিহাসে এই ঘটনাটি উজ্জ্বল পথচিহ্নরূপে বিরাজ করিবে।

ওয়াশিংটন তিথি পালিত হইবার পর হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে ইন্দো-আমেরিকান কর্ম্ম ও ভাববিনিময় চলিতে থাকিবে। ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের ভিতর আমেরিকার ইজ্জৎ এতদিন যতখানি ছিল এখন হইতে তাহার চেয়ে বেশী ইজ্জৎ দেখা যাইবে। আবার মার্কিন নরনারী ও তাহাদের স্বরাজ, স্বাধীনতা, আর্থিক ভাবুকতা ও সমাজধর্ম্ম-বিষয়ক শক্তিযোগের ক্ষেত্রে এতদিন ভারতীয় নরনারীর জন্য যতটা ঠাঁই ও সময় রাখিত, তাহার চেয়ে বেশী ঠাঁই ও সময় রাখিবার দিকে তাহাদের মতিগতি খেলিতে থাকিবে।

দেখা যাইতেছে যে, বৃহত্তর ভারত আর বৃহত্তর আমেরিকা এক নয়া কর্ম্মমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গঠনমূলক আন্তর্জ্জাতিকতার পথ পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইল। জগৎ নতুন ঢঙে গড়িয়া উঠিবার অবসর পাইতে চলিল।

৬। গ্যেটে*

অতি বিচিত্র জীবন তোমার জার্ম্মাণ সন্তান !
গরমিল ও দ্বন্দ্বের মাঝে মিশেছিল তব প্রাণ।
সেরা কবি তুমি নিশ্চয় তবু বিজ্ঞান-ইতিহাসে
উদ্ভিদস্থির মাপজোকে তব কীর্ত্তি আজিও ভাসে।
স্বপন-দেশের অধিবাসী তুমি সঙ্গী কল্পনার।
হ্বাইমার রাজসভাতেও হাত দেখায়েছ আপনার।
বিরাট তৃষাতে সুন্দরী-প্রেম চেখেছিলে নিতি নব
আবেগপূর্ণ প্রেমেতে পাগল প্রতিবারই অভিনব !
হ্বিল্‌হেল্‌ম্, ফাউষ্ট, হ্ব্যার্টার, হার্ম্মাণ, তোমারি প্রেমকাহিনী,
নিজ কথারই কাঠামোতে দেছ এই নিখিলের বাণী।
ভাবে মাতোয়ারা শিলার বন্ধু ঠিক যেন তব ভাই,
সখার ব্যাকুল ভাবেতে তবুও একদিনও মাতো নাই !
স্বজাতি-শত্রু বোনাপার্ট যে, হইলে মিত্র তার,
স্বদেশী হুজুগে দাওনি তো যোগ, স্রষ্টা স্বাদশিকতার !

* বঙ্গীয় গ্যেটেস্মৃতি পরিষদের অনুষ্ঠিত উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত "গ্যেটে-সাহিত্য ও জার্ম্মাণ কৃষ্টরের এক ছটাক" পুস্তিকা (১৯৩২) হইতে উদ্ধৃত। প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল "আত্মশক্তি" সাপ্তাহিকে (১৯২৮)।

৭। বিবেকানন্দ *

যুবক ভারতে দেখায়েছ তুমি নব জীবনের পথ,
ভারতে স্বাধীন চিন্তাধারার তুমি বীর ভগীরথ!
বিশ্ববাসীরা চমকিল তব উদাত্ত আহ্বানে,—
হঠাৎ আবার ভারতের সাড়া কেন দুনিয়ার কানে?
বিরাট দুনিয়া চাহিছে এখনো ভারতের মহাদান,
হুঙ্কারে তব জাগিয়া উঠিল ভারতের সন্তান।
নব বিশ্বের নানান্ অভাব বিদূরিত করিবারে
এই জগতের কর্ম্মক্ষেত্র ডাকিছে আবার তারে?
সিংহের মতন সাহস তোমার, বাঘের দীপ্ত নয়ন,—
এই তেজেতেই করবে ভারত জগৎ সংগঠন।
বেদান্ত আর শাস্ত্রমহিমা বুঝেছিলে কিনা স্বামি,
লভেছিলে কিনা গোপনতত্ত্ব, জানিনে কিছুই আমি।
জীবন-বেদের গোড়া আঁকড়ায়ে ধরেছিলে বীরবর,
সেই ওঙ্কারে তাজা প্রাণ এলো, ভারতে যুগান্তর!

বীর পূজা করা আমার স্বধর্ম্ম †। তরুণ বাংলার বিশ্ববিজেতা বিবেকানন্দের প্রতি দেশবাসীর মন আকৃষ্ট করিতে আমি কয়েকবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে, তখনও বিবেকানন্দ-আন্দোলনের প্রকৃত

* বিবেকানন্দের সপ্ততিতম জন্মোৎসব-সভায় সভাপতির আসন হইতে পঠিত (৩১ জানুয়ারি ১৯৩২)। "উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রকাশিত।

† উপরোক্ত সভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ ("উদ্বোধন" বৈশাখ, ১৩৩৯)। সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছিল বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন কর্ম্মকর্ত্তা কর্ত্তৃক।

স্ফুরণ হয় নাই, আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম,—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে রামকৃষ্ণের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের আত্মসংযম, আত্মোৎসর্গ ও সমাজসেবা বর্ত্তমান শতাব্দীর জনসাধারণের জীবন্ত ধর্ম্ম হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি বিবেকানন্দকে নব্য ভারতের কার্লাইল আখ্যা দিয়া থাকি এবং নেপোলিয়নের ন্যায় শক্তিশালী ও বীর বলিয়া সম্মানিত করি। তিনি সদর্পে পাশ্চাত্যের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণী এবং কার্য্যধারার একখানি বিশ্বকোষ প্রণীত হইতে পারে। পালোয়ানের মত চেহারা, স্বাস্থ্যবান, শক্তি-শালী, শরীর-ধর্ম্মে অদ্বিতীয়। এমন কি খাওয়াতেও কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন কলানুরাগী, কবি, গায়ক এবং বাদক। তাঁর ছিল তীব্র ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা। ভ্রমণের দ্বারায় তিনি প্রতি প্রদেশের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় সারাজগৎ ভ্রমণ করিয়া মানুষের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা সম্যকরূপে অবগত হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর বক্তা এবং উচ্চশ্রেণীর লেখক। বাঙ্গলা সাহিত্যকে তিনি শক্তিপ্রদ ভাষায় সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন এবং চল্‌তি কথায় তিনি বাঙ্গলাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একদিকে গবেষণাকারী ও অনুবাদক, অপরদিকে সমালোচক এবং তত্ত্ব প্রচারক। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায়ই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে শিক্ষিত ছিলেন এবং খৃষ্ট-দীক্ষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাত্যের সমাজ আর পাশ্চাত্যের আদর্শের জ্ঞানও তাঁহাতে সমপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। অতীতকে তিনি ত্যাগ করেন নাই অথচ বর্ত্তমানের নিরেট অবস্থার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্ম প্রচার ও সমাজসংস্কারে তিনি নিজকে সম্পূর্ণভাবে লীন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম ছিল অসাধারণ ও বিশাল। এমন কি তিনি একজন সমাজতান্ত্রিকও ছিলেন। তবে তাঁহার

সমাজতন্ত্র মার্ক্সের ন্যায় নহে। তা ছিল ফরাসী সাঁসিমঁ'র মত অথবা জার্ম্মাণযৌবন-আন্দোলনের ঋত্বিক ফিখটের মত। তিনি চাহিয়াছিলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবা প্রচার করিতে। একদিকে তিনি ছিলেন একজন অদ্বিতীয় জাতীয়তানিষ্ঠ আবার অন্যদিকে আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী। সমগ্র জগৎকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিবার জন্য তিনি সমস্ত ধর্ম্মের ও সমাজের সার্ব্বজনীন ও মানবতা-প্রকাশক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ চল্লিশ বৎসর বয়সে মানব-লীলা সংবরণ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার মাতৃভূমির জন্য এবং জগতের জন্য তিনি এত বেশী কার্য্য করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে আমরা যৌবনশক্তির অবতার বলিতে বাধ্য।

কেহ তাঁহাকে কর্ম্মবীর বলিয়া সম্মান করে; কেহ বা ত্যাগী বলিয়া সম্মান করে; কেহ বা ভক্তরূপে, কেহ জ্ঞানীরূপে আবার কেহ বা যোগী বলিয়া সম্মান করে। তিনি ছিলেন একজন পূর্ণমাত্রায় আদর্শ-বাদী; তাঁহার সমস্ত জীবনটাই ছিল অতীন্দ্রিয়ের সাধনা বিশেষ। আবার তিনি বাস্তবনিষ্ঠদিগের অগ্রণী এবং বাহ্য জগতে তাঁর ছিল সম্পূর্ণ আস্থা। রামকৃষ্ণকে বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধ বলিলে, স্বামীজি বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের যথা—পণ্ডিত রাহুল, ব্যবস্থা-শাস্ত্রবিৎ উপালি, ভক্ত সেবক আনন্দ, ঋষি সারিপুত্ত এবং তর্কশাস্ত্রবেত্তা মহাকচ্চায়ন— প্রত্যেকের এবং সমষ্টির সহিত উপমিত হইতে পারেন। এই সকল বুদ্ধ-শিষ্যের প্রচার-সংগঠন প্রভৃতি সকল শক্তি একা বিবেকানন্দের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধরণের একটা বিশ্বকোষ আওড়াইয়া গেলেও বিবেকানন্দের জীবনকথা সমগ্র এবং যথেষ্টরূপে বলা হয় না। কেননা তিনি শুধু বেদান্তকে প্রচার করেন নাই, রামকৃষ্ণকে প্রচার করেন নাই, হিন্দুধর্ম্মকে প্রচার করেন নাই, এমন কি ভারতীয় কৃষ্টিকেও প্রচার করেন নাই—পুরাকালের জ্ঞানার্জ্জন,

অতীত ও বর্ত্তমানের চিন্তাধারার অনুবাদ, অথবা কতকগুলি হিন্দু আদর্শের প্রচার মাত্রই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম ছিল না। সকল প্রকার চিন্তা এবং কার্যাধারার মধ্য দিয়া তিনি প্রচার করিয়াছিলেন নিজকে। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার উপলব্ধি সকল মানব সমক্ষে ধারণ করিতেন। নিজ জীবনে তিনি যে সকল সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার সাহিত্য এবং সঙ্ঘের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রের স্রষ্টা হিসাবে তাঁহাকে মার্কিণ ডুয়ী, ইংরেজ রাসেল, ইতালিয়ান ক্রচে, জার্ম্মাণ স্প্রাঙ্গার ও ফরাসী ব্যর্গসঁর পার্শ্বে আসন দিলে দার্শনিক বিবেকানন্দের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয়। সাধারণ পণ্ডিতবর্গ, যাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য প্লেটো, অশ্বঘোষ, প্লটিনুস্, নাগার্জ্জুন, একুইনস্ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতামত প্রচার করা, অনুবাদ করা, ব্যাখ্যা করা—স্বামীজিকে তাঁহাদের ন্যায় মনে করিলে ভুল ধারণা হয়। শিকাগোর ধর্ম্মমেলায় (১৮৯৩) এই তিরিশ বৎসরের বাঙ্গালী যুবক তাঁহার অসীম জ্ঞান লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর এবং সমগ্র জগতের একত্রিত জ্ঞানের সমক্ষে দাঁড়াইলেন। তিনি যে আদর্শ ধরিলেন তাহার দ্বারা মানবের অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। মানবকে তাঁহার একটা বার্ত্তা দিবার ছিল। এই ধর্ম্মমেলায় বেদান্ত, হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচারের জন্য তাঁহার প্রতিভা দীপ্ত হয় নাই—হইয়াছিল নব্য আদর্শের প্রতিষ্ঠাতারূপে, নূতন চিন্তাপ্রেরকরূপে —যাহা ভবিষ্যতে জগতের মানব-মনে প্রভুত্ব করিতে বাধ্য।

আচ্ছা, তাহা হইলে বিবেকানন্দের স্বরূপটা কি? তাঁহার বক্তৃতায় তিনি কোন্ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন? জগতে তাঁহার দানের মর্ম্ম তাঁহার পাঁচটি শব্দে প্রকাশ করা যাইতে পারে। তিনি মাত্র পাঁচ শব্দেই জগৎ জয় করিয়াছিলেন। "ঈ চিল্‌ড্রেণ অব্ ইম্‌মর্ট্যালিটি! সিনার্স?" "হে (তোমরা) অমৃতের সন্তানগণ! পাপী?"..... প্রথম

চারিটি শব্দ জগতে আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল—প্রাণে আশা পুরুষত্ব, শক্তি এবং স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছে ; এবং শেষ শব্দটি ভীরুতা, নেতিমূলক নৈরাশ্যবাদ, যাহা মানুষের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে, তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াই ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিস্ময়াবিষ্ট জগতে এই সামান্য কথাটি বোমার মতন পড়িল। প্রথম চারটি শব্দ তিনি প্রাচ্য হইতে আনিয়াছিলেন এবং শেষ শব্দটী প্রতীচা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই শব্দগুলি প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মানবের চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের মত এরূপ ভীষণ ভাবে কেহ এই দুই তরফকে একত্র স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং অবিলম্বে বিশ্বজয়ীরূপে অনুমোদিত হন নাই।

বিবেকানন্দ শক্তিনিষ্ঠা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন জগতের উপর আধিপত্য করিতে। কাপুরুষতাকে পদদলিত করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং চরম-মুক্তি মানব-জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। যাঁহারা জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সমগ্র পাশ্চাত্য এইরূপ অন্ধকার হইতে মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই সমস্ত অভাব এবং আকাজ্ক্ষার এক বিপুল ব্যাখ্যা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন জার্ম্মাণ সমালোচক নীট্‌শে,—যাঁহার (আল্‌স্ স্প্রাখৎ সারাথুস্ত্রা) "জারাথুস্ত্রার বাণী" এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী মনুষ্যত্বদায়ক, আনন্দদায়ক এবং জীবন্ত দর্শন গ্রহণ করিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল সে চিহ্ন নিউটেষ্টামেণ্টে পাওয়া যায় না। জীবনে এই আনন্দ, যাহার জন্য ধর্ম্ম, দর্শন এবং সমাজের চিন্তাধারা অপেক্ষা করিতেছিল—যাহা হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে আসিয়াছিল—ভারতের এই অপরিচিত যুবকের নিকট হইতে তাহা লব্ধ। বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের অগ্রণী বলিয়া ঘোষিত

হইয়াছিল—নীট্শের নেতি-মূলক সমালোচনার পরিপূরকরূপে জগতের গঠনশক্তির ইতি-মূলক ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে আসিলেন বিবেকানন্দ।

খুব অল্প লোকই আছেন যাঁহারা শক্তিযোগ, নৈতিক-আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা এবং জীবনের উপর মানুষের আধিপত্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ প্রচার করিয়াছেন একজন জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট এবং আর একজন বিবেকানন্দের পূর্ব্বতন সমসাময়িক ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং, আর আমাদের প্রাচীনদের মধ্যে সেই মহতী ধী-শক্তি-সম্পন্ন উপনিষৎ এবং গীতার দ্রষ্টা ঋষিগণ। বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের মূল—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দশ বৎসর যাবৎ তাঁর সাধনা, এবং ঐ সময় হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁর দশ বৎসরের কর্ম্মজীবনেব সমাধান—দেখিতে পাওয়া যাইবে এই শক্তিযোগে। উদ্যম, বল, বীর্য্য ও স্বাধীনতার সাধনায় তাঁহার সমস্ত কার্য্য এবং চিন্তা এই শক্তিবাদের বহিঃপ্রকাশ। আমাদের পৌরাণিক বিশ্বামিত্র অথবা গ্রীক এস্‌খিলসের প্রমিথিয়াসের মত তিনি নূতন জগৎ তৈয়ারী করিতে এবং স্বাধীনতার অগ্নি, দেবত্ব ও অমরত্ব মানব সমাজে পরিবেষণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যাইবে—তিনি ব্যক্তি গঠনের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সমাজ সংস্কার করিয়াছিলেন এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন; কিন্তু আসল কথা ছিল ব্যক্তিত্ব গঠন। মনুষ্যত্ব এবং স্বাধীনতা শিক্ষা দিবার জন্য, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল।

তাঁর প্রচারিত যোগ-বিষয়ক গ্রন্থাবলীর যথার্থ উদ্দেশ্যও ছিল ব্যক্তি গড়িয়া তোলা। জীবনের নানারূপ অবস্থার উপর আধিপত্য করিতে এবং

জগৎকে জয় করিতে পারেন—এরূপ দেবমানব সৃষ্টি করিবার জন্য বিবেকানন্দ প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

৮। আশুতোষের আকাঙ্ক্ষা*

লোকেরা জানে,—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা ছিল কলেজ স্কোয়ারের বিশ্ববিদ্যালয় ঘরগুলার কোনো কুঠ্‌রিতে। তাঁহার পরলোক-গমনের পর আজ আট বৎসর কাটিল। এতদিনে তাঁহার কার্য্যাবলী নতুন চোখে দেখিতে আর যুবক বাঙ্গলার সৃষ্টি-শড়কে তাঁহার আসল ঠিকানা ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে আমাদের অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

শত শত যুবক আশুতোষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিল। ছোক্‌রা বন্ধুদের দলে আশুতোষ অত্যন্ত আরাম অনুভব করিতেন। মনে রাখা উচিত যে, যেসব যুবক তাঁহার কাছে অগ্রসর হইত, তাহাদের প্রত্যেকেই যে চাকরির প্রার্থনা অথবা ঐ ধরণের কোন সাংসারিক অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইত, তাহা নয়। কিন্তু, যাহারা কাগজে-কলমে কোনো সাংসারিক অনুরোধ জানাইত, অথবা সাংসারিক সুখ-সুবিধার বাসনা মনে মনে পুষিত, তাহাদেরকেও আশুতোষ পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তি হিসাবেই দেখিতেন। তাহাদের কাছ হইতেও নতুন নতুন প্রচেষ্টার নতুন নতুন মতলব আশুতোষ সংগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। করিৎকর্ম্মা যুবকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়াই যে আশুতোষ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই।

গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে যে সব রাষ্ট্রিক কর্ম্মবীর বাংলার সমাজ-জীবনে দেখা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইজন—সুরেন্দ্রনাথ

* কলিকাতার "লিবার্টি" দৈনিকে প্রকাশিত (২৫ মে ১৯৩২) ইংরেজি রচনা হইতে অনূদিত। অনুবাদক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ—আশুতোষের মত যৌবন-ধর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার মতই ছেলেদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিতেন। এইজন্য, যুবকদের সঙ্গে আশুতোষের ঘনিষ্ঠ লেন্‌দেনকে একটী বিস্ময়কর ও অসাধারণ কাণ্ড বলিয়া মনে করিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইবে না।

১৯০৫ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত বিশ বৎসর,—স্বদেশীর এই গৌরবময় যুগে,—সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ত্রিবীর। তাঁহারা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন কর্ম্মপ্রণালীতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের তিনজনেরই জীবনী-শক্তির উৎস ছিল একপ্রকার। যাহারা কাঁচা, নবীন ও অনভিজ্ঞ, তাহাদের নিঃসঙ্কোচ ও অফুরন্ত আব্‌দারগুলার সহিত নিরবচ্ছিন্ন ও সক্রিয় সংস্পর্শই এই ত্রিবীরের জীবনবত্তার আসল উপাদান। যে যুবকবাংলা অজানা পথে দুর্গমযাত্রায় বাহির হইয়াছে এবং নয়া নয়া রাজ্য-জয়ে রত, সেই যুবক বাংলার পায়েই এই তিন কর্ম্মবীর তাঁহাদের মেধা ও শক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

প্রধানতঃ, এমন কি একমাত্র ইস্কুল-পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজকর্ম্মে ওস্তাদ বলিয়াই আশুতোষ সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু, তিনি ছিলেন সর্ব্বাগ্রে স্বজাতিনিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমিক। কথাটা এরূপ ভাবেও বলা চলে যে, স্বজাতিনিষ্ঠ ও স্বদেশসেবক হিসাবে যে শক্তিস্রোত আশুতোষের চিত্তে প্রবাহিত হইত, সেই শক্তিস্রোতই লেখাপড়া সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদ হিসাবে আশুতোষের জীবনে মূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল। বাজারে সুপ্রচলিত ইস্কুলমাষ্টারী বিদ্যার ওস্তাদি করা আশুতোষের স্বধর্ম্ম ছিল না। তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক কর্ম্মনীতি ও চিন্তাপ্রণালী ছিল এক বিরাট গঠন-মূলক স্বদেশসেবার অন্যতম বনিয়াদ।

শিক্ষার সংস্কারক হিসাবে তাঁহার চেষ্টাচরিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? তাহা এই যে, বাঙালীর সাধনাকে মৌলিক, স্ব-নিয়ন্ত্রিত, সর্ব্বগ্রাসী ও সৃষ্টি-শীল বিশ্বশক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। যুবক বাংলা দুনিয়ার শক্তিগুলার মধ্যে এক নতুন শক্তিরূপে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সমানে সমানে, এবং পূরব-পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক, আথিক ও সামাজিক ধুরন্ধরদের সহিত সহযোগীর ন্যায় চলা-ফেরা করে,—লেখাপড়ার ওস্তাদ ও দেশভক্ত হিসাবে ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। এরূপ বাসনায় আশুতোষ বর্ত্তমান বাংলায় মাত্র আর একজন সমধর্ম্মী পাইয়াছেন-- তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ। এইখানে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে, আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,—সরকারী বা সামাজিক হিসাবে,—কখনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করাতে আশুতোষের একটা প্রধান কথা বিশেষ-ভাবে মনে পড়িয়া গেল। বাংলাদেশে রামমোহনের সময় হইতে যে সব বড়লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পয়লা নম্বরের, তাঁহাদের ভিতর আশুতোষই বোধ হয় একমাত্র লোক যিনি সাগর পাড়ি দেন নাই এবং বর্ত্তমান দুনিয়ার গড়ন ও গতিভঙ্গী নিজের চোখে দেখিয়া আসেন নাই। তবুও, ভারতবাসীর জীবন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমূহকে আধুনিক করিয়া তোলার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আশুতোষের দৃঢ়বিশ্বাস যতটা ছিল, আমাদের কোনো সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্র-সাধক ও শিক্ষাপ্রচারকের মধ্যে তাহার চেয়ে বেশী ছিল না।

পঁচিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি। ১৯০৭ সনে—বর্ত্তমান লেখক যখন উনিশের কোঠা পার হন নাই, তখন অনেকবার আশুতোষের সহিত প্রাণখোলা আলাপের সুযোগ জুটিয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা, স্বরাজ, দেশহিত এবং সামাজিক ও আর্থিক নানা কথা লইয়া তর্কাতর্কি চলিত।

এক উপলক্ষ্যে তাঁহার মুখ হইতে এই কয়টী বিদ্রূপাত্মক কথা বাহির হয়—"একশো দেড়শো বছর আগে আমাদের ঠাকুরদাদারা কি ক'র্‌তো জানিস? তারা তুপাতা ফারসী প'ড়্‌তো আর খড়ম পায়ে দিয়ে বেড়াতো। এইতো ছিল সেকালে আমাদের দৌড়!"

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার অথবা মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান আদর্শের রঙ-ফলানো গোলাপী বর্ণনায় হতভম্ব বনিবার মত পাত্র আশুতোষ ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি বিদ্যাসাগরের মত আশুতোষেরও বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু, আধুনিক ভারতীয়•চিত্তকে কর্ম্মক্ষম করিবার উপায় হিসাবে সংস্কৃত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বিদ্যাসাগর খোলাখুলি স্বীকার করিতেন। বিদ্যাসাগরের মস্তিষ্ক ছিল বস্তুনিষ্ঠ। আশুতোষের মগজও ঠিক এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ মগজ ছিল। বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আশুতোষ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতীত বা মধ্যযুগের কোন নিন্দাপ্রচার থাকিত না। বরং ভারতের অতীত ও মধ্যযুগকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ও সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা তিনি বিশেষ রূপেই বুঝিতেন। তাহা সত্ত্বেও বাঙালী সমাজে আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যোগাইবার ইচ্ছা এবং লেখাপড়ায় ও জীবনের কাজকর্ম্মে বর্ত্তমাননিষ্ঠা ঢোকাইবার বাসনা-জনিত উৎসাহই আশুতোষের সারা মন-প্রাণকে পাইয়া বসিয়াছিল।

সেকালে তাঁহাকে লোকেরা সাদাসিধা "ভবানীপুরের আশুবাবু" বলিয়া জানিত। সাদাসিধা বলিয়া তিনি "সেকেলে" লোক ছিলেন না। বরং বর্ত্তমাননিষ্ঠায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন বলিয়াই, বিশ্বশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সজাগ। সেইজন্য, যখনই সুযোগ উপস্থিত হইল তখনই ইয়োরামেরিকা ও জাপানের সম্পদ লুঠিবার দিকে তাঁহার মেজাজ খেলিল। হার্ভার্ড, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম ও

তোকিওতে যে সব মাল পাওয়া সম্ভব, তাহা ভারতের স্বার্থে কিরূপে কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা চলিতে থাকিল।

বর্ত্তমানের আন্তর্জ্জাতিক উদ্ভাবন-আবিষ্কারগুলার মধ্যে ভবিষ্য বাঙালী জীবনের ভিত্তি গভীর ও প্রশস্তভাবে গড়িতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। পঠন-পাঠনের দুনিয়ার প্রত্যেক আনাচে-কানাচে আশুতোষের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক দূতদের দেখা যাইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশদেশান্তর হইতে বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বানদের নিমন্ত্রণ করিয়া ভাগীরথী-তীরে টানিয়া আনিবার ব্যবস্থা ও চলিতে থাকিল।

আশুতোষের আকাঙ্ক্ষা এইখানেই থামে নাই। বিশ্বশক্তির নানা ধারাকে যুবক ভারতের জাতিগঠকদের সংস্পর্শে আনিয়া, আর ভারতবাসীর সহিত ভারতের বাহিরের শিক্ষা ও সাধনার একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই তিনি কাজ খতম করেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, এই আদান-প্রদান যেন সমানে-সমানে চলে। ভারতের ভিতরেই হউক্ বা বাহিরেই হউক্, বিদেশীদের সহিত বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক সংস্পর্শে আসিবার সময় ভারতসন্তানেরা সমকক্ষের মত লেনদেন চালাইবে, ইহাই তাঁহার জীবনী-রক্তের উপাদানস্বরূপ ছিল। বিদেশীদের সঙ্গে ভারতবাসীর সাম্য বিষয়ক চিন্তা তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি যোগাইয়াছিল।

স্বদেশী যুগের প্রথম দিককার আর খানিকটা কথায় আশুতোষের মানসিক ও নৈতিক গড়নকে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার স্বাভাবিক 'যুদ্ধং দেহি' ভাব লইয়া একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"তোদের জাতীয় নেতারা, আজকালকার স্বদেশীওয়ালারা, সিমলা বা দার্জ্জিলিং এমন কি কলিকাতার রাস্তায়ও, ধুতি প'রে চটিজুতা পায়ে বেরুতে সাহস করে না, পাছে তাদের সাহেব বন্ধুরা দেখে' ফেলে। কিন্তু

বামুনের বাচ্চা আমি, সাহেবদের কাছে আমি পৈতা দেখাতে কখনও সঙ্কুচিত হই নি। তোদের নেতারা যেমন ভীরু, তারা সাহেবদের কাছে সম্মানের দাবীই বা ক'রবে কি ক'রে, অথবা যুবক বাংলার মনকে দাসত্ব হ'তে মুক্ত ক'রবেই বা কি ক'রে, কিংবা আধুনিক জগতের শক্তিপুঞ্জ সম্বন্ধে যুবকদের মনে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাবই বা ঢোকাবে কেমন ক'রে ?" এই কথাগুলির মধ্যে বড় তেতো সত্য নিহিত আছে। অনেক বছর পরে, তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষার জোরে কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা বিষয়ক যুগান্তর সৃষ্ট হয়, তাহার আভাস এই কড়া বাণীর ভিতর পাওয়া যায়।

যুবক বাংলার মস্তিষ্কজীবীরা হীনতার চরিত্র ও দৈন্যকে পদাঘাত করিবে এবং ইয়োরোপ আমেরিকা ও জাপানের মস্তিষ্কজীবীদের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া চলিবে, ইহা তাঁহার আশার অন্তর্গত ছিল। জীবনের নানাক্ষেত্রে একটার পর একটা করিয়া ক্রমাগত প্রথমশ্রেণীর কাজ দেখাইয়া তিনি যুবক বাংলার মনো-রাজ্য হইতে ক্লৈব্য ও দীনতা একদম নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তিনি নিজ দেশবাসীর মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতার কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেন। ভারতের যুবক ও বয়োবৃদ্ধেরা বিদেশী মস্তিষ্কজীবীদেরকে যে মহা-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা আধাদেবতা বা আস্ত অবতার বিশেষরূপে পূজা করিয়া থাকে, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। বিদেশী পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট ও পরিচয়-পত্রকে যে ভারতীয় সুধীরা অতি-কিছু সমঝিয়া থাকেন আর সার্টিফিকেট-দাতাদিগকে উচ্চশ্রেণীর প্রভু হিসাবে প্রণাম করিতে অভ্যস্ত তাহা আশুতোষ চোপর দিনরাত দেখিতেন। পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদের বইগুলার সারমর্ম্ম তৈয়ার করাই ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে তাঁহাদের প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব মনে

করেন তাহাও তাঁহার ভালরূপ জানা ছিল। ভারতীয় পণ্ডিতদের মাথার ঘী যেরূপ, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিতে অপারগ আর দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞানের মজলিশে সমান আসনের দাবী করা যে তাঁহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, তাহা বুঝিতে তাঁহার সময় লাগিত না। ধৃতি সম্বন্ধে তাঁহার দেশবাসীর মনোভাবে তিনি যে কাপুরুষতা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজ মাথার ঘীর কদর বোঝা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই একটা সার্ব্বজনিক কাপুরুষতা লক্ষ্য করিতেন। আশুতোষের মহত্ত্ব মাপিতে হইলে দেখিতে হইবে হয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা না হয় তাঁহার স্বদেশবাসীর কাপুরুষতা ও আত্মিক দৈন্য।

আশুতোষের জীবন তেমন দীর্ঘ ছিল না বলিয়া তাঁহার জীবন-স্বপ্নকে কাজে পরিণত করিবার জন্য নিতান্ত প্রাথমিক প্রথম ধাপটী ছাড়া তিনি আর কিছু করিতে পারেন নাই। বদান্য-বীর রাসবিহারী ঘোষ, তারক-নাথ পালিত ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা তাঁহারই ধরণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার সমসাময়িকেরা এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট-ভাবে অনুভব করিতেন। যখন আমাদের দেশের লোকেরা এম্-এ, এম-এস্-সি পাশের পরবর্ত্তী ধাপের জন্য বিস্তৃত ও নিয়মিতভাবে পড়াশুনা ও অনুসন্ধান- গবেষণার আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইবে, তখন ব্যক্তিগত কীর্ত্তির দিক হইতে ইয়োরামেরিকার প্রথম শ্রেণীর শক্তিগুলার ও জাপানের সঙ্গে সমান হওয়ারূপ আশুতোষের স্বপ্ন কাজে পরিণত করিবার প্রথম ধাপটা আমাদের আটপৌরে জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিণত হইবে। যুবকবাংলায় আশুতোষের যে সব ভক্ত ও উপাসক আছেন, তাঁহারা এই কথাটা দিন-কতক বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে সচেষ্ট হউন।

আশুতোষের সময়ে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সমাজ-জীবনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলায় বাংলা ভাষার প্রতি অসম্মান, এমন কি, ঘৃণা দেখানো হইত। তাঁহার ছোটবড় সকল সহকর্মীর মধ্যেই নিজেকে খাটো ভাবা-রূপ যে দুর্ব্বলতা ছিল, উহা তাহারই অন্যতম প্রকাশ। দেশবাসার এই দুর্ব্বলতার জন্যও আশুতোষ তীব্র ব্যথা অনুভব করিতেন। সুতরাং, যখন তিনি বাঙালী ধুতির আদর ও বাঙালী মস্তিষ্কজীবীর আত্মসম্মান বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার ইজ্জত প্রচার করিতে থাকিলেন তখন তাঁহার মতলব ছিল বাঙালী জাতির শিরদাঁড়াকে শক্ত করিয়া তোলা, আর বাঙালার সাধনার জন্য আধুনিক বিশ্বশক্তির কাছ হইতে আন্তর্জ্জাতিক সমাদর টানিয়া আনা। বাঙালীর মাতৃভাষাকে বাংলাদেশের উচ্চতম শিক্ষার মর্য্যাদা-যুক্ত আসনে উন্নীত করিয়া তিনি এই দিকে প্রথম চাল চালিলেন। ইহাতে বিপ্লবটী সুরু করা হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকদের সমানে সমানে পরস্পর সম্মানজনক সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইলে, প্রত্যেক সহরে ও পল্লীকেন্দ্রে প্রত্যেক বিজ্ঞান ও বিদ্যার উচ্চতম শিক্ষা, গবেষণা ও গ্রন্থ-প্রকাশ যাহাতে বাংলাভাষার বাহনেই চলে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক! ইহা একটা বিপ্লবসাধন সন্দেহ নাই। সেই বিপ্লবের পরিণতি এখনও আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। যুবক বাংলা সম্বন্ধে আশুতোষের নানা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এইটাই বর্ত্তমানে আমাদের সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করা উচিত। কেননা সেই আত্মিক বিপ্লবের এইরূপ পরিণতি না ঘটিলে আমাদের মস্তিষ্কের কার্য-ক্ষমতা বাড়িবে না, শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হইবে না আর বাঙালীর জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার বাড়িতে পারিবে না।

প্রাচীন গ্রীসের এপামিনন্দাস হইতে একালের মুসলিনি পর্য্যন্ত সকল বড় বড় কর্ম্মবীরদের গঠনমূলক উৎসাহ ও চেষ্টার মধ্যে যে উচ্চতম আদর্শ-নিষ্ঠা ও নির্ভীকতম কর্ম্মযোগ দেখা গিয়াছে, আশুতোষের জীবনে ঠিক সেই শ্রেণীরই আদর্শনিষ্ঠা ও কর্ম্মযোগ দেখিতে পাই। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আশুতোষকে গতিপ্রবণ কর্ম্মবীরত্বের অধিকারী, বৈপ্লবিক শক্তিযোগের প্রতিমূর্ত্তি আর আধুনিক মানবজাতির ক্ষমতাশালী স্রষ্টা হিসাবে অন্যতম প্রধান ঠাঁই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

বাঙ্গালী, ভারত ও দুনিয়া *

ভারতীয় ঐক্যের সুফল-কুফল

আজ যুবক বাংলা দুনিয়ার ভিতর অন্যতম বিপুল শক্তি। দেশ-বিদেশের নরনারী যুবক বাংলাকে একটা বিশেষ রূপেই উল্লেখযোগ্য শক্তি সমঝিয়া থাকে। বাঙ্গালীর স্বদেশ-সেবা আর স্বার্থত্যাগ আজকালকার জগতে অন্যতম আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হিসাবে সম্মানিত হইতেছে। ১৯০৫ সনের ভাব-রাশি বাঙ্গালা জাতিকে সাতাশ-আটাশ বৎসরের কাজের ফলে জগতের জাতি-মজলিশে অনেক দূর ঠেলিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই কথা মনে রাখিয়া বাঙ্গালী জাতিকে আগামী তিন, পাঁচ, বা সাত বৎসরের জন্য কর্ম্মপ্রণালী বাছিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালী জাতি বিশ্বের রাষ্ট্র-মণ্ডলে একটা মজবুত ও কর্ম্মঠ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ একথা প্রত্যেক বাঙ্গালার মাথায় গভীর ভাবে বসা আবশ্যক।

ঘটনাচক্রে বাঙ্গালা জাতি নিজেকে অন্যান্য ভারতীয় জাতির সঙ্গে নেহাৎ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। বাঙ্গালীরা প্রায় আধা শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ, ভারতীয় ঐক্য, ভারতীয় সত্তা, ঐক্য-গ্রথিত ভারত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি শব্দ প্রচার করিয়া আসিতেছে। এই প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে খানিকটা একতা আর 'একপ্রাণতা যে আসিয়াছে তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ভারতীয় ঐক্য বিষয়ক চিন্তা আজকাল একমাত্র বাংলা

* বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ (২২ ডিসেম্বর ১৯৩১)।

দেশে নয়, বাংলা দেশের বাহিরে অন্যান্য ভারতীয় নরনারীর অন্তরে অন্তরেও যার পর নাই বদ্ধমূল। এইরূপ চিন্তার সার্থকতা কিছু না কিছু আছেই, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তাহার একটা কুফলও খুব বড়। এই কুফলের দৌরাত্ম্যে আমরা অনেক বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। ভারতীয় ঐক্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে একমাত্র বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালী ভারতীয়েরাও অনেক বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ফলতঃ ভারতীয় ঐক্যের প্রচার করা আর নানা কর্ম্মক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা ডাকিয়া আনা প্রায় একার্থক হইয়া পড়িয়াছে।

যখনই আমরা ভারতের গৌরব, ভারতের কৃতিত্ব, ভারতের কীর্ত্তি প্রচার করি, তখনই নিজ পরিচিত পল্লী সহর বা জনপদ ইত্যাদি ভুলিয়া গিয়া ভারতবর্ষের কোনো না কোনো পল্লী, কোনো না কোনো সহর, কোনো না কোনো জনপদের উল্লেখ করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। কঙ্কন প্রদেশে কোনো একজন ভারতীয় নারী একটা কিছু উচু দরের কাজ করিল, তৎক্ষণাৎ আমরাও বাংলা দেশে ভারতীয় গৌরবের একটা নয়া পরিচয় পাইয়া শ্লাঘা বোধ করি। কখনও বা পাঞ্জাবের কোনো চাষীর কীর্ত্তি, কখনও বা মাদ্রাজের কোনো ধর্ম্মপ্রচারকের কাহিনী, কখনও বা মারাঠা-দের জনসেবা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান—এই সকল অতি দূরদেশবর্ত্তী নরনারীর কার্য্যাবলী আমাদিগকে পাইয়া বসে। আর আমরাও তাহাতেই ফুলিয়া উঠিতে লজ্জা বোধ করি না। ইহা যে একমাত্র বাংলার দোষ তাহা নহে। মারাঠারাও কখনও বা কোনো উঁচু দরের বাঙ্গালার কাজ অথবা মাদ্রাজীর চিন্তা লইয়া বেশ খানিকটা গুলতান করিয়া আনন্দ বোধ করেন। এই ধরণের পরের উপর নির্ভর করা, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের কৃতিত্বকে নিজের কৃতিত্ব সমঝিয়া রাখা ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে নরনারীর চরিত্রগত হইয়া পড়িতেছে। এই ধরণের

পরমুখাপেক্ষিতা অথবা পরের উপর নির্ভরশীলতা কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারতবর্ষের ৩৫ কোটী লোক—সকলেই আমরা ভারতবাসী একথাটী জানিয়া রাখা বা বুঝিয়া রাখা যুক্তিযুক্তও বটে আর তাহাতে লাভের সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া পদে পদে পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর পক্ষে অন্যান্য ত্রিশ কোটী ভারতীয় নরনারীর শক্তি স্বাস্থ্য সাহস ও কর্ম্ম-নিষ্ঠার উপর ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকা কোনো মতেই যুক্তিযুক্তও নয়, আর তাহাতে লোকসান ছাড়া লাভের সম্ভাবনাও নাই। বাঙ্গালীদের মত মারাঠাদের ঠিক এইরূপ চিন্তা করা উচিত, পাঞ্জাবীদের ঠিক এইরূপ চিন্তা করা উচিত, মাদ্রাজীদেরও ঠিক এইরূপই চিন্তা করা উচিত। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই চাই আজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তিসাধনা ও কর্ম্মসাধনা, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাহসিকতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার দিগ্বিজয়।

এই শক্তিযোগ আর কর্ম্মনিষ্ঠা বাড়াইয়া তুলিতে হইলে আধ কোটি, এক কোটি, দেড় কোটী, আড়াই কোটী, তিন কোটী, পাঁচ কোটী লোককেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে—অন্যান্য ভারতীয় নরনারীর কর্ম্মদক্ষতার উপর নির্ভর না করিয়া—নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতর নানাবিধ কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে।

ঐক্য-দর্শনের সেকাল ও একাল

আজ আমি আমার নিজের দেশের কথা বলিতেছি। বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ—সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যৎই—আমার একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কি করিতেছে বা না করিতেছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা বর্জ্জনীয় নয়। কিন্তু তাহারা কিছু করুক বা না করুক, বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীন ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে হইবে, নিজের

জীবন খুলিয়া ধরিতে হইবে। এশিয়া মহাদেশের ভিতর বাঙ্গালী জাতিকে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তারূপে জীবন ধারণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এই ধরণের দশবিশটী ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন এককে পরিণত করিয়া তোলা অথবা তাহাদের জন্য এই ধরণের স্বাধীন একক হইবার উপযুক্ত চিন্তাপ্রণালী গড়িয়া তোলা যুবক ভারতের পক্ষে একটা সর্ব্বোচ্চ স্বদেশসেবা ও সমাজদর্শন বিবেচনা করিতেছি। বলা বাহুল্য বাঙ্গালী জাতি একমাত্র ভারতের ভিতরই যে স্বাধীন সত্তারূপে বিরাজ করিবে তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ায়ও বাঙ্গালী জাতি একটা স্বতন্ত্র সত্তারূপে ঠাঁই পাইবে। জগতের রাষ্ট্রশক্তির ভিতর বাঙ্গালী জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। জগতের আর্থিক শক্তিপুঞ্জের ভিতর আর্থিক বাংলাকে স্বতন্ত্র এককরূপে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকটিত করিতে হইবে। ঠিক এই ধরণেই স্বতন্ত্র আর্থিক একক ও রাষ্ট্রিক একক রূপে ভারতের অন্যান্য জাতিও নিজ নিজ জীবন গড়িয়া তুলুক, কম-সে-কম তাহাদের চিন্তা প্রণালী এইরূপ স্ব-স্ব প্রধান জীবন বিকাশের অনুরূপ হইতে থাকুক।

কথাটা ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করিয়া বলিয়া ফেলিতেছি। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস যেদিন হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেদিন হইতে ভারত আর ভারতীয় ঐক্য নামক একটী বোল, ভারতবর্ষের নানা স্থানে, প্রায় সকল স্থানেই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভারতীয় ঐক্যবিষয়ক ধারণাকে বর্ত্তমান ভারতের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির পক্ষে বিশেষ কণ্টক স্বরূপ দেখিতেছি। এই কথা আমি পনর বিশ বৎসর ধরিয়াই ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রচার করিয়া আসিতেছি। চীনদেশে থাকিবার সময় (১৯১৫) চীনের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে এই তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের বিশ্লেষণও বিশেষ ভাবে করিয়াছিলাম। একটা বিশাল মহাদেশ, যেখানে

পঁয়ত্রিশ কোটী নরনারী বাস করে, সেই ধরণের মহাদেশকে একটা ঐক্যগ্রথিত নরনারীর রাষ্ট্র বিবেচনা করা ইয়োরেশিয়ার মধ্যযুগে সুপ্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে ইয়োরোপের বাদশারা গোটা ইয়োরোপকে অথবা আধখানা ইয়োরোপকে অথবা সিকিখানা ইয়োরোপকে নিজ নিজ তাঁবে আনিয়া ঐক্যগ্রথিত ইয়োরোপের উপর একাধিপত্য চালাইতে চাহিতেন অথবা চালাইতেছেন মনে করিতেন। তখনকার দিনে চিন্তাবীর, কবি, দার্শনিক ইত্যাদি লোকেরাও এইরূপ ঐক্যগ্রথিত ইয়োরোপ সম্বন্ধে আদর্শ প্রচার করিতেন। আমাদের ভারতীয় বাদশারা অনেকেই রাজচক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম অথবা এই ধরণের কিছু হইতে চেষ্টা করিতেন। তাহা ছাড়া ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি রাজশাস্ত্রের প্রচারকেরাও এইরূপ সর্ব্বগ্রাসী বিশাল ঐক্যবিশিষ্ট সাম্রাজ্য কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু সে সব, কি ইয়োরোপে কি এশিয়ায়, পাগলামী ছাড়া আর কিছু ছিল না। মধ্যযুগের তথাকথিত ইয়োরোপীয় ঐক্য আর তথাকথিত ভারতীয় ঐক্য কথার কথা মাত্র ছিল। তাহাতে হয়ত বা সামাজিক লেনদেনে, ধর্ম্মের আচার বিচারে, বিশেষতঃ বড় ঘরের কৌলীন্য প্রথায় একটা ঐক্য বা সাম্য অতি দূর দূর দেশের ভিতরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্য, নরনারীর রাষ্ট্রগত একতা ইত্যাদি বলিলে বর্ত্তমান যুগে যে ধরণের জনগণ-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজের কথা উঠে সে সব চীজ মধ্যযুগের ইয়োরোপে অথবা ভারতীয় বাদশা-তন্ত্রে দেখা যাইত না। সেই সব ঐক্য ছিল রাষ্ট্রীয় গোলামীর আর রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে এই সেকেলে ঐক্যের মায়ামৃগ আর কাহাকেও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

নেপোলিয়নের পরবর্ত্তী যুগে ইয়োরোপীয়ানরা বুঝিয়া লইয়াছে যে,

ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই ঐক্য কায়েম করা সম্ভবপর নহে। কাজেই তাহারা খোলাখুলি ইয়োরোপকে টুকরা টুকরা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন, স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তিতে বাঁটিয়া লইয়াছে। এই ভাগবাটোয়ারার কাজ যে সম্পূর্ণ হইয়াছে সেকথা এখনও বলা চলে না। এখনও বহুদিন ধরিয়া, ভার্সাই সন্ধির পরেও স্বতন্ত্র একক গড়িয়া তুলিবার অবস্থা ইয়োরোপে থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা আহাম্মুকের মত সেই মধ্যযুগের বুলি আর মধ্যযুগের কাজটা একালেও বেমালুম চালাইয়া যাইতেছি। তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের আলেয়ার পেছনে না ছুটিয়া অথবা আজকালকার তথাকথিত ফেডারেশ্যনের খপ্পড়ে না পড়িয়া ভারতবাসীর উচিত ছিল সোজাসুজি ভারতবর্ষকে ভিন্ন ভিন্ন স্বস্বপ্রধান স্বাধীন শক্তিকেন্দ্রে টুকরা-টুকরা করা। ভারতে বিচক্ষণ রাষ্ট্র-সমজদার থাকিলে তাঁহারা ভারতকে ঐক্যগ্রথিত করিবার কথা না ভাবিয়া তাহাকে ছোট ছোট শক্তিশালী কতকগুলো স্বাধীন দেশে পরিণত করিবার ফিকির ঢুঁড়িতে চেষ্টা করিতেন।

ইয়োরোপের মতন "অনৈক্য" চাই ভারতে

ভারতবর্ষ গোটা ইয়োরোপের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ। গোটা ইয়োরোপ বলিতে ইয়োরোপীয়ান রুষিয়াও অন্তর্গত করিতেছি। অথবা যদি ইয়োরোপীয়ান রুষিয়াকে বাদ দিই, তাহা হইলে ইয়োরোপের যতটুকু থাকে তাহার প্রায় বার আনা হইল আমাদের ভারত। ভারতের নর-নারীর নিকট যেখানে সেখানে যখন তখন একটা ঐক্যগ্রথিত অথবা ফেডারেলীকৃত ভারতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে ঠিক তেমনই আহাম্মুকির পরিচয় দেওয়া হয় না কি,—যেমন ইয়োরোপের তিন-চতুর্থাংশের নরনারীকে একটা ঐক্যগ্রথিত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সংঘ

বা সংযুক্ত-ইয়োরোপ গড়িয়া তোলার জন্য প্রাণপাত করিতে বলিলে হয়? দুইটাই আমার চিন্তায় সমান বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। যে সব লোক ভারতবাসীকে এইরূপ তথাকথিত ঐক্যগ্রথিত ভারত গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়া আসিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নহে। তাহারা আমাদের স্বদেশসেবকগণকে এমন একটা পথের কথা বলিয়াছে, যে পথে যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিলেও কোন দিন কূলে আসিয়া পৌঁছানো যাইবে না। ইয়োরোপীয়ানরা যে পথে চলিয়াছে সে পথে তাহারা একটা চলনসই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাতে ইয়োরোপের মোটের উপর লাভই হইয়াছে। ছোট ছোট জনপদে এই ধরণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং আত্মকর্তৃত্ব লাভই ভারতবাসীর পক্ষেও বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যে পথে চলিলে এই ধরণের সাফল্য লাভ হইতে পারিত সেই পথ মাড়াইতে না দেওয়াই যেন ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে পরামর্শদাতাদের মতলব ছিল। ভারতীয় ঐক্যের প্রচারকেরা যদি বিদেশী হন তাহা হইলে যে তাঁহারা আমাদের শত্রু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যদি তাঁহারা ভারতসন্তান হন তাহা হইলে তাঁহারা অবুঝ—এই কথাই আমি বলিতে চাহিতেছি। পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতীয় নরনারীকে এমন একটা কাজ করিতে বলা হইতেছে যাহা ইয়োরোপের ঠিক ততগুলি লোক সমাধা করিতে পারে নাই। আসল কথা, ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে তাহারা ইয়োরোপের ভিতর যে যে কাজ, যে ধরণের কাজ প্রাণপণে এড়াইয়া আসিয়াছে,—যে ধরণের কাজ তাহারা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে নাই ঠিক সেই ধরণের কাজ—একটা অসম্ভব, অসাধ্য, যুক্তিহীন কাজ– ভারতের সন্তানকে ঘাড়ে লইবার জন্য অহরহ বক্তৃতা করা হইতেছে।

আমার বিশ্বাস—আমরা ভারতবাসীরা অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্র-জীবনের যথার্থ বস্তু সম্বন্ধে অন্ধতা পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছি। কতক-

গুলি শব্দের পিছনে ছুটিয়া তাহার গুণগান করিতে করিতে আমরা আমাদের আসল কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি। এখন হইতে আমাদিগকে চোখ খুলিয়া, নিজের চোখে দুনিয়া দেখিয়া,—কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা সম্বন্ধে গোঁজামিল না রাখিয়া, সোজা পথে কাজে নামিতে হইবে।

আয়তন ও লোকবল

আজকালকার বোম্বাই প্রদেশ আয়তনে ইয়োরোপের ইতালি অথবা নরওয়ের সমান। আসাম প্রদেশ গ্রীসের চেয়ে কিছু বড়, চেকোশ্লোভাকিয়ার চেয়ে কিছু ছোট। মাদ্রাজ আর পোল্যাণ্ড আয়তনে প্রায় সমান সমান। আর আমাদের বাংলাদেশ চেকোশ্লোভাকিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এই দুইটী ইয়োরোপীয়ান রাষ্ট্রের সমান। মজার কথা,—এ কালের ইয়োরোপে যাঁহারা করিৎকর্ম্মা রাষ্ট্র-ধুরন্ধর অথবা রাষ্ট্র-দার্শনিক তাঁহারা ইউনিটি বা ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন না অথবা একটা ফেডারাল কাঠাম কল্পনা করেন না। ইয়োরোপকে তাঁহারা বহুসংখ্যক ইয়োরোপে বিভক্ত দেখিতে চাহেন, আর করিয়াছেনও তাহাই।

ইয়োরোপে আজকাল ত্রিশ বত্রিশটী ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের কেহ বড়, কেহ মাঝারী, কেহ ছোট। ইয়োরোপের মত গঠনমূলক রাষ্ট্রকৌশল যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ভারতীয় মহাদেশে কম-সে-কম দুই ডজন স্বস্বপ্রধান স্বাধীন জাতি বা রাষ্ট্র দেখিতে পাইতাম। ভারতবর্ষের আয়তন লক্ষ্য করিয়াই এই সংখ্যা উল্লেখ করিলাম। ইয়োরোপে যদি গোটা ত্রিশেক স্ব-স্ব প্রধান স্বাধীন দেশ থাকিতে পারে, আর তাহাতে যদি একটা তথাকথিত আন্তর্জ্জাতিক হযবরল, গণ্ডগোল বা অরাজকতা বিরাজ করিতেছে এইরূপ না বলা যায়,—তাহা হইলে ভারতবর্ষে গোটা

চব্বিশেক স্বাধীন রাজ্য চলিতেছে এইরূপ দেখিলে দুনিয়ার কোনো লোক তাহাকে একটা অরাজকতা, গণ্ডগোল বা হযবরল বলিতে অধিকারী হইবে কেন? ইয়োরোপকে যে মাপে মাপিতেছ, আমি ভারতকেও ঠিক সেই মাপেই মাপিতে চাই।

আচ্ছা, এবার আয়তনের কথা ভুলিয়া গিয়া লোকসংখ্যার কথা ধরা যাউক। প্রশ্ন এই,—কতগুলি লোক থাকিলে এক একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে? এ সম্বন্ধে কোনো নিয়ম আছে কি? নাই। ইয়োরোপের দৃষ্টান্তে আবার আমরা ভারতের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ করিতে পারিব। বুলগারিয়ায় প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ লোক। অর্থাৎ এক কোটীরও কম লোক লইয়া বুলগারিয়ার নরনারী একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়াছে। তাহা হইলে ভারতের আসামী বেচারারা কি দোষ করিল? বস্তুতঃ এই ধরণের অল্পসংখ্যক লোক লইয়া আসামেও একটা স্বতন্ত্র রাজ্য কেন গড়িয়া উঠিবে না? এই মাপে বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, স্পেনের সমান দরের একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারে আমাদের পাঞ্জাবীরা। আর গ্রেট ব্রিটেনের সমান সংখ্যক লোক লইয়া মাদ্রাজীরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে অধিকারী। যুক্তপ্রদেশ আর বাংলাদেশ দুই মুল্লুকেই প্রায় পাঁচকোটী লোক, গ্রেটবৃটেনের কিছু বেশী আর জার্ম্মানির কিছু কম। কাজেই যুক্তপ্রদেশের নরনারী আর বাঙালী জাতি বেশ দুইটী বড় বড় রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে অধিকারী। ইয়োরোপীয়ান রুযিয়া বাদ দিলে ইয়োরোপের যতটুকু বাকী থাকে তাহার লোকসংখ্যা আমাদের গোটা ভারতের লোকসংখ্যার সমান। কাজেই ইয়োরোপের দেখাদেখি ভারতেও আমাদের লোকেরা যদি গোটা ত্রিশ বত্রিশ স্ব-স্ব প্রধান রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইতে পারে না; রাষ্ট্রনৈতিক তর্কশাস্ত্রে অথবা রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভারতবাসীকে

ইয়োরোপীয়ানদের চেয়ে নিম্নপদস্থ বিবেচনা করা চলিতে পারে না। করিতে গেলে "গা-জুরি" দেখানো হইবে মাত্র। ইয়োরোপ-সুলভ অনৈক্যই চাই আজ ভারতে। ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিত আর রাষ্ট্রিকেরা এই কথা বলিবেন না। কিন্তু এই কথা বলাই যুবক-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশসেবকগণের পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য। নয়া বাঙলার গোড়া পত্তনের কাজে সর্ব্বপ্রথম জরুরি কাজ এই নবীন বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন। যুবক বাঙ্‌লার স্বদেশ-সেবা, স্বার্থত্যাগ ও উন্নতি-নিষ্ঠা এই নবীন দর্শনের কর্ম্মকাণ্ডে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠুক।

নেশ্যন-রাষ্ট্রের আসল কথা

ইয়োরোপীয় অনৈক্যের মতই আমি ভারতে অনৈক্য চাই। বস্তুতঃ এই ভারতীয় অনৈক্য দেখিয়া ভারতবাসীর লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

এবার আর একটা কথা বলিব—আরও গভীর। ইয়োরোপের এই যে ত্রিশ বত্রিশটা ছোট ছোট স্বাধীন দেশ তাদের প্রত্যেকটার ভিতরে কোনো প্রকার ঐক্য আছে কি? অনেক ক্ষেত্রেই বিলকুল না। অথচ আমরা ভারতে আহাম্মুকের মতন বুলি আওড়াইয়া থাকি যে, ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি বাস্তবিক এক একটা ঐক্যগ্রথিত দেশ। ইংরেজীতে একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেটা ঐক্যগ্রথিত অথবা একতাশীল লোকসমষ্টির প্রতিশব্দ বিশেষ। তাহাকে বলে "নেশ্যন"। আমাদের রাষ্ট্রিক মহলে, সাংবাদিক মহলে, দার্শনিক মহলে, সাহিত্যিক মহলে, পণ্ডিত মহলে, সর্ব্বত্রই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইয়োরোপের ছোট ছোট স্বাধীন দেশগুলি বাস্তবিকই এক একটা "নেশ্যন" অর্থাৎ জীবনের সকল প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে পুরোপুরি ঐক্যবিশিষ্ট সমষ্টি। আসল কথা অনেক

ক্ষেত্রেই প্রায় একদম উল্টা। ইয়োরোপের "নৃতত্ত্বে" হাতে খড়ি হইবামাত্র "চিচিং ফাঁক" হইয়া যাইবে। ইয়োরোপ সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়ানরা আমাদিগকে যাহা কিছু শিখাইয়াছে অথবা ইয়োরোপ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বুঝিয়া রাখিয়াছি কিংবা বলিয়া থাকি তাহার প্রায় সবই আগাগোড়া ভুল। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ইয়োরোপের প্রত্যেক প্রদেশের ভিতরকার অসংখ্য অনৈক্য সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় পণ্ডিত বা রাষ্ট্রিক মহলে আসল তথ্যপূর্ণ জ্ঞান জন্মিল না। এক একটা তথাকথিত ইয়োরোপীয়ান নেশ্যন-রাষ্ট্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। কি দেখিতে পাই? প্রায় প্রত্যেকটার ভিতরেই দেখিতে পাই একাধিক ভাষার প্রভাব অথবা আধিপত্য। আবার প্রত্যেকটিতে দেখিতে পাই, একাধিক "জাতির" প্রভাব অথবা আধিপত্য। "জাতি" অনুসারে রাষ্ট্র ইয়োরোপের প্রায় কোথাও নাই। ভাষা হিসাবে রাষ্ট্র ও ইয়োরোপের একপ্রকার কোথাও নাই। প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বহু ভাষার জয়জয়কার। আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহু জাতিরও জয়জয়কার। ইহাই হইল ইয়োরোপের রাষ্ট্র বিধানের গোড়ার কথা।

রক্ত ও ভাষা

ধরা যাউক ফ্রান্স। ফ্রান্স এমন একটা দেশ যেখানে অনেক বিষয়ে কতকগুলি ঐক্য আছে। ফ্রান্সকে অনেক বিষয়ে আমরা ঐক্যবিশিষ্ট লোকসমষ্টির সুবিস্তৃত জনপদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। করিলে বেশী ভুল হইবে না। কিন্তু তবুও বাস্তবিক পক্ষে, ফ্রান্সের "জাতিগত" ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই বলা উচিত। আছে "জাতিগত" বৈচিত্র্য। এখানকার লোকসংখ্যা ৪০,৭৫০,০০০। এই কিঞ্চিদূর্দ্ধ চার কোটী নরনারীর ভিতর ১,৭০০,০০০ জার্ম্মাণ, ১,০০০,০০০ কেল্ট,

৬০০,০০০ ইতালিয়ান, ২৫০,০০০ স্পেনিস। তাহা ছাড়া অন্যান্য কুচোকাচা প্রায় ৬০০,০০০। অধিকন্তু ফ্রান্সে যাহারা আসল "ফরাসী" তাহাদের ভিতরও অসংখ্য "জাতি", "উপজাতি" রহিয়াছে।

এইবার একটা ছোট দেশের কথা ধরা যাউক—নাম বেলজিয়াম। এখানে চল্লিশ লক্ষ ফ্লেমিশ নরনারীর সঙ্গে ঘর করে ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার ত্বালুন জাতীয় নরনারী। তাহার উপর আছে লাখ খানেক জার্ম্মাণ, অধিকন্তু লাখ চারেক অন্যান্য জাতীয় লোকও বেলজিয়ামে বাস করে। অর্থাৎ ফ্লেমিশ জাতীয় লোক এখানে অর্দ্ধেকের সামান্য কিছু বেশী।

একটা প্রশ্ন নৃতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রতত্ত্বেও আসিয়া পড়ে। সেটা এই—"জাতি" ("রেস") কাহাকে বলে? জাতি শব্দে কি রক্তের কথা বুঝিতে হইবে? তাহা হইলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বেশী ভজকট আসিয়া পড়ে যে, তাহার কূল কিনারা পাওয়া যায় না। কেননা পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদের প্রত্যেক বিঘাতেই রক্তসংমিশ্রণ অর্থাৎ দো-আঁসলা জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কাজেই তথাকথিত খাঁটী স্বদেশী রক্ত নামক বস্তু পৃথিবীর কোথাও চক্ষুগোচর হয় না। সুতরাং অমিশ্র রক্তওয়ালা নরনারীর দলকে এক একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের কেন্দ্র অথবা উপাদান বিবেচনা করিতে হইলে পৃথিবীর কোথাও "নেশ্যন" বা ঐ ধরণের একটা রাষ্ট্র বা দেশ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে মিশ্র বা দো-আঁসলা জাতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দো-আঁসলা "জাতি" লইয়াই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে বাধ্য। "জাতি" শব্দটা তাহা হইলে অনেক সময় ছাড়িয়া দেওয়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাহার বদলে হয়ত বা ভাষা শব্দটা ব্যবহার করিলেও চলিবে। অথবা জাতি ("রেস") শব্দটাকে ভাষার প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহার করিলে অনেক সময় কাজ চলিয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক—ভাষা হিসাবেও

"নেশ্যন"-রাষ্ট্র ইয়োরোপে আছে কি না। থাকিলে কয়টা আছে? ফ্রান্স এবং বেলজিয়ম দুই দেশের নাম করিয়াছি। এই দুইটাই বনিয়াদী দেশ – অর্থাৎ মহা লড়াইএর পূর্ব্বেও ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, আর এই দেশ দুইটা নামজাদাও বটে। দেখিলাম—জাতি হিসাবে অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভাষা হিসাবেও এই দেশ দুইটা বাস্তবিক ঐক্যগ্রথিত নেশ্যন-রাষ্ট্র নয়।

পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া

এইবার কতকগুলি নয়া রাষ্ট্রের কথা বলিব। এই সব রাষ্ট্র লড়াইএর পর ইয়োরোপে কায়েম হইয়াছে। লড়াইএর পূর্ব্বে এই সব দেশের নাম কেহ জানিত না। বিচিত্র কথা—লড়াইএর খতম হইয়াছে যে সব সন্ধিতে সেই সকল সন্ধিতে এই অর্ব্বাচীন দেশগুলিকে তথাকথিত "নেশ্যন"-রাষ্ট্র নামে খুব লম্বা গলায় প্রচার করা হইয়াছে। এইরূপ তথাকথিত "নেশ্যন"-দেশের ভিতর একটি আজকাল বেশ সুপরিচিত। তার নাম পোল্যাণ্ড। এইবার তাহা হইলে পোল্যাণ্ডের ভিতর একটু পায়চারী করিয়া আসা যাউক। দেখি এখানকার নরনারীরা তাদের হাড়মাসে কোন্ কোন্ জাতির পরিচয় দেয়। সহর পল্লীর লোকজনের সঙ্গে একটু আধটু গা ঘেঁষাঘেঁষি করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,—এই তথাকথিত নেশ্যন-দেশের ভিতর খাঁটি পোলিশ হাড়মাসের লোক শতকরা মাত্র ৫২ ৭; অর্থাৎ প্রায় আধাআধি লোকই এই দেশের "খাঁটি স্বদেশী" নয়। এদেশের লোকসংখ্যা ২৭,০০০,০০০। ইহার ভিতর শতকরা একুশ জন লোক উক্রেন রক্তের লোক, শতকরা এগার জন ইহুদীর বাচ্চা, শতকরা ৭ ৩ শ্বেতরুষ, শতকরা সাত জন জার্ম্মাণ। তাহা ছাড়া অন্যান্য মোৎফারাক্কা জাতি শতকরা একজন ধরিতে হইবে।

এইবার আর একটা নয়া রাষ্ট্রের কথা বলিব। সে চেকো-স্লোভাকিয়া। এই দেশটার নামের সঙ্গেই দুই দুইটা জাতি বা রক্ত বা হাড়মাস গাঁথা আছে। বুঝিতে হইবে যে, কমসেকম দুইটা ভাষা এই তথাকথিত "নেশন"-রাষ্ট্রের গোড়া দখল করিয়া বসিয়া আছে। আসল কথা, যত রকম রক্ত ততগুলা ভাষা। এইবার দেখা যাউক, এই দেশের ভিতর সহরে পল্লীতে কোন্ কোন্ রংএর কোন্ কোন্ রূপের লোকেরা বাস করে। একটা জাতির নাম চেক। ইহারা হইতেছে শতকরা ৪৪.৪। যে জাতির নাম দেশটার দ্বিতীয় অংশে পাই সে জাতির অর্থাৎ স্লোভাক রক্তের লোক এই মুল্লুকে শতকরা মাত্র ১৪.৮। ইহাই হইল তথাকথিত নেশ্যন-রাষ্ট্রের কারচুপি। অবশিষ্ট লোকগুলি কাহারা? তাহাদের ভিতর গোটা লোকসংখ্যার শতকরা ২৭.৪ হইল জার্ম্মাণ, শতকরা ছয় জন ম্যাজিয়ার।

বুঝা যাইতেছে সোজা কথা। এই যে নবীনতম রাষ্ট্র যাহার ভিতর নাকি নেশ্যন-ধর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহাতে "মাইনরিটি" অর্থাৎ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ নরনারীর সমষ্টি বেশ পুরু। আর মধ্য যুগে ও প্রাচীন কালে ত সর্ব্বত্রই এই ধরণের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের অস্তিত্ব খুব বেশীই ছিল। বুঝিতে হইবে যে, কি সেকালে কি একালে একাধিক জাতি এবং একাধিক ভাষা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বনিয়াদ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোঁজামিল রাখিয়া চলা আহাম্মুকির চূড়ান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্ভাগ্যের কথা, ভারতে আমরা এই গোঁজামিল আর এই আহাম্মুকি অনেক দিন ধরিয়া চালাইতেছি। যুবক বাঙ্‌লার রাষ্ট্রবীরদের এখন উচিত তাহাদের মগজ হইতে এই আহাম্মুকিটা ঝাড়িয়া ফেলা। শেয়ানার মত শেয়ানার সঙ্গে কোলাকুলি করিতে অভ্যস্ত হওয়া আজ তাদের পক্ষে বিশেষ জরুরী। ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিতদের প্রচারিত বুজরুকিগুলি শুনিবামাত্র হতভম্ব হইয়া

যাওয়া তাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। জোরের সহিত, সাহসের সহিত পাকা খেলোয়াড়ের মতন ইয়োরোপের দেশগুলি সম্বন্ধে মতামত প্রচার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভারতীয় রাষ্ট্রকর্ম্মীদের পক্ষে নেহাৎ আবশ্যক। বিশেষতঃ আজ তাহাদিগকে ভারতবর্ষের মানচিত্র লইয়া বিশেষ ভাবে মাথা খাটাইতে হইবে। এই জন্য ইয়োরোপের মানচিত্রটা নখদর্পণে রাখিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। ইয়োরোপের মানচিত্রটা ইয়োরোপের রাষ্ট্রিকেরা যে ধরণে টানিয়াছে ভারতের কর্ম্মবীরেরাও ভারতবর্ষের ম্যাপকে সেই ধরণে টানিতে পারিলেই ওস্তাদির পরিচয় দেওয়া হইবে।

সোজাসুজি বুঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, তথাকথিত জাতিগত ঐক্য অনুসারে পৃথিবীর কোনো মুল্লুকে রাষ্ট্র কায়েম করা অসম্ভব। জাতিগত ঐক্যের সূত্র অনুসারে হওয়া উচিত—যেখানে যেখানে নয়া নয়া ভাষা সেখানে সেখানে নয়া নয়া রাষ্ট্র। অথবা যেখানে যেখানে নয়া নয়া হাড়-মাস বা রক্ত সেখানে সেখানে নয়া নয়া রাষ্ট্র। এই দুই সূত্র কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। এ কথাটা ভারতবাসীকে নিরেট ভাবে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। কাজেই বাংলা দেশে বাঙ্গালী জাতি যে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে সেই রাষ্ট্রে কতকগুলি অ-বাঙ্গালী জাতি ও অ-বাঙ্গালী ভাষা থাকিবেই থাকিবে। ইহা প্রথম হইতেই বুঝিয়া লওয়া দরকার। চেকোশ্লোভাকিয়ার মত, পোল্যাণ্ডের মত, বেলজিয়মের মত বা ফ্রান্সের মত বাংলা দেশেও একটা রাষ্ট্র কায়েম করিতে হইলে অ-বাঙ্গালীর অস্তিত্ব হঠানো সম্ভব হইবে না। অ-বাঙ্গালী জাতির হাড় মাস এবং অ-বাঙ্গালীর ভাষা নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর পুষিয়াও বাংলার নরনারীর পক্ষে একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা সম্ভব। এইরূপ একাধিক ভাষা ও একাধিক জাতি লইয়া ঘর করিতে থাকিলে বাঙ্গালী জাতিকে বিশেষরূপে নিন্দনীয় অথবা দুর্ব্বল বিবেচনা করা চলিবে

না। সংসারের অন্যান্য দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রগুলিকে যে মাপকাঠিতে বিচার করা হইয়া থাকে বাঙ্গালা জাতিকে তাহা হইতে পৃথক্ অথবা তাহার চেয়ে বড় বা কঠিন কোনো মাপকাঠিতে বিচার করিতে যাওয়া বেকুবি অথবা 'বজ্জাতি' ছাড়া আর কিছু নয়।

খৃষ্টান সমাজে ধর্ম্মের লড়াই

এইবার তাহা হইলে ধর্ম্মের কথা কিছু বলি। সবক বাংলার রাষ্ট্রবীরগণ বস্তুনিষ্ঠ ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, রাষ্ট্রগঠনে ধর্ম্মের ঠাঁই সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক কিছু বুজরুকী শিখিয়াছেন। ইয়োরোপের নৃতত্ত্বে ধর্ম্মের দস্তুল কিরূপ, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রে ধর্ম্মের প্রভাব কতখানি, ইয়োরোপের নরনারীর ভিতর ধর্ম্মভেদ কতটা গভীর ইত্যাদি বিষয় তলাইয়া মজাইয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। ইয়োরোপে এমন কোন তথাকথিত "জাতি"-রাষ্ট্র আছে কি যেখানে আমরা বলিতে পারি যে, বাস্তবিক তাহাতে রাষ্ট্রের সীমানা আর ধর্ম্মের সীমানা এক, অর্থাৎ এমন কোনো রাষ্ট্র ইয়োরোপে আছে কি যেখানে একাধিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব বা প্রভাব নাই? আমাদের দেশে সাধারণতঃ আমরা বিবেচনা করি যে, ইয়োরোপের দেশগুলিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভেদাভেদ বা গোলযোগ কিছু দেখা যায় না। সেখানকার রাষ্ট্রগুলিকে সবই একধর্ম্মাবলম্বী নরনারীর দেশ বিবেচনা করা আমাদের দস্তুর। আসল অবস্থা ঠিক তাহার উল্টা। আবার আমাদিগকে শিখানো হইয়া থাকে যে, আমাদের দেশে যতদিন একাধিক ধর্ম্মের অস্তিত্ব বা প্রভাব থাকিবে ততদিন আমাদের দেশে রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্র বা স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই আসিতে পারে না। এই মত বর্ত্তমান যুগের সমাজদর্শনে একটী প্রকাণ্ড মিথ্যা। এত বড় বুজরুকী

আমরা পঞ্চাশ ষাট সত্তর বৎসর ধরিয়া বেমালুম হজম করিয়া যাইতেছি, —ইহাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা কি? আমরা যাহা শিখিয়াছি, আমাদিগকে যাহা শিখানো হইয়াছে, ঠিক তাহার উল্টা আসল বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ধরা যাউক হাঙ্গারি দেশ, এটা একটা নয়া রাষ্ট্র। লড়াইয়ের পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এদেশে কয়টা ধর্ম্ম? খ্রীষ্টান রোমাণ ক্যাথলিক শাখা এখানকার লোকসংখ্যার শতকরা ৬৩ জন নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। খ্রীষ্টানদের প্রটেষ্টাণ্ট শাখা নিয়ন্ত্রিত করে শতকরা ২১.৩ জন লোককে। এভাঞ্জেলিষ্ট নামক আর এক শাখা নিয়ন্ত্রিত করে শতকরা ৬·২ জন নরনারীকে। "অর্থডক্স" (গোঁড়া) গ্রীক শাখা নামক খৃষ্টান ধর্ম্মের এক বড় সম্প্রদায় হাঙ্গারি দেশের শতকরা ২ ১ জন লোকের ধর্ম্মনিয়ন্তা। তাহা ছাড়া আছে ইহুদী। ইহুদীরা অখৃষ্টান, তাহাদের আওতায় বসবাস করে শতকরা ৬ ২ জন নরনারী। বাকি থাকে শতকরা একজন, তাহাদিগকে অন্যান্য ধর্ম্মের যজমানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কি দেখিলাম?— দেখিলাম ঘোর ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য।

ভারতে আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে, ইয়োরোপীয়ান দেশে ধর্ম্মসংক্রান্ত গোলযোগ কিছু নাই। ইহাও ভুল। প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত যে, খৃষ্টান ধর্ম্মের আইনে ক্যাথলিক শাখার পুরুষ বা নারী প্রটেষ্টাণ্ট শাখার নারী বা পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না। যে দুই সম্প্রদায়ে বিবাহ হয় না, বলা বাহুল্য সেই দুই সম্প্রদায়ে পারিবারিক মেলামেশা আর সামাজিক লেনদেন অনেক বিষয় সঙ্কুচিত থাকিতে বাধ্য। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে যে পরসম্প্রদায়-বিদ্বেষ, পরধর্ম্মের বিরুদ্ধে মতামত, নিন্দাপ্রচার ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ইয়োরোপের যে কোনো দেশে, সহরে অথবা বিশেষ ভাবে পল্লীতে যে সকল ভারতবাসী বসবাস করিয়াছে

এবং কিছু ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন পরিবারের সংশ্রবে আসিয়াছে, তাহারাই জানে যে, ক্যাথলিক পরিবারের সঙ্গে প্রটেস্‌টাণ্ট পরিবারের সামাজিক অসহযোগ একটা প্রথম স্বীকার্য্য। ঝগড়া ঝাঁটী কত আছে, কত খুঁটী-নাটী লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, আর তাহার প্রভাবে পার্লামেণ্টে, নগরশাসনে, সামাজিক বৈঠকে, সাহিত্য সমালোচনায়, সংবাদপত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কত রকম বাদ বিসম্বাদ হাজির হয়, নেহাৎ হাঁড়ির খবর যাঁহারা না জানেন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। তাহা সত্ত্বেও ওসব দেশের দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রে ক্যাথলিক-বিরোধী অথবা প্রটেস্‌টাণ্ট-বিরোধী দল, আন্দোলন এবং মতামত যে-সে লোকের নজরে পড়ে। তাহার উপর আসিয়া জোটে ইহুদী-সমস্যা। একে প্রটেস্‌টাণ্ট-ক্যাথলিক দ্বন্দ্ব, তাহার উপর দুইএরই বিশেষতঃ ক্যাথলিকদের ইহুদী-বিদ্বেষ। বুঝিতে হইবে ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে, সে যত ছোটই হউক—একটা ধর্ম্মগত ত্র্যহস্পর্শ লাগিয়াই আছে। বলা বাহুল্য, মামুলী ধর্ম্মের বিধানে ইহুদীর সঙ্গে ক্যাথলিকের বিবাহ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া আর অন্যান্য সামাজিক উঠাবসায় এক জাতি আর একজাতির মুখ দেখে না। ইহুদি পরিবারে খৃষ্টানদের নিমন্ত্রণ কোনদিন আমার চোখে পড়ে নাই। আবার খৃষ্টান গৃহস্থের ঘরেও আমি বহুসংখ্যক অতিথির ভিতর একজনও ইহুদী দেখি নাই। একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, ইহুদীরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে খুব বড়। চিত্রকর, গায়ক, উকিল, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক আর ব্যাঙ্কার এই কয় মূর্ত্তিতে ইহুদীরা ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে পরিগণিত। তাহা সত্ত্বেও সামাজিক লেনদেনে ইয়োরামেরিকা জাতি-বিদ্বেষ ধ্বংস করিতে পারে নাই। এক হিসাবে ইহুদিদের জন্য ইয়োরোপের সাধারণ খৃষ্টান সমাজে এক প্রকার

"অচল" বলিলেই ভারতবাসী তাহাদের সামাজিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে। বহুসংখ্যক ইয়োরামেরিকান প্রটেস্‌টাণ্ট, ক্যাথলিক ও ইহুদী পরিবারের ভিতরকার কথা আমার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অন্তগত। কাজেই অনেক কিছু দেখিবার শুনিবার সুযোগ জুটিয়াছে। ধর্ম্মবিদ্বেষ ঐ সকল দেশের একটা মস্ত বড় কথা। আর তার প্রভাব রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও খুব বেশী। অতএব বুঝা গেল যে, ধর্ম্মগত ভেদ, ধর্ম্মবিদ্বেষ, ধর্ম্মকলহ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ইয়োরোপের ছোট ছোট দেশগুলি এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ ধর্ম্মের ঐক্য স্বাধীনতার ভিত্তি নয়। ধর্ম্মের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষ স্বাধীন জাতি, দেশ বা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। আর তাহাই ইতিহাসের চোখে স্বাভাবিক কথা। এই সকল ধর্ম্মগত অনৈক্য আছে বলিয়া হাঙ্গারিকে আধুনিক ইয়োরামেরিকার রাষ্ট্রবীরেরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে অযোগ্য বিবেচনা করে কি? এই সকল অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গারির নরনারীকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই কি? মনে রাখা আবশ্যক যে, হাঙ্গারি মাত্র আশী লক্ষ নরনারীর বাসভূমি, অর্থাৎ এই সামান্য সংখ্যক লোক যেখানে বাস করে সেরূপ ছোট দেশেও ধর্ম্মের অনৈক্য, গণ্ডগোল ও ঝগড়া কোঁদল প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান। আর তাহা সত্ত্বেও সেই সব নরনারীকে স্বাধীন রাষ্ট্রের নর-নারী বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

যথার্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

এই সকল কথা বুঝিতে পারিলে যুবক ভারতের গঠনমূলক ভবিষ্যপন্থী কর্ম্মবীরেরা ধর্ম্মগত ঐক্যের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। আর তাহা হইলে দুনিয়ার ছোট বড় মাঝারি দেশে যে-প্রণালীতে ও যে পথে রাষ্ট্র

গড়িয়া তোলা হইয়াছে সেই প্রণালীতে এবং সেই পথে ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন স্বস্বপ্রধান ছোট বড় মাঝারি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার দিকে ভারতবাসীর মতিগতি খেলিতে থাকিবে। আর তাহা হইলেই সুরু হইবে ভারতে যথার্থ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অ, আ, ক, খ,। ১৯৩১ সনের যুবক বাঙলা এই নবীন দর্শন স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছে কি? দেখা যাউক আগামী দুই তিন বৎসরে এই প্রশ্নের কি জবাব দেয়।

বঙ্গ-সমাজের রূপান্তর ও নিরক্ষরের অধিকার

বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর একটা নয়া বাঙ্গলা গড়িয়া উঠিয়াছে। চোখ খুলিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালী জাতি বাস্তবিক পক্ষে একটা গভীর রূপান্তর পাইয়া বসিয়াছে। এই রূপান্তর আজকাল আর তত বেশী অস্পষ্ট নয়। বাঙ্গলার নরনারী বলিলে ১৯০৫ সনের যুগে আমরা যে ধরণের লোকজন বুঝিতাম, ১৯৩২ সনে একমাত্র সেই ধরণের লোকজনই বুঝি না। নতুন নতুন রঙের, নতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন নামের, নতুন নতুন ঢঙের নরনারী বাঙ্গালী জাতের অন্তর্গত, —একথা আমরা আজ বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে আর কলিকাতার মতন কেন্দ্রস্থলেও অহরহ বুঝিতেছি। সোজা কথায়, আমরা আমাদের চোখের সামনে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে একটা সুবিস্তৃত বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি। এই সমাজবিপ্লব আরও বাড়িয়া যাইবে, অতি অল্পকালের ভিতরই আরো গভীরতর রূপে বাঙ্গালীজাতের অলিতে গলিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

বাঙ্গালী জগতে মুসলমান শক্তি

১৯০৫ সনের সম সম কালটা একবার কল্পনায় ফিরাইয়া আনা যাউক। দেখা যাউক তখনকার দিনে বাঙ্গালীর সাহিত্যসভায় কোন্ শ্রেণীর লোক, কোন্ নামের লোক, কোন্ রূপের লোক দেখা যাইত। শিক্ষার আন্দোলন

বলিলে কিরূপ বাঙ্গালীর কথা, কিরূপ বাঙ্গালীর নাম শুনা যাইত? দেখা যাউক সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যে সকল বাঙ্গালী যোগদান করিত তাহাদের হাড় মাস, তাহাদের গোত্র বংশ, তাহাদের পদবী উপাধি কোন্ আকারপ্রকারের ছিল। এই সকল প্রশ্ন একটু বেশ বস্তুনিষ্ঠভাবে তলাইয়া মজাইয়া আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলেই বেশ মনে পড়িবে যে সেই ১৯০৫ সনের স্বদেশী যুগে আমাদের সাহিত্য সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ কর্ম্মে প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিই ছিল হিন্দু।

সে কালে মুসলমান বাঙ্গালী এই সকল আন্দোলনে পুরাপুরি না হইলেও প্রচুর পরিমাণেই অজ্ঞাত ছিল। বাঙ্গালীর সার্ব্বজনিক জীবন বলিলে সেকালে আমরা হিন্দু বাঙ্গালীর কর্ম্মকথাই বুঝিতাম। মুসলমান বাঙ্গালীও যে বাঙ্গালী জাতের এক অঙ্গ সে কথা তখনকার দিনে আমরা বড় বেশী মনে রাখিতাম না। এমন কি তখনকার দিনে বাঙ্গালী বলিলে বুঝিতাম একমাত্র হিন্দুকে। মুসলমান শব্দটা অন্ততঃ বাঙ্গালী হিন্দুর মুখে যেন অ-বাঙ্গালীই বুঝাইত। আজ ১৯৩২ সনে ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালী জাতটা কিরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে? মুসলমানেরাও যে বাঙ্গালী তাহা আজকাল যখন তখন যেখানে সেখানে বিনা গবেষণায়, বিনা কষ্টকল্পনায় সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। বাঙ্গালী জাতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মুসলমানেরা আজ কাল অন্যতম প্রবল শক্তি। ১৯৩০ সনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার ভিতর মুসলমান পুরুষ ও নারী অনেক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালী সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছে। আজকালকার সার্ব্বজনিক সভাসমিতিতে হিন্দুর ডাইনে বাঁয়ে, হিন্দুর সম্মুখে পশ্চাতে দেখিতে পাই মুসলমান-যুবককে, মুসলমান-প্রবীণকে।

যুবক মুসলমান বাংলা দেশকে বাঙ্গালী হিসাবে দুনিয়ার রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গলার মুসলমান বাঙ্গালী রাষ্ট্রবীর হিসাবে জগতে গৌরবান্বিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। মফঃস্বলের যে কোন সংবাদপত্রই খুলি না কেন,—আর কলিকাতার ত কথাই নাই, সর্ব্বত্রই,—মুসলমান রাষ্ট্রকর্ম্মীদের নাম হামেসা চোখে পড়ে। বাঙ্গালীর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এই যুগে আর একমাত্র হিন্দু ভাবাপন্ন হয়। বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মুসলমান প্রভাব হিন্দু প্রভাবের প্রায় সমকক্ষরূপে মর্য্যাদা লাভ করিতেছে।

পাঠশালায় মুসলমান

বাঙ্গলা দেশের গ্রাম্যপাঠশালাগুলির দিকে একবার নজর ফেলিয়া দেখি। জেলায় জেলায় যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১৯০৫ সনের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমি এই সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলিতে চাই না। বলিতে চাই এই যে—১৯০৫ সনের গ্রাম্য পাঠশালায় অথবা হাই স্কুলে যে সকল ছাত্র ছাত্রী দেখিতাম তাহার অধিকাংশই হিন্দু। ইস্কুল বলিলে তখনকার দিনে যেন অনেকটা হিন্দু প্রতিষ্ঠানই বুঝা যাইত। আজ সে কথা আর বলা চলে না। ইস্কুলগুলি এক্ষণে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভাবে হিন্দু-প্রাধান্য বর্জ্জন করিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই হিন্দু ছাত্র ছাত্রীর সখা মুসলমান ছাত্র ছাত্রী, মুসলমান ছাত্রের বন্ধু হিন্দু ছাত্র। আগেকার দিনেও ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বন্ধুত্ব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত বটে, কিন্তু তখনকার দিনে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া হিন্দুতে মুসলমানে বন্ধুত্বের সুযোগ সুবিস্তৃত ছিল না। আজকাল বহুসংখ্যক

হিন্দুছাত্র বহুসংখ্যক মুসলমান ছাত্রর সঙ্গে একত্রে গড়িয়া উঠিতেছে। একথা আজকাল কলেজ-জাতীয় উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্বন্ধেও খাটে। মফঃস্বলে অথবা কলিকাতায় যে সকল আই এ, আই এস সি, বি এ, বি এস সি কলেজ আছে তাহাদের ভিতর মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া আসিতেছে। একালের কলেজগুলি একমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান একথা বলা চলে না। বাঙ্গালী জাতের স্বারস্বত আয়তনগুলি কি পল্লীগ্রামে কি সহরে,—সর্ব্বত্রই মুসলমান ছাত্র ছাত্রীর প্রভাবে নূতন গড়ন পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুরা একালে আর কোন প্রকার বিদ্যালয়ে একচেটিয়া প্রভাব অথবা সুযোগ ভোগ করে না। এমন কি চিকিৎসা বিদ্যালয়, টেক্‌নিক্যাল, এঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মুসলমানেরা অল্পে অল্পে হিন্দুদের সঙ্গে সাহচর্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালী জাতের মুসলমান অঙ্গ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাহার ইজ্জত ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া চলিয়াছে।

মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য

এইবার বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা কিছু বলিব। ১৯০৫ সনের যুগে যে কয়জন বাঙ্গালী মুসলমান বাংলা ভাষায় গদ্য ও পদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিত তাহাদের নাম আঙ্গুলে গণা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর কি দেখিলাম? বাঙ্গলা দেশের মফঃস্বলে ও সহরে যে সকল দৈনিক কাগজ চলিতেছে তাহাদের সম্পাদক, সহযোগী, সাংবাদিক ও লেখকদের ভিতর মুসলমান আর নগণ্য নয়। মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যে হাত দেখাইবার দিকে বেশ একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের কৃতিত্বে বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে। মুসলমান মস্তিষ্কের দান পাইয়া বাংলা দেশের চিন্তা নানা তরফ হইতে বিস্তৃততর ও গভীরতর

হইয়া উঠিতেছে। মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। মফঃস্বলের বিভিন্ন জেলায় মুসলমান প্রবন্ধলেখক, মুসলমান কবি, মুসলমান গ্রন্থকার সাহিত্যে ইতিহাসে ও অন্যান্য বিভাগে বেশ উল্লেখযোগ্য রচনা সৃষ্টি করিয়াছে। বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাহারা ঐতিহাসিক গবেষণা করিবেন তাঁহারা একমাত্র হিন্দু লেখকদের রচনার তালিকা দিয়া আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান লেখকদের রচনাগুলিও তালিকাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। দেখা যাইবে যে, মুসলমান লেখকের সংখ্যা ত বাড়িয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রচনা কৌশল, চিন্তা প্রণালী আর দার্শনিক অথবা কর্ত্তব্য প্রচার সংক্রান্ত মতামত সমূহও বাঙ্গালী জাতির আত্মিক উন্নতির সাক্ষী। বাঙ্গালী মুসলমানদের রচিত সাহিত্য বাদ দিলে একালের বাংলা সাহিত্য যারপর নাই দরিদ্র হইয়া থাকিবে। মুসলমানেরা ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের ভিতর পল্লী কৃষাণের জীবন, মফঃস্বলের যথার্থ বাণী, জন সাধারণের আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ভাবে গোটা বাঙ্গালী জাতির নিকট খুলিয়া ধরিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা নবীন ভাবুকতা, একটা তাজা তেজস্বিতা, একটা সরস প্রাণবত্তা বাঙ্গালী জাতিকে চিন্তা ক্ষেত্রে এবং কর্ম্মের আসরে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। বাঙ্গালী জাতি মুসলমানদের নিকট এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি পাইয়া বিশেষরূপে লাভবান হইয়াছে।

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে মুসলমান

এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির আর্থিক জীবন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের কৃতিত্ব বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। বাঙ্গালী চাষী বলিলে প্রধানতঃ মুসলমানই বুঝায়। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানেরা ত চাষ আবাদে এক প্রকার একচেটিয়া স্থান অধিকার করে। চাষীর জীবন

ধারণ বলিলে বাংলাদেশে আমরা মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাই বুঝিয়া থাকি। বাঙ্গালী জাতি যতই আর্থিক উন্নতির কথা ভাবিতে থাকিবে ততই তাহাকে বিশেষ করিয়া চাষীদের অর্থাৎ প্রকারান্তরে বাঙ্গালী মুসলমানদের সুখদুঃখ, বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাস্থ্য, বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘর বাড়ী ও শিক্ষাবিধান ইত্যাদির দিকেই নজর দিতে হইবে। বস্তুতঃ বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানেরা চাষী হিসাবে বাঙ্গালী জাতির চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর কেন্দ্রস্থল হইয়া রহিয়াছে। ১৯০৫ সনের যুগে এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তত নিবিড় ও স্পষ্ট ছিল না। আজ ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছি যে, বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতি বলিলে প্রধানতঃ বাঙ্গালী চাষীর উন্নতিই বুঝিতে হয়। আর বাঙ্গালী চাষীর উন্নতির অর্থই হইতেছে বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক স্বচ্ছলতা। সুতরাং বাঙ্গালী মুসলমানের প্রভাব বাঙ্গালী জাতির চিন্তায় অহরহ বিরাজ করিতেছে। তাহা ছাড়া জেলা হইতে জেলায় মাল আমদানি রপ্তানীর কাজে মুসলমানেরা বেশ তৎপর অথবা অগ্রণী। এদিকে হিন্দু এবং মুসলমানের ভিতর কাহার কৃতিত্ব বেশী তাহা ষ্ট্যাটিস্টিক্সের সাহায্যে মাপিয়া জুকিয়া বলা সম্প্রতি কঠিন। অধিকন্তু কলিকাতা এবং মফঃস্বলের পাইকারী ও খুচরা দোকানদারের ভিতর মুসলমানদের ইজ্জৎ অনেক উচু। এই ক্ষেত্রেও হিন্দু আর মুসলমানদের ভিতর কে বড় তাহা মাপিয়া বলা সহজ নয়। বোধ হয় মুসলমানেরাই এই সকল আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দুর চেয়ে বেশী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। তাহা ছাড়া ছোট বড় মাঝারি শিল্পকর্ম্ম, কুটির-শিল্প কারখানা ইত্যাদির কাজেও মুসলমান পরিচালক, মুসলমান কর্ম্মাধ্যক্ষ মুসলমান ধুরন্ধর বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই নামজাদা। এই সকল কথা ১৯০৫ সনের যুগে বাঙ্গালী জাতি বড় বেশী জানিত কিনা সন্দেহ। আজ কালকার আর্থিক বাঙ্গলায় মুসলমান বেপারী, দোকানদার, কর্ম্মাধ্যক্ষ

ইত্যাদির নাম ডাক খুব বড়। বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী জাতের ভিতর বর্ত্তমানে খুব পাকা পোক্ত ও বলিষ্ঠ অঙ্গ হইতেছে মুসলমানদের বণিক সম্প্রদায়।

অতএব দেখিলাম "ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ" সকল তরফ হইতেই বাঙ্গলার মুসলমান বাঙ্গালী সমাজকে বিগত সিকি শতাব্দীর ভিতর অসংখ্য উপায়ে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বাড়তির পথে বাঙ্গালী জাতির এই যে অভিযান সেই অভিযানে বাঙ্গলার নরনারী মুসলমানের শক্তিতে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলা দেশকে বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দুর মতনই নিজ ভাবুকতার কর্ম্মক্ষেত্র, নিজ কৃতিত্বের গৌরব কেন্দ্র, নিজ ধন দৌলতের ভোগ ভূমি রূপে গড়িয়া তুলিতেছে। ১৯৩০-৩২ সনের বাঙ্গালী জাতি ১৯০৫ সনের বাঙ্গালী জাতি হইতে যে অনেক দফায়ই স্বতন্ত্র আর এই স্বাতন্ত্র্যে যে মুসলমানদের কৃতিত্ব অনেক বেশী তাহা একালের প্রত্যেক বাঙ্গালী জনসেবক, অর্থশাস্ত্রী এবং সমাজ-গবেষকের নিকট একটা মস্ত বড় আবিষ্কার বিশেষ। মুসলমানদের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো বদলাইয়া যাইবে। বাঙ্গালী জাতি একটা বিপুল সমাজবিপ্লবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই তথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া এখন হইতে আমাদিগকে নয়া বাঙ্গলার জন্য সকল প্রকার রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক মুসাবিদা কায়েম করিতে হইবে।

নয়া নয়া হিন্দু পদবীর অভ্যুদয়

মুসলমান শক্তি ছাড়া আরো অন্যান্য তরফ হইতেও বাঙ্গালী জাতির রূপান্তর সাধিত হইতেছে। বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর কাজ কর্ম্ম দেখিলেই অবস্থা-পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করিতে পারি। আবার সেই ১৯০৫ সনের সম সম কাল আলোচনা করা যাউক। তখনকার দিনে বাঙ্গালী হিন্দুর ভিতর

যাহারা সার্ব্বজনিক কাজ কর্ম্মে, সাহিত্য সেবায়, জাতীয় জীবনের অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামজাদা ছিল, তাহারা কেহ বা ঘোষ, কেহ বা বসু, কেহ বা চট্টোপাধ্যায়, কেহ বা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেহ বা সেন, কেহ বা গুপ্ত ইত্যাদি পদবীর লোক ছিল। অর্থাৎ হিন্দু জাতি ব্যবস্থার তথাকথিত উচ্চ জাতীয় লোকই সেকালের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে উল্লেখযোগ্য কাজ করিত। ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর এদিকে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি। আজকাল যে সকল হিন্দু পরিবার দেশের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করিতেছে তাহাদের পদবীগুলি এখন আর একমাত্র ঐরূপ নয়। যে কোন খবরের কাগজই দেখি না কেন, কি মফঃস্বলের কি সহরের সকল কাগজেই লোকজনের নামের ভিতর নতুন নতুন পদবীর সাক্ষাৎ পাই। হাজার হাজার লোক ১৯২৯-৩০ সনের পরবর্ত্তী যুগে জেলে গিয়াছে। তাহাদের নামগুলি দেখিলেই একথাটি বেশ বুঝিতে পারি। তাহাদের পারিবারিক পদবী যে ধরণের সেই ধরণের পদবী আমরা ১৯০৫ হইতে ১৯১০ সনের যুগে বাঙ্গালী সার্ব্বজনিক জীবনের আবহাওয়ায় বড় একটা দেখিতাম না। বস্তুতঃ বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের ভিতর যে কত বিচিত্র রকমের পদবী আছে তাহা আমরা এই সিকি শতাব্দীর ভিতর ক্রমে ক্রমে অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। হিন্দু পারিবারিক বংশ-বৈচিত্র্য একালের রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য সামাজিক মজলিসে একটা নূতন শক্তিরূপে দেখা যাইতেছে।

এই পদবী-বৈচিত্র্য অর্থাৎ নয়া নয়া পদবীর অভ্যুদয় একমাত্র কংগ্রেস কনফারেন্স ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সংযুক্ত নয়। ইস্কুল কলেজের ছাত্র-তালিকায়ও এইরূপ নয়া নয়া পদবীর সাক্ষাৎ পাই। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় অথবা কলিকাতার কলেজে যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা লেখাপড়া করিতেছে তাহাদের পদবীগুলি আজকাল নতুন

চড়ের। বাস্তবিক পক্ষে বিগত পঁচিশ বৎসরের ইস্কুল কলেজের ছাত্র তালিকাগুলি যদি ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করি তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির রূপান্তর সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারে। আর এই তালিকাগুলি যদি ১৮৮৫ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত বিশ বৎসরের ছাত্র তালিকার সঙ্গে তুলনা করি তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি যে সত্য সত্যই একটা বিপুল বিপ্লবের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এক কথায় বলা উচিত যে, আজকালকার ইস্কুলকলেজের আবহাওয়ায় কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর একচেটিয়া প্রাধান্য আর নাই।

অনুচ্চ জাতির কৃতিত্ব

হিন্দু সমাজের বহুসংখ্যক নিম্ন-মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর সন্তানসন্ততি শিক্ষাক্ষেত্রের অলিতে গলিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে আমাদের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, সংবাদ পত্রের লেখক লেখিকা ইত্যাদির আকার প্রকারও যথেষ্ট বদলাইয়া যাইতেছে। আজকালকার শক্তিশালী কবি, প্রবন্ধলেখক, বক্তা. বিজ্ঞানসেবক ইত্যাদি নরনারীর ভিতর অনেকেই তথাকথিত অনুচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি। আজকালকার দিনে এই সকল অনুচ্চ শ্রেণীর দান বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের চিন্তাক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে এত বেশী যে, কি কলিকাতায় কি মফঃস্বলে কোথাও আমরা কোনো কৃতী পুরুষ বা মহিলার জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। একালে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অন্যান্য শ্রেণীর কৃতিত্বশীল হিন্দুর কাজ কর্ম্মকে সহজে এক কথায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব রূপেই সমঝিয়া থাকে। এই সকল কথা মুসলমান শক্তি সম্বন্ধে যতটা খাটে হিন্দুজাতির অনুচ্চ শ্রেণী সম্বন্ধেও ঠিক ততটাই খাটে। মুসলমান শক্তির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতি যতটা রূপান্তরিত হইতেছে এই সকল অনুচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর কৃতিত্বে ও

বাঙ্গালী জাতি ঠিক ততটাই বৈচিত্র্যশীল ও দৌলত্‌মন্দ হইয়া উঠিতেছে। এই সকল বিষয়ে বাঙ্গলাদেশের জননায়কগণ অথবা সাহিত্যস্রষ্টারা অনেকে হয়ত সজাগ নহেন। এত বড় বিপ্লব আমাদের চোখের সম্মুখে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে ঘটিয়া যাইতেছে তাহা সজ্ঞানে বুঝিবার অথবা আলোচনা করিবার চেষ্টা হয়ত আমাদের সমাজে এখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু আমরা সকলেই একটা বিরাট ওলট-পালট এবং সামাজিক পুনর্গঠনের আবহাওয়ায়ই জীবন ধারণ করিতেছি। এই প্রভাবের কথা যে সকল অর্থশাস্ত্রী অথবা সমাজ-গবেষক অথবা জনসেবক আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবে তাহারা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার সাধনের আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

"আদিম" জাতির ক্রমিক বিকাশ

এইবার আরো কিছু গভীরতর ভাবে বাঙ্গালী জাতির সমাজ-রূপান্তর আলোচনা করিব। মুসলমানেরাও বাঙ্গালী আর হিন্দুজাতির অনুচ্চ শ্রেণীরাও বাঙ্গালী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতি ফুলিয়া উঠিতেছে ইহা সহজেই অনুমেয় ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি কতকগুলি অ-বাঙ্গালী নরনারীর শক্তিতেও যে, ফুলিয়া উঠিতেছে একথাও একালের সমাজ সম্বন্ধে একটা বড় কথা। আবার বিগত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের কথাই বলিব। এই সময়ের ভিতর বহু সংখ্যক "আদিম" জাতি বাঙ্গালী সমাজের ভিতর ক্রমে ক্রমে স্থির ঘর করিয়া বসিয়াছে। আদিম শব্দে ঠিক কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট হাড়মাসওয়ালা জাতি বুঝিতেছি না। একমাত্র বুঝিতেছি এই যে, তাহারা বাঙ্গালী নামে সাধারণতঃ পরিচিত নয়। তাহার ধর্ম্ম হিন্দুও নয় মুসলমানও

নয়। তাহাদিগকে সহজে পাহাড়ী বুনো অথবা এই ধরণের তথাকথিত সভ্যতার গণ্ডীর বহির্ভূত জনপদের অধিবাসী বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রত্যেক জনপদে এই ধরণের আদিম জাতির বাস আগেও ছিল এখনও আছে। বিশেষ কথা এই যে, তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্ত্তী যুগে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় বাঙ্গালী নরনারীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষ ভাবে যে সকল জিলা পাহাড়ী জনপদের লাগাও—যথা ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, বর্দ্ধমান ইত্যাদি—সেই সকল জেলায় এই অ-বাঙ্গালী, অ-হিন্দু, অ-মুসলমান পার্ব্বত্য অথবা বন্য জাতির প্রভাব বিশেষরূপেই লক্ষ্য করিতে পারি। এই জাতিগুলিকে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে প্রধানতঃ সাঁওতাল জাতীয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে তাহাদিগকে সহজে গারো খাসিয়া ও অন্যান্য আসামের পাহাড়ী জাতি বলা যাইতে পারে। এই সকল জাতীয় নরনারী পূর্ব্বে অনেকটা দূরে দূরে থাকিত। কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা বাঙ্গালী জাতির হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে একত্র অথবা পাশাপাশি চাষ আবাদের কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

"আদিম" ও হিন্দুমুসলমানের আর্থিক লেনদেন

বাঙ্গলা দেশের চাষী বলিলে এখন আর কেবল মাত্র মুসলমান অথবা হিন্দু ও মুসলমান বলা চলিবে না। বাঙ্গালী চাষার ভিতর এই অবাঙ্গালী আদিম পার্ব্বত্য জাতীয় চাষীও অন্যতম। বাংলা দেশের ধনদৌলত সৃষ্টির কাজে এই সকল আদিম জাতির কৃতিত্ব এই যুগে খুব বড়। ইহাদের প্রভাব এখনও প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী জাতির জননায়কগণের নিকট মালুম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সকল আদিম জাতির শক্তি বাঙ্গালী সমাজকে অর্থনৈতিক তরফ হইতে একটু বড় গোছের রূপান্তর

প্রদান করিবার সূত্রপাত করিয়াছে। এখনও চাষ আবাদই এই সকল আদিম জাতির প্রধান পেশা দেখিতে পাই। কিন্তু হাতের কাজ, কুটীর শিল্পও কিছু কিছু করিয়া তাহাদের তাঁবে আসিতেছে। এই সকল আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আদিম জাতিগুলি বাঙ্গালী হিন্দু এবং মুসলমানের অলিতে গলিতে আড্ডা গাড়িয়া বসিতেছে। ইহাদের অনেকেই আজকাল বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের ধরণধারণ আচার-সংস্কার ইত্যাদি কিছু কিছু গ্রহণ করিতেছে। তাহাদের ভিতর কেহ কেহ বোধ হয় মুসলমান-ভাবাপন্নও হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চাষ আবাদ চালানো, গরুর গাড়ী হাঁকানো, কর্ম্মকারের কাজ করা, চাটাই বোনা ইত্যাদি আর্থিক কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে আদিম জাতির সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মেলামেশা হামেশা নিবিড়রূপেই সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ আর্থিক আদান-প্রদানের প্রভাবে সমাজ আপনা-আপনিই এমন কি অনেকটা অজ্ঞাতসারেও বদলাইয়া যাইতেছে। আদিম জাতির প্রভাব বাঙ্গালী সমাজে মুসলমান শক্তির অথবা অনুচ্চ হিন্দু শক্তির সমান এখনও নয়। কিন্তু আদিম জাতিগুলি আর্থিক জীবনের নিম্নতম স্তরে সুরু করিয়া বাঙ্গালী জাতির গোড়াটা পাকড়াও করিয়া বসিতেছে।

তাহার ফলে অনতিদূর ভবিষ্যতে যে বাঙ্গালী জাতি দেখিতে পাইব তাহার ভিতর এই সকল আদিম জাতির দান খুব উঁচু স্থানই অধিকার করিবে। এই ধরণের আদিম জাতির নাম নানা জেলায় নানারূপ। তাহাদের প্রত্যেকেরই আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সম্প্রতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তনে যাঁহারা মোতায়েন আছেন তাঁহাদিগকে এই সকল জাতির ঠিকুজী কুষ্ঠী, আচার ব্যবহার, জীবনের গতি ভঙ্গী সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহারা আমাদের খনিতে মজুরের কাজ করিতেছে, কারখানায়

মজুর যোগাইতেছে, চাষ আবাদ সুরু করিয়াছে, গাড়ী হাঁকাইতেছে, নৌকা চালাইতেছে, মাল বহিতেছে। কোন কোন স্থানে ছোটখাট দোকানদারীতেও তাহারা বহাল আছে। এই সকল অবাঙ্গালী জাতিকে আর কতদিন ধরিয়া আমরা অবাঙ্গালী বলিব তাহা বলা কঠিন। কিন্তু এই ধরণের বহুসংখ্যক আদিম পার্ব্বত্য এবং বন্য জাতি ইতিমধ্যেই অনেকাংশে বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছে। আর অল্পকালের ভিতরেই এই ধরণের অবাঙ্গালীকে বাঙ্গালীতে রূপান্তরিত করার প্রভাব নানা কর্ম্মক্ষেত্রেই অনেক কিছু দেখিতে পাইব।

বৃহত্তর বঙ্গ

আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এই সকল আদিম জাতি একটু একটু করিয়া বাংলা ভাষা ইতিমধ্যেই দখল করিয়া বসিয়াছে। বাংলাভাষী নরনারীর ভিতর এই ধরণের অবাঙ্গালী পাহাড়ী নরনারীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে, ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ধরণে কাপড় শাড়ী পরা, বাঙ্গালীর ব্রতানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, বাঙ্গালীর যাত্রাগানে মাতোয়ারা হওয়া, বাঙ্গালীর সৌজন্য শিষ্টাচার একটু একটু করিয়া রপ্ত করা এ সবই সাঁওতাল গারো ইত্যাদি অবাঙ্গালী জাতির মগজে এবং ধাতে বসিয়া যাইতেছে। আগেই বলিয়াছি কেহ হিন্দু ভাবাপন্ন হইতেছে, কেহ বা মুসলমান ভাবাপন্ন হইতেছে। এক কথায় বলিব যে, বাঙ্গালী সভ্যতা, বাঙ্গালী উৎকর্ষ, বাঙ্গালী কৃষ্টি সবই নতুন নতুন জাতের ভিতর দিগ্‌বিজয় করিতেছে। বহু সংখ্যক আদিম জাতীয় নরনারীকে নিজ আওতার ভিতর পাইয়া বাঙ্গালী সভ্যতা বৃহত্তর হইয়া উঠিতেছে। আমরা বাংলা দেশের ভৌগোলিক চৌহদ্দির ভিতর ইতিমধ্যেই একটা "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়িয়া তুলিয়াছি।

বাঙ্গালী জাতির এই যে সকল রূপান্তরের কথা বলিলাম তাহা ১৯০৫ সনের যুগে অনেকটা দুর্ব্বোধ্য ছিল। ১৮৮৫ সনের যুগে বোধ হয় কেহই এ কথা কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। আমরা যে বাংলা দেশে বসবাস করিতেছি সেই বাংলা দেশ আমাদের ঠাকুরদাদাদের বাংলা দেশ হইতে অশেষ প্রকারে বিভিন্ন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কেবল লোকবল সংক্রান্ত উঠানামা অথবা ওলটপালটের কথাই বলিলাম। বাঙ্গালী জাতির কাঠাম রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী নরনারীর হাড়-মাস একালে যেমন, সেকালে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর আগে আর পঞ্চাশ বৎসর আগে সেইরূপ ছিল না। যে বাংলা দেশে আমরা বাস করিতেছি সেই দেশ বাস্তবিকই একটা নতুন দেশ, ইহাতে নতুন রক্ত প্রবেশ করিয়াছে, নতুন নাম দেখিতেছি, নতুন পদবীর সাক্ষাৎ পাইতেছি, লোক জনের চেহারায়ও অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে।

রক্ত-সংমিশ্রণ

বস্তুতঃ যাঁহারা বিস্তৃততর অথবা বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বাঙ্গালী সমাজের ভিতরকার বিবাহ-প্রথা আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের তথাকথিত জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও অনুলোম-প্রতিলোম কাণ্ড অনেক ঘটিতেছে। যে সকল নরনারীকে আমরা হিন্দু বলি তাহাদের জনক-জননীর ভিতর সকলেই হিন্দু কিনা এই সম্বন্ধে নৃতত্ত্বসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আবশ্যক হইবে। যাহাদিগকে মুসলমান নরনারীর অন্তর্গত করা হয় তাহাদের ভিতর অমুসলমান হাড়মাস কতটা আছে তাহাও গবেষণা ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত বিষয়। আবার তথাকথিত আদিম অনার্য্য বুনো অহিন্দু অমুসলমান নরনারীর হাড়মাস আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর্য্য, হিন্দু, মুসলমান এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর নরনারীর

ভিতর কতটা প্রবেশ করিয়াছে তাহাও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার সামগ্রী বিবেচিত হইবার কথা। আর তাহা ছাড়া জেলায় জেলায় যে সব বহুসংখ্যক বহুবিধ তথাকথিত অনুচ্চ জাতির বসবাস তাহাদের ভিতর বিজাতীয় রক্তের ধারা কত বিচিত্র উপায়ে প্রবেশ করিতেছে তাহাও আর গবেষণার বহির্ভূত থাকিতে পারে না।

বাঙালীর আর্থিক উন্নতি কাহাকে বলে ?

সমাজবিপ্লবের বিভিন্ন অঙ্গ এবং ধারা সম্বন্ধে আমাদিগকে শীঘ্রই সজাগ ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আর একথা যাঁহারা বুঝিবেন তাহারাও দেখিবেন যে বাংলা দেশ বা বাঙ্গালা জাতি বলিলে আমাদের ঠাকুরদাদারা যে ধরণের ধারণা করিতেন সেই ধরণের ধারণা আজকাল আমরা পুষিলে পদে পদে আমাদিগকে বিব্রত হইতে হইবে। বাংলার সম্পদ, বাঙ্গালা জাতির দান, বাংলার সার্ব্বজনিক জীবন, বাঙ্গালার সভ্যতা, বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি বাঙ্গালীর গণতন্ত্র, বাংলার স্বরাজ ইত্যাদি শব্দে আমরা কি বুঝিব ? এই সকল শব্দ এতদিন পর্য্যন্ত আমরা নেহাৎ শব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছি। এখন আর আমাদিগকে একমাত্র হিন্দুর কথা ভাবিলে চলে না,* একমাত্র তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর কথা ভাবিলে চলে না, একমাত্র মুসলমানের কথা ভাবিলে চলে না। আমাদিগকে একসঙ্গে অসংখ্য অস্পৃশ্যের কথাও ভাবিতে হয়, ডোম, বাগ্দী, হাড়ি, হাড়িপা ইত্যাদির কথা ভাবিতে হয়, বারুই পোদ মাহিষ্য ইত্যাদি অসংখ্য শ্রেণীর কথা ভাবিতে হয়, সাঁওতাল রাজবংশী গারো খাসিয়া ইত্যাদি ধরণের আরও অনেক লোকের, অনেক জাতির

* বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের মালদহ অধিবেশনে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার সারমর্ম্ম (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)।

কথা ভাবিতে হয়। গোটা বাংলা দেশের কথা ছাড়িয়া শুধু যদি একটা জেলার কথাও ভাবি তাহা হইলেও দেখি যে তাহার পাঁচ কিংবা ছয় কিংবা সাত লাখ নরনারীর ভিতর অসংখ্য বৈচিত্র্য রহিয়াছে। এই অশেষ বৈচিত্র্যের ভিতর কোন্ লক্ষণটাকে বাঙ্গালী বলিব, কোন্ লোকের কান্তিকে বাঙ্গালীর কান্তি বিবেচনা করিব, কোন্ চাষীকে বাঙ্গালী চাষী বিবেচনা করিব, কোন্ মিস্ত্রীকে বাঙ্গালী মিস্ত্রী বিবেচনা করিব, কোন্ মাঝিকে বাঙ্গালী মাঝি বিবেচনা করিব? বাংলা দেশের সেবক, বঙ্গীয় গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তক, বাঙ্গালী স্বরাজের প্রচারক ইত্যাদি রূপে যখন আমাদের স্বদেশসেবকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন তাহারা এই পাঁচ ছয় সাত লক্ষ লোকের ভিতর কোন্ কোন্ অংশটাকে বাদ দিয়া কোন্ কোন্ অংশের সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন?

চোখের সম্মুখে দেখিতেছি অসংখ্য ওলট পালট। অহিন্দু হিন্দু হইতেছে, অমুসলমান মুসলমান হইতেছে, অবাঙ্গালা বাঙ্গালা হইতেছে, অনুচ্চ উচ্চ হইতেছে। আর তাহা ছাড়া বিবাহের ফলে অথবা অন্য কোনো কারণে রক্তের সঙ্গে অন্য রক্ত আসিয়া মিশিতেছে। বাঙ্গালীর হাড়মাসের ঠিকুজী কোনো একটা সোজা পথে চলিতেছে না। এই অবস্থায় কোনো বৈঠক-খানার মজলিসে বসিয়া বাঙ্গালা জাতির আর্থিক, রাষ্ট্রিক আর সামাজিক পাতি দেওয়া চলিবে না। নয়া বাংলার জন্য যে ধরণের মুসাবিদা করা আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজবংশীকে রাজবংশী, সাঁওতালকে সাঁওতাল, মাহিষ্যকে মাহিষ্য, ডোমকে ডোম, মুসলমানকে মুসলমান, এবং হিন্দুকে হিন্দু—এই সকল শ্রেণীর নরনারীগুলির নাক গুণিয়া প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ, প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেকের আত্মকর্ত্তৃত্ব, প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সজাগ ভাবে কার্য্যে নামিতে হইবে।

স্বদেশ-সেবকের নতুন অভিজ্ঞতা

এই ধরণের কাজে ইতিমধ্যেই অনেক বাঙ্গালী নামিয়াছে। তাহারা বাংলা দেশের জেলায় জেলায় অবাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়াছে, অহিন্দুর সঙ্গে মিশিয়াছে, অমুসলমানের সঙ্গে মিশিয়াছে, অস্পৃশ্য এবং অনুচ্চ শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গেও আনাগোনা করিয়াছে। এই ধরণের রাষ্ট্রসেবক, সমাজসেবক, স্বদেশব্রতধারী কর্ম্মীর সংখ্যা যতবেশী হওয়া উচিত বোধ হয় এখনও তত বেশী হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অভিজ্ঞতা গুলি একালের সার্ব্বজনিক জীবনে একটা নতুন সম্পদ। ১৯০৫ সনের যুগে আমরা এই সকল নতুন নতুন শ্রেণীর নরনারীর জীবন সম্বন্ধে, কর্ম্ম সম্বন্ধে, আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সামাজিক লেনদেন ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় এক প্রকার কিছুই জানিতাম না। বিগত ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের ভিতর আমাদের স্বদেশসেবকেরা এই সকল নরনারীর সঙ্গে মিশিবার ফলে একটা নয়া বাংলার সাক্ষাৎ পাইয়াছে।

তাহারা এই সকল নতুন নতুন লোকজনকে সনাতন বাংলার হিন্দু মুসলমানের সমকক্ষ অথবা জুড়িদাররূপেও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাদের বিবেচনায় সাওতাল রাজবংশী ডোম ইত্যাদি জাতি বাঙ্গালী সমাজে আর নগন্য নয়। তাহারা দেখিয়াছে যে নমঃশুদ্র বারুই পোদ ইত্যাদি জাতীয় নরনারীর ভিতর তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর নরনারীর সু-কু সবই বিরাজ করিতেছে। তাহারা দেখিয়াছে যে, মুসলমানের কৃতিত্ব বাঙ্গালী সমাজে হিন্দুদের কৃতিত্বেরই অনুরূপ। এই সকল অভিজ্ঞতার মূল্য ঢের। আমি এগুলিকে অন্যান্য আবিষ্কারের মতনই গৌরবজনক আবিষ্কার বিবেচনা করি। এই ধরণের আনাগোনার ফলে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক নতুন জ্ঞান জন্মিয়াছে।

যাহারা মজুরদের সঙ্গে মজুর-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতেছে অথবা অন্যান্য উপায়ে মজুর আন্দোলনে সাহায্য করিতেছে তাহাদের অভিজ্ঞতা এই তরফ হইতে বিশেষ মূল্যবান। আমাদের ভিতর যাহারা সমবায় আন্দোলনের পরিদর্শকরূপে বহাল আছে তাহারা আমাদের চাষী সমাজের নাড়ী নক্ষত্র ভালরূপে জানে। আমাদের ভিতর যাহারা হিন্দু-মিশন সংক্রান্ত কাজে মোতায়েন আছে তাহাদের ভিতর অস্পৃশ্য ও অহিন্দু সমাজের নানা কথাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক অথবা অন্যান্য গ্রন্থকার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক বাংলা দেশের যে সকল তথ্য সম্বন্ধে নেহাৎ আনাড়ি সেই সকল তথ্যও এই সকল স্বদেশসেবকদের অভিজ্ঞতার ভিতর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছে।

অপূর্ব্ব আবিষ্কার

এই সকল অভিজ্ঞতার ভিতর যে সত্যটা খুব বড় রূপে পাকড়াও করিতে পারি তাহা এই যে, বাঙ্গালী জাতির উচ্চতর স্তরে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান লেখা পড়া শিখিয়াছে, দুই পয়সা রোজগার করিয়া সমাজে গণ্য মান্য হইয়াছে তাহাদের তুলনায় এই সকল নগন্য নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ও আদিম নরনারীরা বাস্তবিক পক্ষে নিকৃষ্ট নয়। খাদে যে সকল লোক কাজ করে, রেলওয়ে ষ্টীমারের কুলী ও খালাসীরা, চা বাগানের কুলীরা, ফ্যাক্টরী-কারখানার মজুরেরা আর পল্লীগ্রামের কৃষাণ নরনারী বাঙ্গালী জাতির শতকরা আশি পঁচাশি জন। ইহারা বাংলা দেশের কোনো কর্ম্মক্ষেত্রেই মাথা খাড়া করিয়া কাজ করে না। তাহারা সোজা সুজি ডুবিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল ডুব-মারা বাঙ্গালী নরনারী পয়সাওয়ালা, নামজাদা, লিখিয়ে-পড়িয়ে উচ্চপদস্থ হিন্দু

মুসলমানের চেয়ে খাটো নয়। একথাটা বিগত পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা-গুলার ভিতর অন্যতম বড় অভিজ্ঞতা।

নিরক্ষরকে অশিক্ষিত বলা চলে না

কথাটা খুলিয়া বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক। নিরক্ষর নরনারীর কথা বলিতেছি। নিরক্ষর শব্দে বুঝিতে হইবে অতি সোজা কথা। লোকগুলি লিখিতেও পারে না পড়িতেও পারে না। কিন্তু নিরক্ষর বলিলে আমি লোকগুলিকে অশিক্ষিত বলি না। নিরক্ষর লোকেরাও বেশ শিক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে অশিক্ষিত কোনো লোক আছে কিনা সন্দেহ। যে লোক বেত বুনিয়া টুক্রী তৈরী করে তাহার মগজে কিছু না কিছু ধী আছেই আছে। যে লোক দিনের পর দিন নিয়মিতরূপে হাল চালায়, বলদ সেবা করে, গাড়ী হাঁকায়, নৌকা বহে সে লোক হয়ত লিখিতে পড়িতে পারে না। কিন্তু তাহার মগজও আছে আর সেই মগজের ভিতর চিন্তা করিবার শক্তিও আছে। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, কাজ করিতে করিতে প্রত্যেক লোকই, সে যত বড় নিরক্ষর হউক না কেন, দিনের পর দিন তাহার মগজ চষিয়া যাইতেছে। কাজের সঙ্গে সংস্পর্শে মগজ চষার ফলে তাহার জ্ঞান বাড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে সে সজ্ঞানে সজাগ ভাবে মাথা খেলাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। কাজেই বাংলা দেশের যে সকল নরনারী এখনও লিখিতে পড়িতে পারে না তাহাদিগকেও আমি শিক্ষিত জ্ঞানী চিন্তাশীল ও মস্তিষ্কজীবী নরনারীর ভিতর গণ্য করিতে অভ্যস্ত।

লেখাপড়া জিনিষটা পৃথিবীতে মাত্র সেদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি "সার্ব্বজনিক" লেখাপড়ার কথা বলিতেছি। পঁচাত্তর কি শ' দেড়শ'

বৎসর আগে দেশ সুদ্ধ লোকের লেখাপড়া পৃথিবীর কোথাও দেখা যাইত না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে-যুগে সার্বজনিক লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল না সে-যুগের নরনারী কি অশিক্ষিত ছিল? আমার বিবেচনায় চরম নিরক্ষরতার যুগেও হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে বহু সংখ্যক শিক্ষিত সভ্য কৃষ্টিশীল নরনারী জগতে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছে। একথা কি এশিয়ার কি ইয়োরোপের মধ্যযুগ ও প্রাচীন কাল সম্বন্ধে সর্ব্বদাই প্রযোজ্য। মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের সভ্যতা-ভব্যতা নাম সই করিবার ক্ষমতার উপর, খবরের কাগজ পড়িবার উপর পাঠশালায় গিয়া কয়েকটা পাশ করিবার উপর নির্ভর করে না। এখানে একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের বাংলাদেশে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত পয়সাওয়ালা সম্ভ্রান্ত হিন্দুমুসলমানের বাড়ীতেও আজ পর্য্যন্ত বহু নারীই নিরক্ষর একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের এম্. এ, ডি. এল্. উপাধিওয়ালা সুশিক্ষিত জননায়কের নিরক্ষর মা বোন অথবা মাসী কিংবা ঠানদিদি জ্ঞানে চিন্তায় বুদ্ধিমত্তায় তাহার নিজের পাশকরা পত্নীর চেয়ে খাটো কি? বাংলাদেশের কোন্ যুবা তাহার বৃদ্ধা মাকে অশিক্ষিত,—নিরক্ষরতার দরুণ অশিক্ষিত বলিতে সাহসী? এই সামান্য দৃষ্টান্তেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালী সমাজের লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান ও আদিম নরনারী নিরক্ষর বলিয়াই তাহাদিগকে অশিক্ষিত জ্ঞানহীন মূর্খ অথবা নির্ব্বোধ বিবেচনা করা চরম আহাম্মুকি। আমাদের চাষী, আমাদের মিস্ত্রী, আমাদের জোলা, আমাদের তাঁতী, আমাদের কর্ম্মকার আমাদের কুমোর আমাদের ঘরামী, আমাদের মাঝি সকলেরই শিল্প-নৈপুণ্য আছে, হস্তপটুত্ব আছে। এই শিল্প-নৈপুণ্য আর এই হস্ত-পটুত্ব যে কেবল মাত্র স্বভাবজ গুণ তাহা নয়। জীবনব্যাপী ধারাবাহিক সংস্কারের প্রভাবে এই স্বাভাবিক পটুত্ব ও নৈপুণ্য অশেষ উপায়ে পরিপুষ্ট

হইয়াছে। ফলতঃ জাপানী চাষী মিস্ত্রির চেয়ে, ইতালিয়ান চাষী মিস্ত্রীর চেয়ে, ফরাসী জার্ম্মাণ ইংরেজ ও মার্কিণ চাষী মিস্ত্রীর চেয়ে বাঙ্গালী জাতির নিরক্ষর চাষী মিস্ত্রীরা কোন অংশে হীন নয়। দুনিয়ার যে কোনো চাষী মিস্ত্রীর সঙ্গে আমাদের চাষী মিস্ত্রী সমানে সমানে টক্কর দিয়া চলিতে পারে।

জ্ঞানকাণ্ডে নিরক্ষর বনাম লিখিয়ে-পড়িয়ে

এইবার আমাদের চাষী ও মিস্ত্রীর সঙ্গে অর্থাৎ তথাকথিত নিরক্ষর বাঙ্গালী নরনারীর সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত ইস্কুলমাষ্টার, কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সাংবাদিক, রাষ্ট্রনায়ক, কংগ্রেসকর্ম্মী ইত্যাদি শ্রেণীর তুলনা করিব। আমাদের পল্লীগ্রামের চাষী অথবা রেলওয়ে কুলী কিংবা অন্যান্য নিরক্ষর শ্রেণীর জীবনকথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। তাহারা তাহাদেব জীবনের সু-কু সম্বন্ধে, তাহাদের পারিবারিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে, তাহাদের পাড়ার উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে কি কিছুই বুঝে না? আমাদের ইস্কুলমাষ্টার মহাশয়েরা, আমাদের উকিল বাবুরা, আমাদের স্বদেশী-প্রচারকেরা, আমাদের সরকারী চাকুর্‌য়েরা নিজ নিজ জীবনের সু-কু সম্বন্ধে, পারিবারিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অথবা পাড়া-প্রতিবেশী সম্বন্ধে এই সকল মামুলি নিরক্ষর চাষী কুলী মিস্ত্রীর চেয়ে বেশী কি বুঝেন? আমাদের ভিতর অনেকেই চাষীদের সংস্পর্শে আসিয়াছে। আসল কথা বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকেই আমরা অল্প বিস্তর কিছু না কিছু চাষী পরিবারের খবর রাখি। তাহাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা কি ভাবে, তাহাদের পাড়া প্রতিবেশী সম্বন্ধে তাহাদের কি ধারণা এই সব আমাদের অজানা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, উকিল ডাক্তার কেরাণী ইস্কুলমাষ্টার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক এই সকল বিষয়ে নিরক্ষর নরনারীর চেয়ে স্বতন্ত্র কোন্ হিসাবে? লিখিয়ে-পড়িয়ে

লোকেরা ইস্কুলে কয়েকখানা ভূগোলের কেতাব অথবা ইতিহাসের কেতাব মুখস্থ করিয়াছে সন্দেহ নাই। লিখিয়ে-পড়িয়েরা খবরের কাগজের মারফৎ দুই একজন নামজাদা লোকের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুই একটী খবর হয়ত রাখিতে পারে ইহাও সত্য। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক, পারিবারিক কার্য্যের জন্য, সংসারপালনের জন্য, নিজ পল্লীর হিতাহিত আলোচনার জন্য তাহারা কোন্ বিষয়ে বিশিষ্টজ্ঞানসম্পন্ন,—ইহাই আসল কথা। লেখাপড়া জানার ফলে এমন কোন্ অভিজ্ঞতা জন্মে যাহাতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানশীল চাষী মিস্ত্রীর চেয়ে পল্লীসংক্রান্ত, সহরসংক্রান্ত কাজকর্ম্মে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা বিশেষরূপে যোগ্যতর বিবেচিত হইবার উপ .ক্ত ? অবশ্য একথাটা বলা আবশ্যক যে কেরাণী কলম পিষিতে অভ্যস্ত। অতএব কলম পেষার কাজে সে একজন বিশেষজ্ঞ। চাষী এবং মিস্ত্রী কলম পিষিতে পারে না, অতএব এই হিসাবে নিকৃষ্ট। সেইরূপ ডাক্তার বাবু ওষুধের পাঁতি দিতে অভ্যস্ত, এঞ্জিনিয়র মশায় রাস্তা মেরামত করিতে, ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে অথবা পুল নির্ম্মাণ করিতে অভ স্ত। এই সকল কাজ চাষী বা মিস্ত্রী করিতে পারে না। কিন্তু ডাক্তার বাবু এঞ্জিনিয়রের কাজ করিতে পারে কি ? এঞ্জিনিয়র মহাশয় রাসায়নিকের কাজ করিতে পারে কি ? রাসায়নিক মহাশয় যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে পারে কি ? ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয় বই গিলাইতে সমর্থ সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার হাতে ওষুধের পাঁতি দেওয়া সম্ভবপর কি ? আর যন্ত্রপাতি দেখিবামাত্র সে ত ভীমরতি খাইতেই অভ্যস্ত ! মোটের উপর বলিতে হইবে যে, লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা বড়জোর কোনো একটা লাইনে কতকগুলি কাজ করিয়া যাইতে পারে। ব্যস্, এই পর্য স্ত তাহাদের দৌড়।

এখন জিজ্ঞাস্য, চাষীরা মিস্ত্রীরা তাঁতীরা কুমোরেরা যে সকল কাজ করে সেই সকল কাজ কি ছোট দরের কাজ ? চাষীর কাজ করিতে

পারে না। ইস্কুলমাষ্টার, ইস্কুলমাষ্টার চাষীর চেয়ে নিকৃষ্ট। চাষীর কাজে এঞ্জিনিয়ার আনাড়ি। অতএব চাষার চেয়ে সে নিকৃষ্ট। এইরূপে দেখিতে পাই যে, অচাষী মাত্রেই চাষীর চেয়ে চাষের কাজে নিকৃষ্ট,– ঠিক যেমন চাষীরা নিকৃষ্ট চাষ ছাড়া অন্যান্য কাজে অন্যান্য পেষা-সেবীদের চেয়ে।

কেরাণীর কলম পেষা যেমন একটা কাজ, ইস্কুলমাষ্টারের ছাত্রদিগকে বই গিলানো যেমন একটা কাজ, ওষুধের ব্যবস্থা করা ডাক্তারের যেমন একটা কাজ তেমনি চাষ করা, দুধ দোয়া, নৌকা চালানো, গাড়ী হাঁকানো, ছুরী কাঁচি তৈয়ার করা, সুতা কাটা, কাপড় বুনা ইত্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ। চাষ সম্বন্ধে যে লোকটা ওস্তাদ অর্থাৎ নিরক্ষর কৃষাণ তাহার ওস্তাদীও কাজ বা ওস্তাদি হিসাবে সমাজের পূজা পাইবার যোগ্য, ঠিক সেই রকম পূজা পাইবার যোগ্য যে রকম পূজা পায় তাহারা যাহারা রোগীর জন্য ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে ওস্তাদ। সমাজে ইস্কুলমাষ্টারের যে ইজ্জৎ সে বই মুখস্থ করাইবার পেশায় ওস্তাদ বলিয়া, এঞ্জিনিয়রের যে ইজ্জৎ সে ঘরবাড়ী পুল সাঁকো তৈয়ার করিবার কাজে ওস্তাদ বলিয়া, ঠিক সেই ধরণের ইজ্জৎই চাষী মিস্ত্রী ছুতোর মাঝি পাইবার উপযুক্ত এই সকল বিভিন্ন পেশায় তাহারা নানা ঢঙের ওস্তাদ বলিয়া।

পেশা মাত্রই সম্মানের যোগ্য। যাহারা কোন না কোন পেশা চালাইতেছে তাহারা লিখিতে পড়িতে পারে কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু লিখিতে পড়িতে না পারা সত্ত্বেও পেশা চালাইবার মত যোগ্যতা কর্ম্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা যে সকল লোকের আছে তাহারা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মতনই সমাজের মেরুদণ্ড। চাষ চালাইতে কম বুদ্ধির দরকার হয় না, কম বিচক্ষণতার দরকার হয় না, কম মাথা খেলাইবার দরকার হয় না, কম দল-গঠনের দরকার হয় না।

উকিলি করিতে চাষের চেয়ে বেশী বিচক্ষণতা, বেশী দল গঠনের ক্ষমতা, বেশী বুদ্ধিমত্তার দরকার হয় একথা স্বীকার করা চলে না। তাঁতী জোলা কামার কুমোর ইত্যাদি সকল শ্রেণীর পেশাজীবীই মাথা খাটাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তাহারাও উকিল ইস্কুলমাষ্টার ডাক্তার ইত্যাদির মতনই মস্তিষ্কজীবী। বাংলাদেশের নতুন সমাজ বিপ্লবের কথা যখন ভাবি তখন আমাদিগকে এদিকেও মাথা খেলাইতে হইবে। বুঝিতেছি যে, লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণী হইতে নিরক্ষরদিগকে যে তফাৎ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

চরিত্র হিসাবে নিরক্ষর খাটো নয়

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরক্ষরদিগের বুদ্ধিমত্তা, মস্তিষ্কশক্তি, বিচক্ষণতা ইত্যাদির কথাই বলিলাম। এইবার নিরক্ষরদিগের নৈতিক চরিত্র ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা বলিব। নিরক্ষর নরনারীকে চাষাভূষারূপে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা আমাদের দস্তুর। কিন্তু নিরক্ষর লোকেরা চরিত্র হিসাবে বাস্তবিক খাটো কি? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ ইস্কুলমাষ্টার কেরাণী সরকারী চাকুরো উকিল ডাক্তার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কংগ্রেসের জননায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর নরনারী চরিত্র হিসাবে চাষী মজুর মিস্ত্রী ঘরামী ইত্যাদির চেয়ে উন্নত ধরণের লোক কি? প্রশ্নটা খোলাখুলি আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সেকালে এই সকল প্রশ্ন পর্য্যন্ত করা হইত কিনা সন্দেহ। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরে নানা জাতির উঠা নামার ফলে, নানা জাতির সঙ্গে মিলামিশার ফলে আজ অন্ততঃ বাজারে দাঁড়াইয়া এই প্রশ্নটা করিবার মত সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র সুযোগ পাওয়া যাইতেছে নয়। যাহারাই নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে

মিলামিশা করিয়াছে তাহারাই বুঝিয়াছে যে. ইহাদের নৈতিক চরিত্র তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর নরনারীর নৈতিক চরিত্রের,—লিখিয়ে পড়িয়ের চরিত্রের,—চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়।

লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা, পয়সাওয়ালা লোকেরা, নামজাদা লোকেরা, কংগ্রেস-কাউন্সিলের সভ্যশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের স্ত্রীপুত্র বাবা দাদার সঙ্গে যে ধরণের ব্যবহার চালাইয়া থাকে এই সকল নিরক্ষর চাষী মিস্ত্রী কুলী মজুর শ্রেণীর লোকেরাও ঠিক সেই ধরণেই তাহাদের ব্যবহার চালাইয়া থাকে। মামা হিসাবে চাচা হিসাবে কাকী হিসাবে দিদিমা হিসাবে ননদ হিসাবে ভাজ হিসাবে ভাইপো হিসাবে চাষীমজুরেরা আর ফ্যাক্টরীর মজুরেরা ঠিক সেই ধরণেই সুনীতি-কুনীতির পরিচয় দেয় যে ধরণের পরিচয় দেয় ইস্কুলমাষ্টার, উকিল, ডাক্তার, জননায়ক, সরকারী চাকুরো ইত্যাদি শ্রেণীর নরনারী। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে লেন দেনে নিরক্ষরেরা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজন হইতে স্বতন্ত্র জীবরূপে দেখা দেয় না। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিরক্ষরেরা কি রকম সম্বন্ধ চালায়? আমাদের লিখিয়ে-পড়িয়ে পয়সাওয়ালা উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার চালাইয়া থাকে? তাহার ভিতর এমন কিছু উচ্চ অঙ্গের উৎকর্ষ, উচ্চ শ্রেণীর হামদর্দ্দি, উন্নত ধরণের সৌজন্য দেখিতে পাওয়া যায় কি? পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কোন্দল, ঝগড়া, কুচলী, রেষারেষি আমাদের উকিল বাবুদের ভিতর, ইস্কুলমাষ্টারদের ভিতর, কংগ্রেসকর্ম্মীদের ভিতর যত বেশী তাহার চেয়ে বেশী কোন্দল, রেষারেষি, ঝগড়াঝাটী, আমাদের চাষী সমাজে, মিস্ত্রী-মজুর সমাজে দেখিতে পাই কি? আমাদের ইস্কুলমাষ্টার শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের নিজ পেশার অন্তর্গত লোকজনের ভিতর পরস্পরে যেরূপ হিংসাদ্বেষ, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, নীচাশয়তা প্রকটিত করিতে অভ্যস্ত

তাহার চেয়ে বেশী পরশ্রীকাতরতা, নীচাশয়তা, দ্বেষহিংসা চাষীদের ভিতর, মজুরদের ভিতর, কুলীদের ভিতর দেখা যায় কি ?

"ক্রিমিনলজির ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌"

নৈতিক জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটীও উল্লেখ করা যাইতে পারে। টাকা পয়সার লেনদেন, ব্যবসা সংক্রান্ত আদানপ্রদান, চুক্তি রক্ষার কাজ কর্ম্ম আমাদের কণ্ট্রাক্টর, এঞ্জিনিয়র, আমদানিরপ্তানীকারক, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ইত্যাদি উচ্চশ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত লোকজনের দস্তুর কি সর্ব্বদাই অতি সুনীতি-সঙ্গত ? আর যদি তাহাই হয় তাহা হইলে টাকা পয়সা-ঘটিত সুনীতি, চুক্তি রক্ষা ঘটিত সুনীতি ইত্যাদি সকলপ্রকার ব্যবসা সংক্রান্ত সুনীতি কি চাষী মজুর মহলে ইহার চেয়ে কম দেখা যায় ? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের নৈতিক চরিত্রে এমন কোন্ কোন্ সদ্‌গুণ আছে যেগুলি দেখিয়া আমাদের নিরক্ষর চাষী মজুর শ্রেণীর লোকেরা উন্নত ধরণে জীবন গঠন করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে ? অপর দিকে আমাদের চাষী মজুর ইত্যাদি নিরক্ষর নরনারীর ভিতর এমন কোন্ দুর্গুণ বা কুনীতি আছে যেগুলি আমাদের উচ্চশিক্ষিত, পয়সাওয়ালা, নামজাদা, সমাজের শীর্ষস্থানীয় নরনারীর ভিতর যখন তখন যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না ? জুচ্চুরি, বাট্‌পারি বদমায়েসিতে নিরক্ষরদের চেয়ে শিক্ষিতেরা খাটো কি ? বস্তুতঃ যদি আমরা আদালতের আসামী অথবা সাজাপ্রাপ্ত নরনারীর তালিকা দেখি, তাহা ছাড়া যে সকল নরনারী সমাজে অকথ্য অন্যায় করিয়াও ঘটনাচক্রে সাজা এড়াইতে সমর্থ তাহাদের কোনো কোনো ঘটনা যদি জানা থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, কি বাংলাদেশে, কি বাংলাদেশের বাহিরে, কি ভারতে কি ভারতের বাহিরে বিশাল দুনিয়ার কোথাও, নিরক্ষর নরনারী অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প

শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারী শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত নরনারীর চেয়ে অধিক মাত্রায় দোষী পাপী সাজাগ্রস্ত অথবা সাজার যোগ্য নরনারী নয়। "ক্রিমিনলজি" অর্থাৎ অপরাধ-বিজ্ঞান বিষয়ক আইনশাস্ত্রের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ হইতে তথ্য খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাদিগকে আমাদের দেশে চাষাভূষা বলা হইয়া থাকে, এক কথায় যাহারা পৃথিবীর সকল সমাজে নিম্নস্তরের নরনারী তাহারা উচ্চতর শ্রেণীর নরনারীর চেয়ে বেশী মাত্রায় দোষী পাপী নীতিহীন বা দুশ্চরিত্র এরূপ বিশ্বাস করা চলে না।

বরং যাহারাই মজুর চাষা ও অন্যান্য নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীয়তা করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহারাই বলিবে যে এই সকল নরনারীর চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের ব্যক্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গৌরবজনক। নিরক্ষর নরনারীও চরিত্রবান ব্যক্তি হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের জীবনের সদ্‌গুণগুলিকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিলে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা এবং সমাজের নামজাদা ও শীর্ষস্থানীয় নরনারীরা নিজ নিজ জীবন উন্নত করিতে সমর্থ হইবে। নৈতিক চরিত্রের তরফ হইতে নিরক্ষরকে আমি কোনো মতেই লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজন হইতে তফাৎ করিতে পারি না। অতএব কি মস্তিষ্কের চালনায় ও বিচক্ষণতায়, কি নৈতিক চরিত্রে ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য জ্ঞানে কোনো দিকেই নিরক্ষরকে সমাজের ফেলিতব্য কিংবা উপেক্ষিতব্য নরনারী বিবেচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নিরক্ষরের অধিকার

উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ও বিংশ শতাব্দীর আজ পর্য্যন্ত যে একটা মত জগতের বাজারে বাজারে প্রচলিত আছে সেই মতের বিরুদ্ধে আমাকে

জোরের সহিত কথা বলিতে হইতেছে। ইয়োরামেরিকায় ও এশিয়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোকের মাথায় একটা ধারণা প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, লেখাপড়া না শিখিলে মানুষ সমাজের কার্য্যক্ষম অঙ্গ হইতে পারে না। অতএব লেখাপড়া না শিখিলে কোনো মানুষকে রাষ্ট্রিক জীব বিবেচনা করা উচিত নয়। আমি দেখিতেছি যে, মানুষের মতন কাজ করিতে হইলে যে ধরণের মাথা থাকা দরকার, যে ধরণের কর্ত্তব্যবোধ থাকা দরকার, যে ধরণের চরিত্রবত্তা থাকা দরকার তাহা নিরক্ষর লোকেরও প্রচুর পরিমাণেই আছে। সুতরাং সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই নিরক্ষরের অধিকার প্রচার করা আমার নিকট সমাজ-শাস্ত্রের প্রথম স্বীকার্য্য। আমাদের চোখের সম্মুখে বিগত সিকি শতাব্দীর ভিতর যে এক নয়া বাংলা গড়িয়া উঠিয়াছে সেই নয়া বাংলার অন্যতম আধ্যাত্মিক ভিত্তিই আমি এই স্বীকার্য্যের ভিতর আবিষ্কার করিতেছি।

লোকগুলি সাঁওতাল হউক, রাজবংশী হউক, গারো হউক, পাহাড়ী হউক, অস্পৃশ্য হউক, চণ্ডাল হউক, ডোম হউক, হাড়ি হউক, চাষী হউক, মিস্ত্রী হউক, মজুর হউক তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই—একমাত্র এই কারণে লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর শ্রেণী হইতে কোনো অংশে খাটো নয়। বাঙ্গালী জাতির হাড়মাসে, বাঙ্গালী জাতির ধনদৌলতে, বাঙ্গালী জাতির বাড়্‌তিতে, বাঙ্গালী জাতির শক্তিবিকাশে তাহারা সকলেই লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর মতনই কর্ম্মক্ষম এবং গৌরবজনক কৃতিত্বের প্রতিনিধি। এই সকল নিরক্ষরদের বুদ্ধিমত্তা আর কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ হইয়াই আমাদিগকে বাঙ্গালী জাতির আগামী অধ্যায়ের জন্য নতুন ধাপ গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বদেশসেবার শক্তিযোগে যুবক বাংলার যে সকল নরনারী বাহাল আছেন তাঁহারা নিরক্ষরের সকল প্রকার অধিকার সম্বন্ধে টন্‌টনে জ্ঞান হাতের মুঠার ভিতর রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার সমাজশাস্ত্র

সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের বাঙালী

"আর্থিক উন্নতি" সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল (বৈশাখ ১৩৩৯)। বিগত ছয় বৎসরে বাঙালী জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তায় ও কর্ম্মে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। চোখের সম্মুখে একটা নবযুগের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারা বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি।

বাঙালী জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে যতই বেশী অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই "আর্থিক উন্নতি"র বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রচারিত তথ্য ও তত্ত্বগুলার আদর বাঙালী সমাজে বাড়িতে থাকিবে। অধিকন্তু "আর্থিক উন্নতি"র মতন বিভিন্ন নতুন নতুন মাসিক আর অন্যান্য পত্রিকার আবির্ভাবও দেখিতে পাইব।

অনেক পাঠকের নিকট হইতে নানা প্রকার প্রশ্ন পাইয়াছি। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, কাঠখোট্টা অঙ্কতালিকামূলক পত্রিকার সাহায্যে চিন্তাশীল ও কর্ম্মনিষ্ঠ বাঙালীরা নিজের জীবন, ব্যবসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা পুষ্ট করিতে ঝুঁকিয়াছেন।

ইংরেজি, মার্কিণ, ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মাণ ইত্যাদি ধনবিজ্ঞান ও অঙ্করাশি (ষ্টাটিষ্টিক্‌স্) বিষয়ক বহুসংখ্যক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিংড়াইয়া রস বাহির করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম ব্যবসা। বলা বাহুল্য, রসের সঙ্গে সঙ্গে কষও বেশ কিছু—বোধ হয় জবর রূপেই দেখা দেয়। কিন্তু বাংলা দেশে বহুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর ধনবিজ্ঞানদক্ষ,

শিল্পদক্ষ, বাণিজ দক্ষ মানুষ দেখিতে হইলে এই ধরণের কষ-হজম করা নীলকণ্ঠের আড্ডা কায়েম করিতেই হইবে। সেই দিকেও বাঙ্গালী আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছে।

বাংলা ভাষায় যে উচ্চতম ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের গবেষণা চলিতে পারে তাহা সন্দেহ করিবার মতন লোক ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। আর কয়েক বৎসর পরে এইরূপ সন্দেহওয়ালা লোকের টিকি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে না। "আর্থিক উন্নতি"র পনর বৎসর বয়সে বোধ হয় বাংলা ভাষাই আত্মপ্রতিষ্ঠাশীল, আত্মসম্মানী, আত্মশক্তিনিষ্ঠ বাঙালীমাত্রের সকল প্রকার পঠনপাঠন-আলোচনা-গবেষণার বাহন দাঁড়াইয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে আবার আড়াই বৎসর (১৯২৯ মে-১৯৩১ অক্টোবর) বিদেশে কাটাইয়া আসিলাম। এই দ্বিতীয়বারকার প্রবাসের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার অনেক কিছুই "আর্থিক উন্নতি"তে আর দেশের অন্যান্য কাগজেও বাহির হইয়াছে। দেশ ও দুনিয়া জুড়িয়া চলিতেছে আজকাল আর্থিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগ-তত্ত্ব "আর্থিক উন্নতি"র নানা সংখ্যায় অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্যোগ সম্বন্ধেও আমার মতামত প্রকাশ করা গিয়াছে।

তবে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এই সাময়িক দুর্যোগটাই একমাত্র অথবা প্রধান কথা নয়। নতুন শাসন প্রণালী কায়েম হইতে চলিল। তাহার আলোচনা এখন আবার কিছু দিন বহু ঠাঁই অধিকার করিবে। তাহার উপর আছে মজুরের কথা, চাষীর কথা, সাঁওতালের কথা, নমঃশূদ্রের কথা। দেশ আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে যতই আগাইয়া যাইতেছে ততই নতুন নতুন কথা বেশ মোটা আকারে দেখা দিতেছে। বিগত সাত আট মাসের ভিতর এই ধরণের পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটা বিভিন্ন

সমস্যা লইয়া নানা উপলক্ষে আলোচনায় যোগ দিতে হইয়াছে। সেই সব যথাস্থানে ছাপা হইয়াছে। বর্ত্তমান হালখাতায় এই ধরণেরই কতকগুলা তর্কপ্রশ্নের আলোচনা হাজির করিতেছি।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ এই দুই পরিষদের গবেষকদের* সঙ্গে বসিয়া নানা সময়ে যে সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাইতে হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু এইখানে মজুত করা গেল। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের বাঙালীকে কোন্ কোন্ দিকে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে হইবে তাহারই কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যাইতেছে। আমাদের আটপৌরে জীবনে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বিষয়ক যে সকল কথা চৌপর দিন রাত হাটে বাজারে উঠে সেই সকল বিষয়েরই দুএক কথায় জবাব দিবার চেষ্টা এইখানে পাওয়া যাইবে। এইসকল দিকে মাথা পরিষ্কার রাখা সকলেরই দরকার। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনের কাজেও এই সব বিশেষ জরুরি।

ইয়োরামেরিকা বিষয়ক ভারতীয় গবেষণা ও গবেষক

কলিকাতায় আজকাল লোকেরা একপ্রকার আর খোঁজই করে না বামুনে রাঁধিয়াছে কি না। নানাজাতের এক পংক্তিতে বসিয়া খাওয়ারও সর্ব্বত্র রেওয়াজ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী জাতিভেদ প্রথা কিরূপ ধ্বংস করিতেছে। শিল্প-বিপ্লবটা পুরা দস্তুর দাঁড়াইয়া গেলে জাতিভেদ-প্রথার কি দশা হইবে তাহা ইহা হইতেই অনেকটা অনুমান করা যায়। তবে এই সবের চরম ফল দেখিতে এখনো অনেক দেরী।

---

* শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, হরিদাস পালিত, সুধাকান্ত দে, নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ রায়, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথনের সারমর্ম্ম।

জাতিভেদ কেবল ভারতেই আছে, তাহা নয়। এই ধরণের ভেদজ্ঞান ইয়োরোপেও এককালে ছিল। কামার কামারের মেয়ে ছাড়া বিবাহ করিবে না, কুমোর কুমোরের মেয়ে ছাড়া বিবাহ করিবে না, এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে বিবাহ করিবে না- এই ধরণের রীতি-নীতি ইয়োরোপেও ছিল। আমাদের দেশে যেমন এককালে ধারণা ছিল, সহুরে মেয়ে বা ইস্কুলে-পড়া মেয়ে ভাল নয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা বেশী খাঁটি, পশ্চিমা সমাজেও ঐ ধরণের ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতেও অনেকের ধারণা,—লণ্ডনের মেয়ের চেয়ে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ভাল।

একটা সমাজকে বুঝিতে হইলে, সেই সমাজের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ সাত বৎসর বাস করা দরকার। তাহা না হইলে সেই সমাজটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হওয়া অসম্ভব। ইংরেজেরা ভারতে অনেক বছর থাকিবার পর যে সকল বই লেখে, তাহার মধ্যে কত আহাম্মুকি থাকে, আর তার জন্য তাহারা গালাগালি খায় কত! তবে, ইহাও সত্য যে তাহাদের লেখার মধ্যে অনেক খাঁটি সত্য কথাও পাই।

একটা বিষয়ে ইয়োরামেরিকানদের কাছে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে। তাহাদের মধ্যে জনকয়েক ফাঁকিদার হইলেও অনেকে আমাদের দেশটাকে বুঝিবার বা জানিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিয়াছে। একটা বিজিত দেশকে এতটা বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা বাহাদুরির কথা নয় কি? অথচ, আমাদের দেশের কয়জন লোক পাশ্চাত্য দুনিয়াকে বুঝিবার জন্য ঠিক ঐ ধরণের চেষ্টা করিয়াছে?

সত্য কথা বলিতে কি, এখন ইয়োরামেরিকাকে আমাদের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার বিষয়-বস্তু করা একান্ত দরকার। অথচ, এদেশের এমন লোকের নামও ত' বেশী মনে পড়ে না যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে জানিবার ও বুঝিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিয়াছেন।

"বর্ত্তমান জগৎ" বইগুলা লেখা হইয়াছিল ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই,—দুনিয়াকে যে আমাদের জানিতে ও বুঝিতে হইবে তাহা সমঝাইবার জন্য। যদি ইয়োরামেরিকার এক একটা দেশ লইয়া, অথবা পশ্চিমাদের সঙ্গীত,বিজ্ঞান বাণিজ্য প্রভৃতি এক একটী বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিবার জন্য এক একজন গবেষক অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বড় সুখের হইত।

একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। হাজার চারেকের কিছু বেশী পৃষ্ঠা লইয়া "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অন্তর্গত কোনো বই বা লেখাই কোনো বিষয়ের একটা বিশেষ ও সম্পূর্ণ আলোচনা নয়। কোনো দুই-একটী বিষয় লইয়া বিশেষজ্ঞ হইবার ক্ষমতা পুষ্ট করা এই সকল বই-লেখার মতলব নয়। ইচ্ছা করিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সকল প্রকার কথা আলোচনা করাও যাইতে পারিত। কিন্তু একটি কোনো বিষয় লইয়া বইগুলার ভিতর আলোচনা করিতে গেলে, অন্যদিককার একটা বড় উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থাকিত। যে কোনও বিদ্যার বা বিষয়ের অন্তস্তলে চট্ করিয়া ঢোকা এবং বিদ্যার নানা বিভাগের পরস্পরের যোগাযোগ বোঝা ও দেখানো,—"বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর মতলব। কাজেই যদি কোনো দাগ-দেওয়া কয়েকটা বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগা যাইত, তাহা হইলে বইগুলার মারফৎ দেশকে বা দুনিয়াকে যাহা দিতে পারা গিয়াছে, তাহা দেওয়া হইত না। এইজন্যই নানা বিষয়ে কোন্ কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে তাহার মূল সূত্রগুলা দেওয়া গিয়াছে, আর সেই সব কাজের জন্য কোথায় কিরূপ রসদ পাওয়া যাইবে, তাহাও দেখানো হইয়াছে। পরবর্ত্তী কর্ম্মীরা সেই সব সূত্রের এক একটী ধরিয়া এক এক লাইনে কাজ করিয়া যাইবে, এইরূপ ইচ্ছা ছিল। হয়তো ভবিষ্যতে আমি নিজেই এইসবের কোনো দুই-একটী লইয়া জীবন কাটাইয়া দিব।

গবেষণার কাজে একই সঙ্গে পঞ্চাশ-পঁচাত্তর জনকে খাটানো অসম্ভব নয়। কিন্তু, সে রকম কর্ম্মী পাওয়া সম্ভব কি? কর্ম্মী যে নাই, তা নয়। আসল কথা – অভাব রুধিরের — কর্ম্মীদের খাটাইবার জন্য টাকার। "রূপচাঁদ" না হইলে লেখাপড়ার কাজ চলে না। কাজেই, টাকার অভাবে, অন্যান্য ভাল কাজের মতন, বাঙলার মগজকে এই ধরণের কাজে লাগাইবার কাজটাও মাঠে মারা যাইতে বাধ্য।

কর্ম্মী আছে ঢের। কিন্তু তাহাদের খোরপোষের জন্য ত' টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই, কাহাকেও "এটা কর্, ওটা কর্" বলিবার এক্তিয়ার আসিবে কোথা হইতে? জোর করিয়া কোনো কাজ আদায় করা চলে না। প্রত্যেকের নিজ নিজ সৎপ্রবৃত্তির ও বিদ্যানুরাগের উপর নির্ভর করিলে ফল কতটুকুই বা পাওয়া যাইতে পারে? যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য থাকা উচিত।

জন্মমৃত্যুর হারে ভারত ও দুনিয়া *

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে হাজার প্রতি জন্ম-হার সমান নয়। কোনো দেশে হাজার প্রতি ২০ জন জন্মায়, কোনো দেশে হাজার প্রতি ৩০, কোনো দেশে হাজার প্রতি ৪০। এইরূপ হারের পার্থক্য লইয়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশগুলাকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যে সব দেশে জন্মের হার হাজার প্রতি ২০ পর্য্যন্ত সেগুলা এক শ্রেণীতে,

* ১৯০২ সনের ২৫-২০ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার টাউন হলে "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কন্ফারেন্সে"র অষ্টম অধিবেশন হয়। ২৬শে মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময়ে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশের জন্ম-মৃত্যুর হার ও লোক-বৃদ্ধি সম্বন্ধে এক তুলনামূলক বক্তৃতা

যেগুলাতে জন্ম-হার হাজার প্রতি ২০ হইতে ৩০ সেগুলা এক শ্রেণীতে, যেগুলার জন্ম-হার ৩০ হইতে ৪০ এর মধ্যে সেগুলা এক শ্রেণীতে, ইত্যাদি রূপে সাজানো সম্ভব। দুনিয়ার প্রায় ৩০টী দেশকে এই হারের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলাকেও, ঐ জন্মহারের তারতম্য অনুসারে অন্যান্য দেশগুলার মত বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা চলে। কতকগুলা দেশে জন্মের হার হাজার প্রতি ২৫ হইতে ৩০ এর ভিতর। ইহাদের মধ্যে একদিকে ইয়োরোপের হাঙ্গারী, অন্যদিকে আমাদের আসাম পড়ে। এইরূপ শ্রেণীভাগগুলি পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জন্ম-হারের পার্থক্য জাতি, সমাজ, ভৌগোলিক অবস্থা বা ধর্ম্ম-গত বিশ্বাস ইত্যাদিতে পার্থক্যের উপর কোনক্রমেই নির্ভর করে না। অর্থাৎ দুনিয়ার অতি-দূরবর্ত্তী, জাতি ও ধর্ম্মে অতিশয় বিভিন্ন দুই দেশের মধ্যেও একই প্রকার জন্ম-হার দেখা যাইতে পারে। আবার একই প্রকার জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও দুই দেশের জন্ম-হারে বিষম পার্থক্য ঘটিতে পারে। অঙ্ক-তালিকার সাহায্যে ইহাও প্রতিপন্ন করা যায় যে, জন্মের উচ্চহার কেবল পরাধীন জাতিগুলার মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। বিহার-উড়িষ্যার যে জন্ম-হার, পোল্যাণ্ড, জাপান ও রুমেনিয়ায়ও সেই জন্ম-হার। আসামের যে জন্ম-হার, হাঙ্গারী আর ইতালিরও ঠিক সেই জন্ম-হার। সুতরাং স্বাধীন দেশগুলাতেও জন্মের হার উচ্চ থাকিতে পারে।

প্রদত্ত হয়। ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রোমে অনুষ্ঠিত "ইণ্টার ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব পপিউলেশ্যনে"র অন্যতম সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান বক্তৃতার ভিত্তি। ইতালিয়ান বক্তৃতা প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাহাতে ৯টা ছবি আছে। বক্তৃতাটীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা হইল।

জন্ম-হার ও মৃত্যুহার সাধারণতঃ হয় বাড়িতেছে নয়ত কমিতেছে—প্রায়ই কখনও স্থিরভাবে চলিতেছে না। এ সম্বন্ধে নিম্নরূপ কয়েকটী সাম্য-সম্বন্ধ (ইকুয়েশ্যন) নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে :—

(১) 'ক' দেশের ১৯৩০ সনের জন্ম-হার যদি 'খ' দেশের ১৯৩০ সনের জন্ম-হারের ৩ গুণ হয়, তাহা হইলে 'ক' (১৯৩০) = ৩ 'খ' (১৯৩০) ;

(২) 'ক' দেশের ১৯৩০ সনে যে জন্ম-হার, ১৯০৫ সনে হয়তো তাহার ঠিক সেই জন্ম-হার ছিল না। ১৯০৫ হইতে ১৯৩০ সনের মধ্যে ঐ হারের তুলনায় বৃদ্ধি বা কম্‌তি দেখা দিতে পারে। দুই গুণ হইলে ইকুয়েশ্যন হইবে 'ক' (১৯৩০) = ২ 'ক' (১৯০৫) ;

(৩) ১৯৩০ সনে 'ক' দেশের যে জন্ম-হার, ১৯০৫ সনে 'খ' দেশের যদি সেই জন্ম হার হয়, তাহা এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—'ক' (১৯৩০) = 'খ' (১৯০৫) ইত্যাদি।

বর্ত্তমান দুনিয়ার সকল দেশেই জন্ম-হারের হ্রাস দেখা যাইতেছে, কোনো দেশে তাহা আগে দেখা দিয়াছে, কোনো দেশে বা পরে। ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণি ও বিলাতে জন্মের হার বাড়িতেছিল। ১৮৮০ সন হইতে তাহা কমিতে থাকে। ইতালিতে ১৮৯০ সন পর্য্যন্ত জন্মের হার বাড়িতেছিল। কাজেই যে সব দেশ আজ দুনিয়ার সেরা, সে সব দেশেও এককালে উচ্চ জন্ম-হার ছিল এবং মাত্র ৩০।৪০।৫০ বছর হইল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে, কয়েকটী সেরা দেশের মধ্যে যে জন্ম-হার দেখা যায়, ভারতের কোনো কোনো প্রদেশের মধ্যেও তাহা দেখা যায়। বাংলার জন্ম-হার হাজার করা ২৮·৯ এবং ইতালির হাজার করা ২৯·২। সুতরাং, জন্ম-হারের মাপে ইতালিকে সভ্য ও বাংলাকে অসভ্য বিবেচনা করা চলে না।

জন্মের হারের মত মৃত্যুর হারও নানা দেশে কমিতে আরম্ভ

করিয়াছে, ভারতেও তাহা কমিতেছে। ভারতের নানা প্রদেশের মধ্যে যুক্ত প্রদেশে মৃত্যুর হার সবচেয়ে কমিয়াছে। শিশু-মৃত্যুর হারও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৯২৬-২৭ সনে বিহারে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ১৪৭·৭। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিশু-মৃত্যুর হারের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কম। ১৯০৫ সনে ফ্রান্সে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ১৪৮ ৫। দেখা যাইতেছে, বিহার ফ্রান্সের চেয়ে মাত্র ২১ বছর পিছনে। ১৯২৬ সনে বাংলায় শিশু-মৃত্যুর হার হাজার-করা ১৯৬·৭৯। ১৯০৫ সনে জার্ম্মাণির শিশু-মৃত্যুর হার ছিল ১৯৭। সুতরাং বলিতে পারি যে, বাংলাদেশ জার্ম্মাণির চেয়ে মাত্র ২১ বছর পিছনে। জন্মের হার হইতেও ঠিক এই ধরণের কথা বলা চলে। ১৯২৫ সনে বাংলার জন্ম-হার ১৯০৫-১৪ সনের জার্ম্মাণির এবং ১৯০০-১৯১০ সনের বিলাতের হারের সমান ছিল। এই সব অঙ্ক হইতে বোঝা চলে যে, ইয়োরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলা হইতে ১০, ১৫ বা ২০ বছর মাত্র আগাইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক দেশেরই মৃত্যুর হারের চেয়ে জন্মের হার যতটা বেশী তাহার উপর লোক-বৃদ্ধির হার নির্ভর করে। ১৮৮১ সনে ভারতে হাজার-করা লোক বৃদ্ধি ছিল ১·৫, ১৮৯১ সনে ছিল ৯·৬, ১৯০১ সনে ছিল ১·৪, ১৯১১ সনে ছিল ৬·৪, ১৯২১ সনে ছিল ১২, ১৯৩১ সনে উহা দাঁড়াইয়াছে ১০·২। অন্যান্য দেশে লোকবৃদ্ধির গতি একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে, হয় তাহা কমিতেছে নয়ত বাড়িতেছে। ভারত সম্বন্ধে কিন্তু তাহা বলা চলে না। ভারতের লোক-বৃদ্ধি কোনো বিশেষ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না। কোনো দশকে হয়তো তাহা কমে, আবার পরবর্ত্তী

দশকে হয়তো তাহা বাড়ে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, ভারতের লোক-বৃদ্ধির হার দুনিয়ার অন্ততঃ ২৫টী দেশের লোক-বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। জন্ম-মৃত্যুর হার দেখিয়া যেমন বোঝা যায়, তেমনি লোক-বৃদ্ধির হার দেখিয়াও বোঝা চলে যে, লোক-বৃদ্ধি ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না।

বর্ত্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে লোক-বৃদ্ধির হার দেখা যায়, তাহাতে, যদি দুনিয়ার "লোকাধিক্য" ঘটে, তাহার জন্য ভারতকে কতটা দায়ী করা যাইবে? ভারতের লোক-বৃদ্ধির হার অন্যান্য অনেক দেশের লোক-বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। রুশিয়া, জাপান এবং অন্যান্য অনেক দেশের লোক-বৃদ্ধির হার ভারতের লোক-বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী। বৃটিশ ভারতের লোক-সংখ্যা ২৪ কোটি। এই ২৪ কোটি লোকের মধ্যে যে হারে লোক-বৃদ্ধি ঘটে, প্রায় ৫০ কোটি লোক-ওয়ালা দুনিয়ার অন্ততঃ ২০টী দেশে তাহার চেয়ে বেশী হারে লোক-বৃদ্ধি ঘটিতেছে। দুনিয়ার কোনো কোনো দেশে যত উচ্চ হারে লোক-বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে, ভারতে তাহা কখনও দেখা যায় নাই। আবার, যখন ভারতের লোক-বৃদ্ধির হার কমিয়াছে, তখন এক ফ্রান্স ছাড়া ভারতের হারই সব চেয়ে কম হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ কয় বছরের মধ্যে তাহাদের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সংখ্যাগুলা আলোচনা করিলেও, কোন্ কোন্ দেশ দুনিয়ার লোকাধিক্য সমস্যা সব চেয়ে সঙ্গীন করিয়া তুলিবে, তাহা বোঝা যাইবে। সংখ্যাগুলা এইরূপ:—

রুশিয়া	৩৩	বছর	ইতালি	৬২	বছর
জাপান	৪৫	,,	যুক্তরাষ্ট্র	৮২	,,
পোল্যাণ্ড	৪৮	,,	চেকোশ্লোভাকিয়া	৯৫	,,
কানাডা	৫১	,,	বৃটিশ ভারত	১০২	,,

উপরে যে সব কথা বলা হইল তাহা হইতে সহজেই বোঝা যাইবে যে, দুনিয়ার লোকাধিক্য অন্য কয়েকটি দেশ যতটা বাড়াইয়া তুলিবে, ভারতের প্রদেশগুলা ততটা তুলিবে না।

ভারতের লোকাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা, এবিষয়েও দুই এক কথা বলা দরকার। লোকাধিক্য বস্তুটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। একটা দেশে লোকাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা, তাহা বিচার করিবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে কিরূপ জীবনযাত্রা প্রণালী চলিত করা দরকার, তাহার আলোচনা করিতে হইবে। কোনো সংসারে যেমন খাওয়া-পরার মাপকাঠি কমাইয়া, একই আয়ে অধিকসংখ্যক লোক প্রতিপালন করা চলে, তেমনি যে কোনো দেশে খাওয়া-পরার মাপকাঠি কমাইয়া আরও অধিক সংখ্যক লোক পোষা সম্ভব। অপর দিকে, খাওয়া-পরার মাপ-কাঠি যদি বাড়ানো যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আয় যদি না বাড়ানো যায়, তাহা হইলে, লোকসংখ্যা না বাড়িলেও, লোকাধিক্য সমস্যা আরও গুরুতররূপে দেখা দিবে। ভারত যদি জাপানী মাপকাঠি অবলম্বন করিতে চায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা পোষা ত সম্ভব নয়ই, বরং তাহার লোকবলকে হয়তো ২০ কোটিতে কমানো দরকার। আবার, যদি জার্ম্মাণ মাপকাঠি আয়ত্ত করিতে চায়, তাহা হইলে লোক সংখ্যা কমাইয়া হয়তো ১০ কোটি করিতে হইবে। মার্কিণ মাপকাঠির জন্য হয়তো লোক-সংখ্যাকে ৬ কোটিতে কমানো দরকার হইবে ইত্যাদি। যাহা হউক, ভারতে মৃত্যু-হার কমিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার তেমন কমিতেছে না। ইহাতে লোকাধিক্য সমস্যা বাড়িয়া যাইবে। ইহা কমাইবার জন্য জন্মের হার কমানো দরকার। জন্মের হার কমাইবার জন্য জন্ম-শাসন, অবিবাহিত থাকা, বিলম্বে বিবাহ করা ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করা দরকার। লোক-বৃদ্ধির

কুফল হইতে আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতিও আবশ্যক।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গড়ে প্রতি বছর মাথা-পিছু কত খরচ করা হয়, সে সম্বন্ধে কয়েকটী অঙ্ক দেওয়া যাইতেছে ঃ—

জার্ম্মাণি	২ শিলিং
ইতালি	৫ শিলিং (?)
বিলাত	১½ শিলিং
জাপান	৫ শিলিং (?)
ফ্রান্স	১½ শিলিং
ভারত	৪½ আনা

ভারতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মাথা-পিছু খরচা কত কম! অথচ ভারত প্রথম শ্রেণীর দেশগুলা হইতে মাত্র ২০।৩০ বছর মাত্র পিছনে। ইহার কারণ কি?

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ভারতের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ আমাদের সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে নানা অস্বাস্থ্যকর জিনিষ আছে, ইত্যাদি। কিন্তু, ভারতে স্বাস্থ্যের জন্য এত কম খরচা হওয়া সত্ত্বেও যে আমরা প্রধান দেশগুলা হইতে মাত্র ১৫।২০।৩০ বছর পিছনে, ইহা হইতে মনে হয় যে, ভারতের সূর্য্য-কিরণেই হউক, অথবা সামাজিক রীতি-নীতিতেই হউক, স্বাস্থ্যের অনুকূল এমন সব উপাদান বা ব্যবস্থা আছে, যাহা অ-ভারতীয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক হউক্ বা না হউক্, ভারতসন্তানের পক্ষে অন্ততঃ বিশেষ মঙ্গলজনক। সূর্য্যের কিরণ, ভারতবাসীর সামাজিক রীতিনীতি এবং ভারতবাসীর

জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের অনুকূল কতটা এবং কি কি উপাদান আছে, তাহা ভারতীয় চিকিৎসকদের বিশেষ গবেষণার বিষয়।

সামাজিক ওলটপালট

সমাজজীবনে সকল সময়েই ওলটপালট হইতেছে। কেমন করিয়া আস্তে আস্তে অহিন্দু খুব নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হয়, কেমন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু উচ্চজাতের হিন্দু হয়, তাহা গবেষণা করার মত জিনিষ।

প্রত্যেক জাতের মধ্যেই নতুন নতুন লোক ঢুকিতেছে—এমন কি ব্রাহ্মণ বৈদ্যের মধ্যেও, যদিও ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের মধ্যে ঢোকা ভারি শক্ত। এক একটা জাতির মধ্যে নতুন রক্ত কেমন করিয়া ঢোকে সেইটা আলোচনা করা সবচেয়ে সহজ,—নীচ জাতিদের বেলায়।

উঁচু জাত নীচু জাতের ভেদ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে লোপ পায়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটা নেহাৎ কাল্পনিক দৃষ্টান্ত মাত্র। পল্লীগ্রামে কেহ একটা ষ্টেশনারী দোকান খুলিল। লোকে তাহার দোকান হইতে জিনিষ-পত্র কিনিতে আরম্ভ করিল। তার পাশে "ছোট জাতে"র একজন মুড়ি-মুড়কির দোকান করিল। কাছে আর কোনো মুড়ির দোকান নাই। লোকে তাহার দোকান হইতে মুড়ি কিনিতে আরম্ভ করিল। আগে হয়তো লোকে ছোট জাতের তৈরী মুড়ি কেনা ঘৃণার চক্ষে দেখিত। কিন্তু ক্রমে তাহার হাতের তৈরী মুড়ি সমাজে চলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে জাতি-ভেদের বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া যায় ও কোনো সমাজের বাহিরের লোক সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কায়স্থদের কথা ধরা যাক্। ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা ঠিক বলা যায় না। আর, এই জাতের মধ্যে কত যে রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে

তাহারও ঠিক-ঠিকানা নাই। আরামবাগের একজন নীচ জাতের লোক বৰ্দ্ধমানে যাইয়া একটা বাড়ী করিয়া জঁাকাইয়া বসিল। ক্রমে স্থানীয় লোকের সঙ্গে তাহার ভাব হইল ও তাহাদের সঙ্গে তাহার আসা-যাওয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে দু এক জন কায়স্থের বাড়ীতে সে হুঁকা পাইল। সে হয়তো স্থানীয় কায়স্থদের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিল—তাহারা তাহার বাড়ীতে আসিয়া খাইয়া গেল। পরে একদিন সে কোনো কায়স্থের বাড়ীতে নিজের মেয়ের বিবাহ দিল। ব্যস্, সে জাতে উঠিয়া গেল।

আমরা যাহাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলি তাহার মধ্যেও কতটা ওঠা-নামা চলে সেটাও ভাবিবার কথা। ১৮৫০ সনে যাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিল, তাহাদিগকে ক, খ, গ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাউক। ১৯৫০ সনে যাহারা মধ্যবিত্ত হইবে তাহাদিগকেও ক, খ, গ এই তিন ভাগে ভাগ করা গেল। ১৮৫০ সনের “ক” স্তরের লোককে যদি ১৯৫০ সনের ঐ স্তরের লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিব যে, অনেক নতুন বংশের লোক “ক” শ্রেণীতে ঢুকিয়াছে,—যাহারা আগে “ক” শ্রেণীতে মোটেই ছিল না; আবার যাহারা “ক” শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল তাহাদের বংশের লোকেরা হয়তো “ক” শ্রেণী ছাড়িয়া “খ” শ্রেণীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

দেশের মধ্যে সৰ্ব্বত্র “আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ” স্থাপন চলিতেছে। এই দিকটাতেও লক্ষ্য থাকা দরকার। যেমন যুদ্ধের হিড়িকে এক জায়গার লোক আর এক জায়গায় সরিতে বাধ্য হয়, তেমনই পেটের তাড়নায়ও এক জায়গার লোক অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেও—যেমন নদীতে ভাঙন-ধরার জন্য—লোকে বসবাসের স্থান পরিবর্ত্তন করে। সারা বাংলাটায় এই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন কোথায় কি রকম চলিতেছে, সেটা আলোচনা করিবার যোগ্য।

এ বিষয় যদি আলোচনা করিতে হয়, এক একজন লোককে ধরিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষের ধারাবাহিক ইতিহাস বাহির করিতে হইবে। ধরা যাউক "ক" একজন লোক। তাহার বাপ ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুর্দ্দার বাপ কোথায় থাকিত, কি করিত তাহার একটা ইতিহাস তৈরী করা উচিত। এই রকম জনকয়েকের বংশগত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে লোকজনের গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারা যাইবে। বলা বাহুল্য যত বেশী লোকের পূর্ব্বপুরুষের কাহিনী আলোচনা করা যায় ততই ভাল।

বাংলাদেশে উড়িষ্যার লোক আসিতেছে, বিহারের লোক আসিতেছে, অন্য প্রদেশের লোকও আসিতেছে ; তা ছাড়া, সাঁওতাল বাগ্দী নমঃশূদ্র রাজবংশী প্রভৃতি ত' আছেই। সেইসব জংলী লোকও ক্রমে বাংলার সমাজ-জীবনে ঢুকিতেছে এবং তাহাদের নিজেদের স্থান ক্রমে ক্রমে উন্নত করিতেছে—এ সবই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। ভাষার ভিতর দিয়া, পোষাক পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া, আচার-ব্যবহারের ভিতর দিয়া, জীবন-যাত্রা-প্রণালীর ভিতর দিয়া, কেমন করিয়া অ-বাঙালীরা ধীরে ধীরে বাঙালী হয়, তাহাও লক্ষ্য করা দরকার। বাঙালীত্ব কি লইয়া, পোষাক, আচার-ব্যবহার বা ভাষা বা অন্য কিছু লইয়া, এটাও একটা গবেষণার জিনিষ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

একটা জিনিষ সকলেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স হইতেছে বাঙালী জাতির বণিক্-সভা, অথচ তাহার সভ্যদের মধ্যে খুব কম লোকই খাঁটি বণিক বা ব্যবসাদার। তাঁহাদের মধ্যে জন-কয়েকের চা বা কয়লার ব্যবসা আছে, অথবা কাপড়ের কল আছে ; তা ছাড়া, বাকী সবই হইতেছেন উকীল, ব্যারিষ্টার,

অ্যাটর্ণি আর জমিদার। ইহা হইতেই বোঝা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর দৌড় কতটা! কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই এই দুর্গতির কারণ। এরূপ বুঝিয়া রাখা হয়ত নেহাৎ অন্যায়ও নয়। কেন না, এককালে বড় বড় বাঙালী ব্যবসাদারও ত' ছিল, কিন্তু তাঁহারা সবাই-ই জমিদার বনিয়া যাইতেছেন। কোনো কোনো বাঙ্গালী কোম্পানী এক সময়ে খুব বড় আমদানি-কারা ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাদের ব্যবসা খুবই সামান্য। তাঁহাদের সম্পত্তি যা কিছু তা কলিকাতার অনেকগুলা বাড়ীতে ও পল্লীগ্রামের জমিদারীতে। উকীল, ব্যারিষ্টার ডাক্তার প্রভৃতি যে সব বাঙালী মোটা পয়সা রোজগার করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের রোজগার ব্যবসা-বাণিজ্যে বা কারখানা-শিল্পে খাটান না। তাঁহারাও হয় কোম্পানীর কাগজ না হয় জমিদারী কেনেন। জমিদারী জিনিষটা এত লোভনীয় হইল কেন? বেশী আগা-পাছা বিবেচনা না করিয়া লোকে বলে,—বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়াই। কাজেই, সহজে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে "আধুনিক" শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে বাঙালীর অমনোযোগের অন্যতম কারণ হয়ত বলা চলে।

তবে, এই ধরণের যুক্তিতে গলদও আছে কম নয়। প্রথমতঃ ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ভারতের যে সকল জনপদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই সেই সকল জনপদের সর্ব্বত্র "আধুনিক শিল্প-বাণিজ্য" ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ বলা চলে না। বাংলা দেশের উৎপাদনশক্তি বাঙালীকে অনেকদিন ধরিয়া ভূমি-নিষ্ঠ, কৃষিনিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে। "আধুনিক" ধনদৌলতের নয়া নয়া আকার-প্রকারে হাত মক্স করিবার প্রবৃত্তি হয়ত এই কারণেই গজে নাই। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীরা আধুনিক শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য অপেক্ষা চাষ আবাদে টাকা খাটানো পছন্দ করে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে বটে। কিন্তু একটা জাতি যদি

শিল্প-বাণিজ্যে টাকা না খাটাইয়া জমি-জমাতে টাকা খাটানো বেশী পছন্দ করে, তার ফলে কি সে জাতির কোনো ক্ষতি হয়? ধরা যাক্, গুজরাতী-দের কথা। তাহারা বোধ হয় খানিকটা বাঙালীদের উল্টা। তাহাদের টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যেই বেশী খাটানো হয়, জমি-জমাতে কম। কিন্তু গুজরাতীরা জাতকে জাত কি বাঙালী জাতের চেয়ে বেশী ধনী? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন জমিজমায় টাকা খাটানো ততটা বাঞ্ছনীয় না হইবার একটি কারণ আছে। চাষ-আবাদে যে হারে খরচ বাড়ানো হয়, জমিজমা হইতে উৎপাদন ঠিক সেই হারে বাড়ে না, ক্রমশঃ কমিতে থাকে। স্বীকার করা গেল যে,—জমিজমায় টাকা খাটাইলে "নিম্নগ আয়ের" নিয়ম কাজ করিবে। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বাঙালীর আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, এটা বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণ করা যায় কি? এই প্রশ্নটি তলাইয়া মজাইয়া আলোচনা করা দরকার। স্থূলভাবে দেখিয়া শুনিয়া যতদূর বোঝা যায় তাহাতে মনে হয় যে বাঙালীর খাওয়া-পরা গুজরাতীদের চেয়ে, অন্য অনেক প্রদেশের লোকের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জিনিস। জমিজমাতে টাকা খাটানো বাংলার পক্ষে ক্ষতি-জনক যদি বলিতে হয়, সেটা সন্তোষজনক প্রমাণের উপর স্থাপিত করা দরকার।

বলা যাইতে পারে যে, বাঙালী ও গুজরাতী চাষীদের ঋণের পরিমাণ মাপিলে এ বিষয়ে একটা ধারণা করা সম্ভব। যদি কৃষির আয়ের উপর আয়-কর থাকিত তাহা হইলে গুজরাতী ও বাঙালীদের কয়জন কি পরিমাণ আয়-কর দেয় তাহার হিসাব হইতেও এই দুই জাতের কোন্‌টার আর্থিক অবস্থা ভাল তাহা বোঝা যাইতে পারিত।

কিন্তু, কৃষকের ঋণের পরিমাণ হইতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। কারণ, যেটা বাঙালী চাষীদের ঋণ, সেটা অন্য কয়েকজন বাঙালীরই

প্রাপ্য টাকা। ঐ ঋণ থাকার জন্য হয়তো জনকয়েক বেশী ধনী ও অনেকে গরীব, কিন্তু মোটের উপর সমগ্র জাতিটার আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিবার সময়, সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলার পরস্পরের কাছে কত দেনা বা পাওনা আছে, তাহা আলোচনা না করিলেও চলে। কৃষকের ঋণ জাতীয় দারিদ্র্যের, অর্থাৎ বাঙালীর দারিদ্র্যের চিহ্ন কিনা এই বিষয়টা আলোচ্য।

মাড়োয়ারী ও বাঙালী

ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতির অনুসন্ধান সম্পর্কে জানা গিয়াছিল যে, বাংলায় জনকয়েক ছাড়া অধিকাংশ ঋণদাতারাই মাড়োয়ারী অর্থাৎ অ-বাঙালী। মাড়োয়ারী যদিও বাঙালীর মত কাপড় পরে, তার ভাষায় কথা বলে, বাংলাদেশে দু চার পুরুষ থাকে, তার পূজা-আচ্ছা, সভা-সমিতির জন্য টাকা দেয়, বড় জোর তাহার ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য কেবল দেশে ছোটে, তাহা হইলে তাহাকে অ-বাঙালী বলিবার কোনো কারণ দেখি না। এই সম্পর্কে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমাদের মাড়োয়ারী-বিদ্বেষ বড় বেশী বাড়িতেছে। এটা আর বাড়ানো উচিত নয়। যতক্ষণ প্রফুল্লচন্দ্র বলেন যে মাড়োয়ারীকে দেখিয়া আমাদের শেখা উচিত, ততক্ষণ তাঁহার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু যদি কেহ তাহাদেরকে বয়কট করিবার কথা তুলে তখন আমি তাহার সঙ্গে একমত হইতে পারি না। মাড়োয়ারী-বিদ্বেষ পোষণ করিয়া কেবল যে আমরা জাতি-হিসাবে নিতান্ত নীচাশয় হই ও অপরের কাছে হাস্যাস্পদ হই তাহা নহে, আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই ঐরূপ করা একান্ত বোকামি। ব্যবসা-বাণিজ্যে অথবা শিল্পে আমাদের উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের উঠিতে হইবে অনেকাংশে

হয় ইংরেজের না হয় মাড়োয়ারীর টাকার জোরে। এই অবস্থা এখনও অনেক দিন চলিবে। আমাদের টাকার জোর সম্প্রতি যখন নাই, তখন আমরা ত উহাদের কাছে ছোট ও উহাদের কাছে আমাদের হাত পাতিতে হইবেই। কাজেই, উহাদেরকে একঘরো করিতে গেলে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করিব।

আধুনিক ভারতের আর্থিক জগতে মাড়োয়ারীর স্থান খুব বড়। মাড়োয়ারী শুধু যে বাংলা দেশকে ছাইয়া আছে তাহা নয়, তাহারা আজ সারা ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য মাড়োয়ারীকে বুঝিলে সারা ভারতের আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠা অনেকটা বোঝা হয়। এইজন্যই, "আর্থিক ভারতে মাড়োয়ারীর স্থান" অর্থনৈতিক গবেষণার একটা বড় বিষয়। ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে যেমন ইহুদিরাই ব্যাঙ্কার-হিসাবে আর্থিক জগতে রাজত্ব করিতেছে, সামান্য লোক হইতে রাজস্ব-সচিব পর্য্যন্ত সকল খৃষ্টানই তাহাদের নিন্দা ও হিংসা করে, অথচ টাকার দরকার হইলে তাহাদেরই কাছে হাত পাতে,—ভারতেও তেমনি মাড়োয়ারীরা সকলেরই ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে, অথচ লোকে উহাদেরই কাছে হাত পাতে ও পাতিতে বাধ্য হয়।

ভারতে আধুনিক পুঁজিনিষ্ঠা বলিতে আজকাল প্রধানতঃ মাড়োয়ারী-দের কর্ম্মকাণ্ডই বোঝায়। কাজেই ভারতের আধুনিক পুঁজি-বিকাশ সম্বন্ধে যদি গবেষণা করিতে হয়, তাহা হইলে মাড়োয়ারীরা কি রকমে নানা শিল্প-বাণিজ্যে টাকা যোগাইতেছে, তাহার চর্চ্চা করা দরকার।

এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা ভাল। মাড়োয়ারী বা গুজরাতীরা টাকার লেনদেনে ওস্তাদ। তাহারা টাকা যোগাইতে ও খাটাইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত তাহারা মগজের অন্যান্য কাজের বেশী ধার ধারে না। গুজরাতীদের বোম্বাইয়ে যে সব মিল আছে সেগুলার বড় বড়

মাথাওয়ালা ম্যানেজার ও এঞ্জিনিয়াররূপে যাহারা কাজ করিতেছে,তাহাদের অধিকাংশই গুজরাতী নয়। মারাঠারা বাঙালীদের মত প্রধানতঃ মস্তিষ্ক-জীবী জাত। বাংলাদেশে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা মাড়োয়ারীদের হাতে, বোম্বাইয়ে তেমনি গুজরাতীদের হাতে। বাঙালী ও মারাঠার আর্থিক অবস্থা ও প্রকৃতি এ দিক্ হইতে সমান।

বলা যাইতে পারে যে মাড়োয়ারী যেমন সিক্কার ব্যাপার বোঝে বাঙালী তেমন বোঝে না। কিন্তু তাহার জন্য বাঙালীর মস্তিষ্ক যে ছোট তাহা প্রমাণ হয় না। মাড়োয়ারীরা সিক্কা বোঝে কেন? তার কারণ হইতেছে, তাহারা আমদানি-রপ্তানি করে। সিক্কার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই তাহাদের লাভ-লোকসানের তারতম্য হয়। শিল্প-কারখানার মালিকদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। কাজেই শিল্পী আর বণিক্ ছাড়া আর কেউ সিক্কা সহজে বুঝিতে পারে না। কৃষি-প্রধান দেশ বা জাতের মাথায় সিক্কা-সমস্যা চট্ করিয়া ঢোকে না।

বাঙালী শিল্প-বাণিজ্যে রপ্ত নয় বলিয়া সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্য দেখা যায়। কিন্তু বড় বড় শিল্পে বাঙালী বেশী না থাকিতে পারে। বাঙালীর মধ্যে বড় বড় ব্যবসাদার না থাকিতে পারে। তবে ছোটখাটো শিল্প-বাণিজ্যে যে অনেক বাঙালী মোতায়েন আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক একটা শিল্পে বা বাণিজ্যে হাজার পাঁচেকের মত মূলধন লইয়া কত বাঙালী নিযুক্ত আছে, তাহার একটা বৃত্তান্ত তৈয়ার করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। যদি আমরা দেখাইতে পারি যে, বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যে অসংখ্য বাঙালী অল্প মূলধন লইয়া নিযুক্ত আছে, তাহা হইলে বাঙালীরা যে একেবারে শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য নয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, বর্ত্তমান নৈরাশ্যেরও অনেকটা লাঘব হইবে। সেই জন্য এই বিবরণী তৈয়ার করার দিকেও আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

ছোটখাটো ব্যবসার কথা

মফঃস্বলের অনেক উকীল আছেন যাঁহারা বিশেষ কিছু রোজগার করেন না, অথচ টাকা রোজগারের পন্থা সম্বন্ধে চিন্তা করেন। তাঁহাদেরকে একটা পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে। ভারত সরকারের কৃষি বিভাগে চাষ-বাসের কথঞ্চিৎ উন্নততর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেই সব উন্নততর যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া বেচিতে পারিলে, আমাদের চাষী ও কুটীরশিল্পীরা এখনই তাহা যথেষ্ট পরিমাণে কিনিবে। কাজেই, ঐ সব যন্ত্রপাতির জন্য বড় বড় বাজার তৈয়ার হইয়াই আছে। অথচ, ঐ সব যন্ত্রপাতি তৈয়ার করাও বিশেষ ব্যয়সাধ্য নয়। সুতরাং, ঐ সব যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিলে আমাদের দেশের চাষী-শিল্পীদেরও উপকার হইবে, শিক্ষিত বেকাররাও উপার্জ্জনের একটা নূতন উপায় খুঁজিয়া পাইবে।

অল্প-স্বল্প রোজগারের নানা উপায় আছে। মোজা-গেঞ্জীর কলের জন্য ববিনে ১০ পাউণ্ড সুতা গুটাইলে দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, খাম তৈয়ারী একটা অতি সোজা ও একটা বড় ব্যবসা। কলিকাতায় বোধ হয় এক হাজার মুসলমান খাম তৈয়ারী করিয়া প্রত্যেকে মাসে ২৫।৩০ টাকা রোজগার করে। খাম তৈয়ারীর জন্য চাই একটা কল,—দাম হাজার দেড়েক টাকা। একটা কলে যত কাগজ কাটিবে তাকে ভাঁজ করিতে ও তাহাতে গঁদ লাগাইতে প্রায় পঁচিশ জন ছোকরার দরকার হয়।

একটা ছোট-খাটো মোজা-গেঞ্জীর কলও টাকা রোজগারের মন্দ উপায় নয়। ছোটখাটো মোজা-গেঞ্জীর কল দেখিয়া অন্য কেহ হয়তো বলিবেন—"এ আর এমন কি কাণ্ড!" এম্-এস্-সি পাশকরা কোনো ছেলে হয়তো বলিবেন—"ইস্, আমি এম্-এস্-সি পাশ করিয়া কি না এই সামান্য

কল-কব্জা নাড়াচাড়া করিব !" কিন্তু সেদিন একটা ছোট্ট মিলের কয়েকটা মোজা-গেঞ্জীর কল দেখিতে দেখিতে আমার প্রাণে উৎসাহের কি হাওয়া বহিয়া যাইতেছিল ! সেই কলগুলা হইতে বর্ত্তমানে অন্ততঃ পঁচিশ জনের অন্নসংস্থান হইতেছে। শীঘ্রই সেই মিলটিকে বাড়াইয়া দুইশ', তিনশ' লোকের অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

বাংলাদেশে ছোট-খাটো এমন অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলা পরে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে। অথচ টাকার অভাবে তাহা পারিতেছে না। এই সকল ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য বাংলার জেলায় জেলায় শিল্প-পুঁজি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শিল্প-ব্যাঙ্কগুলার যা উদ্দেশ্য ইহাদেরও তাহাই হইবে,—কিন্তু ইহারা আর্থিক সাহায্য দিবে কেবল ছোট-খাটো শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলাকে। সেই সব পুঁজি-সঙ্ঘ যে কেবল টাকা বিলাইবার প্রতিষ্ঠান হইবে তা নয়, এগুলা দস্তুরমত লাভ অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এগুলা হইবে লিমিটেড্ কোম্পানী। যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে টাকা ঢালিলে এখন না হউক ভবিষ্যতে লাভ হইবার আশা আছে, সেই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ইহারা টাকা ঢালিবে।

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "যে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইহাদের কাছে অর্থ-সাহায্য পাইবে, কেবল সেইগুলাই পুঁজি-সঙ্ঘের সভ্য হইবে ত ?"

উত্তরে বলিব "না, আমার মতলব তাহা নয়।" আমি চাই পূরাদস্তুর পুঁজিনিষ্ঠার কর্ম্ম-কেন্দ্র। যাহারা সাহায্য পাইবে তাহারা ইচ্ছা করিলে এই সঙ্ঘের শেয়ার কিনিতে পারে। কিন্তু সঙ্ঘ কেবল যে তাহাদেরই "সমবায়ে" গঠিত হইবে এমন আমি চাই না। এই সঙ্গে একটা কথঞ্চিৎ পুরাণা কথা বলি। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় শ' আটেক ছোট-খাটো লোন আফিস আছে। ১৯২৬-২৭ সনে আমি চাহিয়াছিলাম যে এই গুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া

জায়গায় জায়গায় গোটাকয়েক বড় বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠুক্। কিন্তু উহাদের কর্ত্তারা আমার কথাটা ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে "ব্যাঙ্কিং ফেডারেশনে"র খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহাতে আবার "সমবায়" প্রথা জারি করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তা চাই নাই। আমি চাহিয়াছিলাম যে ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলা ভাঙ্গিয়া গিয়া যেন দু'একটা বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। বৃহদাকারের উপর জোর দেওয়া ছিল আমার মতলব।

সমবায় প্রথার ব্যবস্থায়,—যে সব ছোট ছোট ব্যাঙ্ক আছে, তাহারা ছোটই থাকিয়া যাইবে। বড় হইলে তাহাদের কার্য্যক্ষমতা বাড়িতে পারে কিন্তু তাহাদের বড় হইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবার কথা। তা ছাড়া, তাহারা যে টাকা তুলিবে তাহা নিজেদের মধ্যেই খাটাইতে থাকিবে। এইজন্যই আমি চাই যে ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলা গুঁড়াইয়া যাউক্, তাহাদের স্থানে বড় বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠুক্, সেগুলা ছোটগুলাকে কুক্ষিগত করিয়া পৃথক্ সত্তা লইয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

দার্শনিক বনাম দর্শনের ইতিহাস-লেখক

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার বক্তৃতাটার কথা ছিল প্রধানতঃ এই — বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে প্রচার করেন নাই, তিনি হিন্দুত্ব প্রচার করেন নাই, তিনি তাঁর দেশকেও প্রচার করেন নাই। এ কথাগুলা বলিবার পরই সভায় উপস্থিত লোকেরা ভাবিতেছিল—"লোকটা বলে কি! তাহা হইলে তিনি প্রচার করিলেন কাকে?" তখন আমি বলিলাম, তিনি প্রচার করিয়াছিলেন নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞতাকে। এইটাই বিবেকানন্দের বিশেষত্ব। প্রথম শ্রেণীর মানুষ যাহারা তাহারা পরের কথা আওড়ায় না,

তাহারা নিজের জীবনে ধাক্কা-খাইয়া-শেখা নিজের কথাই বলে। যাহারা অমুক চিন্তা তমুক চিন্তার ইতিহাস লেখে, তাহারা যত ভাল কথাই বলুক, তাহাদের মধ্যে কোনো মৌলিকত্ব নাই। কারণ, তাহারা পরের ধার-করা কথাই সাজাইতেছে, গুছাইতেছে এবং নূতনভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। এই জন্যই বলি যে সারা ভারতে আজ একজনও দার্শনিক নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নূতন কোনো চিন্তা-প্রণালী গড়েন নাই, পুরাণো চিন্তা-প্রণালী লইয়াই নাড়া-চাড়া করিতেছেন। দর্শনের ইতিহাস লিখিয়া অথবা সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ প্রচার করিয়া বিদ্যার পরিচয় দেওয়া যায়। এ সবই প্রশংসার কথা। কিন্তু তাহাকে দর্শন বলি না। ওসব দর্শনের প্রত্নতত্ত্ব মাত্র। বিবেকানন্দ পরের কাছে শেখা বা ধারকরা বুলি আওড়ান নাই। জীবনের জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা যে সব সত্য তাঁহাকে শিখাইয়াছে, সেইগুলিই তাঁহার বক্তৃতা, বই ও প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহাকে বলি একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক।

নূতন সমাজ-শাস্ত্রের বনিয়াদ *

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সব বড় লোকেরাই শিখাইয়া গিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন, প্রাচ্যের কাজ হইতেছে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা, পাশ্চাত্যের কাজ হইতেছে সাংসারিক বিষয়ে উন্নতি করা। তাঁরা এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন পাশ্চাত্যের দার্শনিক হেগেল, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির কাছে। কিন্তু হেগেল, ম্যাক্সমুলার উহা আমাদের জন্য ভাল ভাবিয়া বলেন নাই। তাঁহাদের কথা এই যে, প্রাচ্য এত অকর্ম্মণ্য যে, সে ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়াই থাকুক, সাংসারিক উন্নতি তাহার সাজে না। আমরাও সেই শিক্ষা পাইয়া বলিতে লাগিলাম, "ঠিক তো, আমরা আধ্যাত্মিক জাত,

* মালদহ মোস্লেম ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)।

আমরা সাংসারিকতায় মাতিব কেন? দেশশাসন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, যুদ্ধ করা, শান্তিরক্ষা করা এ সব মেথর মুর্দ্দফরাসের মত হেয় লোকের কাজ। ওসব কাজ ম্লেচ্ছ পাশ্চাত্যদেরই সাজে, আমরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়াই থাকিব ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিব।"

আধ্যাত্মিকতার আমি নিন্দা করি না। ভারতের আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা স্বীকার করি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, আমার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহাও স্বীকার করি। ভারতীয় নর-নারীর আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়া গৌরব বোধও করি। কিন্তু যখন কেহ বলে যে আধ্যাত্মিকতায় ভারত সেরা, অথবা পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতা নাই, তাহার কথা আমি মানি না। আমি আমার স্বজাতভায়া বাঙালীর সঙ্গে যেমন কথা বলি, যেরকম ব্যবহার করি, ইয়োরামেরিকার নানা দেশের মুচি হইতে মন্ত্রী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে তেমনভাবে কথা বলিয়াছি ও ব্যবহার করিয়াছি। ওসকল জাতের অনেকেরই হাঁড়ীর খবর পর্য্যন্ত রাখি। সেই অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই আমি বলিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতায় পাশ্চাত্য আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

লোকে বলে যে পাশ্চাত্যে আমাদের দেশের মত 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' নাই। আমি বলিতেছি যে প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইয়োরোপের অনেকের মধ্যে ভারতীয় ছাঁচের অতীন্দ্রিয়তা পাওয়া যায়। 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা হয় নাই বলিয়াই আমরা ভাবি অধ্যাত্ম-নিষ্ঠা ভারতের একচেটিয়া।

বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিবেকানন্দ যে শিকাগোর ধর্ম্মমেলায় যাইয়া বেদান্তের হুঙ্কার ছাড়িতে পারিয়াছিলেন ও দুনিয়াকে চম্‌কাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাপ্‌কা বেটা বীর বলি। তাঁহার সময়ে আমাদের দেশের লোক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল।

সেই সময় "আধ্যাত্মিকতায় জগৎ জয় করিতে হইবে" এই বাণী দ্বারা বিবেকানন্দ ভারতবাসীর মধ্যে একটা যে সাড়া আনিয়াছিলেন, তাহার কিম্মৎ লাখ টাকা। যাহারা একেবারে নগণ্য, অধঃপতিত, কোনো দিকে কিছুই করিবার সুযোগ পাইতেছিল না তাহারা দেখিল যে, হাঁ একটা দিক্ আছে, যে দিক্ দিয়া তাহারা দুনিয়ার সেরা হইতে পারে। ইহা দস্তুর মাফিক "যুগান্তর"। বিবেকানন্দ একটা গতিশীল কর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য তাঁহাকে যুগাবতাররূপে পূজা করি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার গলদ্‌টা অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে বিভিন্ন, প্রাচ্য যে আধ্যাত্মিক আর পাশ্চাত্য যে সাংসারিক,—এই ধারণা বিবেকানন্দকেও পাইয়া বসিয়াছিল। আমার বিবেচনায়,—যে যুগে তিনি জন্মিয়াছিলেন উহা সেই যুগেরই দোষ। সম্প্রতি (১৯৩০) স্বামী অশোকানন্দ "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় "বিবেকানন্দের আর্থিক চিন্তা" সম্বন্ধে যা লিখিয়াছেন তা পড়িয়া মনে হয় যে, আর কিছু দিন বাঁচিলে বিবেকানন্দ বোধ হয় ঐ গোড়ার গলদ্‌টার অধীনে বেশী দিন থাকিতেন না। একটা চিন্তা ফুটাইয়া তুলিতে সময় লাগে। অনেক সময় আট-দশ বছরের কমে হয় না। অথচ, অল্পমাত্র কাজ করিবার পর বিবেকানন্দ উনচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তথাকথিত প্রভেদটা যে সত্য নয়, বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় তিনি পূরাপূরি বুঝিতে পারিতেন।

এইখানে নিজের কথাই একটু বলি। আমিও প্রথমে ঐ গোড়ার গলদ্‌টার মধ্যে পড়িয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিতাম। "সাধনা" বইখানা প্রথম লেখা (১৯০৭-১০)। তাহাতে এই "ফিলজফি" খুব বেশী দেখা যাইবে। তারপর, যখন শুক্রনীতিটা অনুবাদ করি (১৯১২-১৩), তখন আমার ধারণা বদলাইতে আরম্ভ করে। যদি প্রাচীন ভারতে অন্ততঃ একখানি বইও থাকে যাহাতে বস্তুনিষ্ঠা ও

জড়বাদের চর্চ্চা প্রচুর দেখা যায়, তাহা হইলে ভারত যে কেবল আধ্যাত্মিক নয়, সেটা হাতে হাতে প্রমাণ হইয়া গেল। শুক্রনীতি এইরূপ একখানা বই। ঐ শ্রেণীর আরও অনেক বই ভারতে আছে। মহাভারতে এমন কথাও বলিয়াছে—"যখন দুর্ব্বল থাকিবে শত্রুকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু যখন সবল হইবে তখন ডিমকে পাহাড়ের গায়ে যেরকম চূর্ণ করা যায়, শত্রুকে সেইরকম আছড়াইয়া মারিবে।" এই ধরণের কথা মহাভারতে ভূরি ভূরি পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা মহাভারতকে মানবীয় শক্তিযোগের দিক্ হইতে পড়ি না, তাহার মধ্যে কেবল অধ্যাত্ম-তত্ত্বই ঢুঁড়িয়া থাকি।

১৯১৪ সনে যখন ইয়োরোপে যাই তাহার পূর্ব্বে আমার শুধু এই ধারণা হইয়াছিল যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। তখন প্রচার করিতাম যে, রেণেসাঁস পর্য্যন্ত ইয়োরোপ ও এশিয়া প্রায় সমান সমান চলিতেছিল। তারপর ইয়োরোপ সাংসারিকতায় যতটা অগ্রসর হইয়াছে, এশিয়া ততটা পারে নাই। আজকাল এই ধারণা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। এখন ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন শক্তিগুলাকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতেছি। তা ছাড়া, দুনিয়ার দেশগুলা কে কোন্ ধাপে আছে, কোন্ দেশটা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ইকুয়েশ্যন বা সাম্য-সম্বন্ধ তৈয়ার করিয়া দিতেছি। মানুষ সূত্র বা প্রিন্সিপল্ বা ইকুয়েশ্যন খোঁজে। তাতে একটা জিনিষ চট্ করিয়া ধরা যায়। এইজন্যই ইকুয়েশ্যনগুলা তৈয়ার করিয়াছি।

আমেরিকায় যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতি-গত সাম্যের কথা প্রচার করি (১৯১৭-২০), তখন দর্শনাধ্যাপক ডুয়ী বলিয়াছিলেন, "ইহা সত্যই আশ্চর্য্য যে এই কথাটা এতদিন কাহারও মাথায় ঢোকে নাই। একশ' বছরেরও উপর দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা একটা ভুল ধারণার

বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। এত বড় একটা ভুল কি করিয়া সম্ভব হইল?"

কিন্তু মজার কথা। অন্যান্য সত্য আবিষ্কার করার মতন এই সত্যটা আবিষ্কার করাও নেহাৎ কষ্টকল্পনার সামগ্রী নয়। চাই তুলনামূলক যুক্তিশাস্ত্রের প্রয়োগ। ইয়োরোপে তুলনামূলক আলোচনার পথ দেখান জার্ম্মাণ হার্ডার তাঁর "ফিলোজোফীড্যর গেশিষ্টে" "(ইতিহাস-দর্শন)" নামক বইয়ে এবং তার পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসী পণ্ডিত মতাঁস্কিয়ো তাঁর "লেস্প্রিদে'লোআ" (আইনকানুনের মর্ম্মকথা) নামক গ্রন্থে। এশিয়ায় তুলনামূলক আলোচনার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। রামমোহন রায়ের মাথায় তুলনামূলক গবেষণা-প্রণালী না থাকিলে সকলের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রাচ্যের জন্য বরণ করিয়া লইতে পারিতেন না। "ফিউচারিজম্ অব্ ইয়াং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা) বইয়ে (১৯২২) জগতের তুলনামূলক আলোচনা প্রণালীর অন্যতম জনকরূপে রামমোহনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি। কিন্তু দেশের লোক কি রামমোহন রায়কে সেই চোখে দেখে? ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক এই আখ্যা দিয়া তাঁহাকে একঘরো করিয়া রাখিয়াছে। রামমোহনের মগজের কিম্মৎ এখনও বাঙালী পূরাপুরি বোঝে নাই।

যাহা হউক, তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর সেকেলে পণ্ডিতেরা আর দার্শনিকেরা অনেক ভুলচুক করিয়াছেন। তাঁহারা যুগের পর যুগ ধরিয়া প্রত্যেক দেশের জীবনযাত্রা ও ধরণধারণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেন নাই। তাঁহারা পুরাণা জিনিষগুলার সঙ্গে আধুনিক জিনিষগুলার তুলনা করিতে ঝুঁকিয়াছেন। পাশ্চাত্যে আজকাল যে সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জয়-জয়কার দেখিতে পাই, সে সব যে পঞ্চাশ পঁচাত্তর এক শ' দেড়শ' বছর পূর্ব্বেও পাশ্চাত্যে ছিল না, তা তাঁহাদের খেয়ালে নাই। আবার এশিয়ায়

যে সব খুঁটিনাটি আজও দেখিতে পাইতেছি, সে সব যে "সেকালে" ইয়োরোপের দেশবিদেশেও পূরামাত্রায় বিরাজ করিত, সে সব কথা তাঁহারা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই তুলনায় আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহারা অসংখ্যপ্রকার যুক্তিহীন সূত্র ঝাড়িয়াছেন। এইগুলা দেখাইতে যাইয়াই আমার লেখাপড়ার ভিতর নূতন সমাজশাস্ত্রের বনিয়াদ গাড়া হইয়া পড়িয়াছে। ডুয়ীর সঙ্গে আলোচনায় এই সকল কথাই প্রধান স্থান পাইত।

বল্কান-মাপ না মার্কিণ-জার্ম্মান-বৃটিশ মাপ?

আমরা আমাদের দেশের আয়ের সঙ্গে অন্যান্য দেশের আয়ের তুলনা করিয়া থাকি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় হয়তো ৯০০৲ টাকা, আমাদের আয় হয়তো ৭০-৮০৲ টাকা। অথবা মাথাপিছু বীমার মূল্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে হয়তো ১৫০০৲ টাকা, আর আমাদের দেশে ৫৲ টাকা। তারপর উহাদের দেশে লোকে খাওয়া পরার জন্য কত বেশী খরচ করে, আমাদের দেশের জীবনযাত্রা প্রণালী উহাদের তুলনায় কত নীচে! এই সব কথা ভাবিয়া আমরা মনে করি, আমরা অনেক পেছনে আছি, আমাদের উন্নতি হওয়া সোজা নয়।

কিন্তু, এই ধরণের তুলনা করিবার সময় আমাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত। উহাদের দেশে লোকে যতটা খাইতে বা পরিতে না পাইলে বাঁচিতে পারে না, আমাদের দেশে তাহার চেয়ে ঢের কম খাইলে বা পরিলেও চলে। যে সব জিনিষ খাইয়া এদেশে বেশ বাঁচা যায়, সেগুলার মাসিক দাম হয়তো জনপ্রতি টাকা তিনচারেক মাত্র।

তারপর কাপড়চোপড়ের জন্য মাসিক খরচা টাকাটেক। এই গেল চার-পাচ টাকা। প্রত্যেকের কার্য্য-দক্ষতার জন্য কিছু বাঁচানো উচিত ও

কিছু বীমা করা দরকার। তার জন্য ধরা যাক্ টাকাটেক। এই গেল ছয়-সাত টাকা। এদেশে মাসিক পাঁচ-সাত টাকা খরচায় বাঁচিয়া থাকা, এমন কি খানিকটা কার্যাদক্ষ হওয়া সম্ভব। সর্ব্বত্রই নেহাৎ নিম্নতম হার ধরিতেছি। এটা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে, যেহেতু মাকিণরা তাহাদের খাওয়া পরার জন্য আমাদের দশবিশ গুণ খরচ করে, তার জন্যই যে তারা দশবিশগুণ কার্য্যদক্ষ হইবে তাহা সত্য নয়। উহারা যতটা খাওয়া-পরা বা আরাম পাইলে শ্রেষ্ঠ দক্ষতা দেখাইতে পারে, আমরা তাহার চেয়ে ঢের কম খাওয়াপরা পাইয়াও ঠিক সেইরকম দক্ষতা দেখাইতে পারি। কাজেই, যতদিন না আমাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী উহাদের সমান হইতেছে, ততদিন আমাদের যে হতাশ হইয়া থাকিতে হইবে, তাহা নয়। বিভিন্ন দেশের আয়-ব্যয়ের তুলনা করিবার সময় এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার।

১৯২৬ হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত বলিয়াছি যে,মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি, বিলাত ইত্যাদি দেশ সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে পঞ্চাশ ষাট বছর অগ্রবর্ত্তী, ইতালি, জাপান, রুশিয়া আমাদের চেয়ে অল্পমাত্র উন্নত, আর বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুর্কী ইত্যাদি আমাদের প্রায় সমান-সমান। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সনে দ্বিতীয়বার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছি যে, ভারতবর্ষ আর্থিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর দেশগুলা হইতে পিছনে বলিয়া, যতদিন না ভারত উহাদের নাগাল ধরিবে ততদিন যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নয়। আমরা গরীব বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের কর্ম্মদক্ষতার অভাব নাই। আমাদের মধ্যে "শিক্ষিতে"র সংখ্যা বেশী নয় বটে, কিন্তু শিক্ষার অভাব রাজনৈতিক শক্তি পরিচালনার পক্ষে বাধা বলিয়া আমি মনে করি না। প্রায় আমাদেরই মত অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত জাতি ত' অনেক স্বাধীন রহিয়াছে। এইজন্য, আমরা নানাবিষয়ে পশ্চাৎপদ

হইলেও—এখনই আমরা উচ্চতম রাজনৈতিক শক্তি পাইবার যোগ্য, এ কথা আমি সজোরে বলিয়া থাকি। বল্কান জনপদ, পূর্ব্ব ইয়োরোপ ইত্যাদি দেশের নরনারী শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর চেয়ে বেশী কিছু উন্নত নয়। তাহা সত্ত্বেও যদি তাহারা স্বাধীনতা, স্বরাজ, গণরাষ্ট্র ইত্যাদির মালিক হইতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গালী আর অন্যান্য ভারতবাসীও এই সব চীজ্ দাবী করিতে অধিকারী। আমাদের ভিতর কেজো লোক যাহারা হইবে তাহারা কথায় কথায় মার্কিণ, জার্ম্মাণ, বৃটিশ মাপ না চালাইয়া "বল্কান মাপ", পোল্যাণ্ডের মাপ, রুশিয়ার মাপ ইত্যাদি মাপে ভারতীয় কর্ম্মদক্ষতা আর ধরণ-ধারণ জরীপ করিতে অগ্রসর হইবে। ইয়োরোপের প্রায় দশ আনা কি বারো আনা নরনারী এই "বল্কান" মাপের লোক। ইয়োরামেরিকার অতি সামান্য অংশই মার্কিণ-জার্ম্মাণ-বৃটিশ বা তার কাছাকাছি (ফরাসী) মাপের জনপদ। এই প্রভেদটা পাকড়াও করিতে পারিলেই বাঙালী কর্ম্মবীরেরা পাকা স্বদেশ-সেবক হইতে পারিবেন।

বল্কান মাপ বলিলে বল্কান-চক্র ছাড়াও অন্যান্য অনেক জনপদই বুঝিতে হইবে। "বল্কান মাপ" আমার নিকট একটা পারিভাষিক শব্দ বিশেষ। শিল্প-নিষ্ঠার জরীপ করিতে বসিলে বল্কান মাপে নিম্নলিখিত জনপদগুলাকে প্রায় এক গেলাসের ইয়ার বিবেচনা করিতে পারি :— (ক) বল্কান-চক্র। এই চক্রের অন্তর্গত দেশগুলা গুন্‌তিতে চার, যথা— (১) বুলগেরিয়া, (২) রুমাণিয়া, (৩) জুগোশ্লাভিয়া, (৪) আলবানিয়া। কিন্তু নিম্নলিখিত পাঁচটা দেশকেও ইহার সামিল বিবেচনা করিতে পারি :—(১) গ্রীস, (২) তুর্কী, (৩) হাঙ্গারি, (৪) চেকোশ্লোভাকিয়া, (৫) পোল্যাণ্ড। রাষ্ট্রিক হিসাবে এইগুলা পরস্পরসম্বদ্ধ ত বটেই ; কৃষি-শিল্পবাণিজ্যের তরফ হইতেও এই নয় জনপদ প্রায় এক গোত্রেরই সামিল।

তবে চেকোশ্লোভাকিয়া আধুনিক শিল্প ও পুঁজিনিষ্ঠায় খানিকটা অগ্রবর্ত্তী। বরাতের জোরে ইহার ভিতর পুরাণা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির শিল্প জনপদগুলি পড়িয়াছে। (খ) পূর্ব্ব ইয়োরোপ :—(১) বাল্‌টিক জনপদ (লিথুয়ানিয়া, এস্থোনিয়া, লাট্‌ভিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ড), (২) রুশিয়া। কোনো কোনো হিসাবে পোল্যাণ্ডকে পূর্ব্ব ইয়োরোপের অন্তর্গত বিবেচনা করাই যুক্তি-সঙ্গত। রুশিয়া "প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি" বটে, কিন্তু আর্থিক ও আত্মিক কারবারে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, অর্থাৎ "গস্‌প্ল্যানে"র পরেও,—সে বল্কান-চক্রেরই বড়দাদা মাত্র। (গ) ল্যাটিন আমেরিকা। মেক্‌সিকো হইতে মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সকল জনপদ। এই ভূখণ্ডে আর্জ্জেন্তিনা শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে সেরা। (ঘ) চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য জনপদ (যথা · আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম),—জাপান বাদে ভারতের চেয়ে কিছু অবনত ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। (ঙ) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ ডমিনিয়ান বাদে সকল অংশই,—এমন কি মিশরও, ভারতের ছোট ভাই স্বরূপ।

ভারতে যখন আমরা দেশ-বিদেশের নজির আনিতে ছুটি, তখন হোমরাচোমরা জনপদগুলার কাজকর্ম্ম খতাইয়া দেখিতে গেলে বেশী লাভবান হইতে পারিব না। লাভবান হইতে পারিব যদি আমাদের জুড়িদার বা বড়দাদা ও ছোট ভাইগুলার আথিক ও আত্মিক দৌড় সম্বন্ধে চাক্ষুষ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জ্জন করি। জার্ম্মাণ-মার্কিণ-বৃটিশ-ফরাসী জীবনযাত্রা ও ধরণধারণ ভারতবাসীর পক্ষে আসমানের চাঁদ বিশেষ। চাই বাংলায় বল্কান-গবেষণা আর বল্কান-বিশেষজ্ঞ।

দেশোন্নতির রাষ্ট্র-দল

হিন্দুদের-মুসলমান-সমস্যা অথবা মুসলমানদের হিন্দু-সমস্যা বাঙালীর কিম্বা গোটা ভারতের আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা স্বদেশসেবা-বিষয়ক

আর স্বদেশসেবক-বিষয়ক। দেশে যথার্থ স্বদেশসেবকের অভাব, খাঁটি স্বদেশ-সেবা-প্রণালীর অভাব। স্বদেশসেবক মুসলমানেরা স্বদেশসেবক হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিবেই করিবে। আবার হিন্দুদের ভিতর যাহারা স্বদেশ-সেবক তাহারাও স্বদেশসেবক মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইবে।

কাউন্সিল আর অ্যাসেম্ব্লিতে আইনতঃ হিন্দুর দল আর মুসলমানের দল খাড়া হইতে চলিল বটে (সেপ্টেম্বর ১৯৩২)। কিন্তু এইরূপ সাম্প্রদায়িক দলভেদ পুষ্টি করার স্বপক্ষে আইন কায়েম হওয়ার প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা বড় বেশী দেখা যাইবে না। দেখা যাইবে হিন্দু-মুসলমান বনাম স্বদেশদ্রোহিতা। কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লির অধিকাংশ কর্ম্মক্ষেত্রেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানে মিলিয়া রাষ্ট্রদল গড়িয়া তুলিবে। আবার মুসলমানের সঙ্গে মিলিয়াও হিন্দুরা রাষ্ট্রদল গড়িতে ঝুঁকিবে। প্রত্যেক দলেই দেখিতে পাইব হিন্দুর পাশে মুসলমান আর মুসলমানের পাশে হিন্দু। ধর্ম্মের নামে, উপাসনাপদ্ধতির নামে, দাড়ী-টিকির নামে দল গুলা মার্কা-মারা থাকিবে না, দলগুলা দাগ দেওয়া থাকিবে লোকজনের হিতসাধক কর্ম্মপ্রণালীর নামে। প্রথম প্রথম কিছুদিন টিকি-দাড়ীর দৌরাত্ম্য থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দৌরাত্ম্য বেশীদিন মারাত্মকরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না।

মুসলমানদের ভিতর যাহারা শেয়ানা তাহারা দেখিবে যে, একমাত্র মুসলমান বলিয়া তাহারা মুসলমান নেতাদের কাছে কল্কে পাইতেছে না। আবার হিন্দুদের ভিতর যাহারা শেয়ানা তাহারা ত এখনই জানে যে, একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহারা মাতব্বরস্থানীয় হিন্দুদের প্রিয়পাত্র হইতে পারে না। কাজেই উভয় সম্প্রদায়ই তথাকথিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব জলাঞ্জলি দিয়া জীবনমরণের আসল স্বার্থগুলা যাহাতে সংরক্ষিত হয়

তাহার জন্য হিন্দু-মুসলমানের যৌথ দল গড়িতে থাকিবে। যে সকল হিন্দুর নিকট অন্যান্য হিন্দুরা উঠিতে বসিতে নাস্তানাবুদ হয়, আর যে সকল মুসলমানের নিকট অন্যান্য মুসলমানেরা শির্ খাড়া রাখিয়া চলাফেরা করিতে অসমর্থ, সেই সকল হিন্দু ও মুসলমানের বিরুদ্ধে এই সব নিষ্প্রভ হিন্দু ও বে-ইজ্জৎ মুসলমান সমবেতভাবে আত্ম-চৈতন্যবিধায়ক আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহায়ক রাষ্ট্রদল গড়িয়া তুলিবে। ইহাই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নয়া-বাঙ্গলার রাষ্ট্রিক গড়ন। তাহাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

এই সকল কথা আমার নিকট প্রাথমিক স্বীকার্য্য বিশেষ। এইবার বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী একটা রাষ্ট্রিক কর্ম্মকৌশল মাত্র "কয়েক বৎসরের জন্য" দেশের নিকট পেশ করিতেছি। প্রথমেই আরও দু'একটা কথা স্বীকার করিয়া লইতেছি :—

১। ১৯৪০ সনের ভিতর বাঙ্গলা দেশ "স্বাধীন"ও হইবে না আর বাঙালী জাতি "স্বরাজ"ও পাইবে না।

২। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের ভিতরই সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গলার নরনারী অনেক বিষয়ে জীবন উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ।

৩। কাজেই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যাঁহারা স্বদেশসেবা-ব্রতধারী তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতবাসীর জন্য অথবা বাঙ্গলাদেশের জন্য "চরম লক্ষ্য" ও "মুখ্য উদ্দেশ্য" ইত্যাদি লম্বাচৌড়া মুখরোচক আদর্শের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত থাকুন। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা অনতিদূর ভবিষ্যতে যে সকল দেশহিতবিষয়ক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রুজু করা সম্ভব ও সহজসাধ্য তাহার চর্চ্চায় সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করুন।

৪। আগামী তিন, পাঁচ বা সাত বৎসরের জন্য দেশোন্নতির রাষ্ট্রদল গড়িবার মতলবে একটা কর্ম্মপ্রণালী জারি করা যাইতেছে। জেলায়

জেলায় যাঁহারা এই প্রণালী অনুসারে দেশসেবার কাজে বহাল থাকিতে রাজি আছেন তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন। কর্ম্মতালিকাটা বহরে যথাসম্ভব খাটো রাখিতেছি, যথা :—

ক। সামাজিক কর্ম্ম-কৌশল

১। মুসলমান, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীর জন্য জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিবার সুযোগসমূহ নানা উপায়ে বাড়াইয়া দিতে হইবে।

২। যে সকল সামাজিক রীতিনীতির দরুণ বর্ত্তমানে কোনো কোনো শ্রেণীর নরনারী উন্নতির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে সেই সকল রীতি-নীতি সরকারী আইনকানুনের সাহায্যে আইনবিরুদ্ধ ও সাজা-যোগ্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

৩। এই কর্ম্মপ্রণালী মাফিক সমাজ-পুনর্গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্টের তদ্‌বিরে একটা শাসনবিভাগ কায়েম করিতে হইবে।

খ। স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্ম্ম-কৌশল

সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যোন্নতি পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে একটা সরকারী কানুন জারি করিতে হইবে।

গ। অর্থনৈতিক কর্ম্ম-কৌশল

১। জমিজমার উত্তরাধিকার ও ভাগবাটোয়ারা সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসল-মান সমাজে যে সকল আইনকানুন প্রচলিত আছে সেই সবের সংস্কার সাধন করিতে হইবে। কোনো নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী যাহাতে অপরাপর হিস্যাদারদিগের হিস্যা যথোচিত মূল্যে কিনিয়া লইয়া সম্পত্তির একক মালিক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। বেতনভোগী মজুর ও কেরাণীদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যাধি-বীমা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৩। আধুনিক শিল্প-কারখানায় বাঙ্গলা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য (১) সরকারী অর্থসাহায্য আর (২) বিদেশী পুঁজি আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। এই কর্ম্মপ্রণালী মাফিক আর্থিক-উন্নতি বিষয়ক সরকারী শাসন-বিভাগ কায়েম করিতে হইবে। স্থায়ীভাবে অনুসন্ধান, গবেষণা আর পরামর্শ দেওয়া এই বিভাগের নিয়মিত কাজ থাকিবে।

ঘ। আন্তর্জ্জাতিক কর্ম্ম-কৌশল

১। বিলাতে "সাম্রাজ্যপুষ্টি" বিষয়ক যে সকল কাজকর্ম্ম চলিতেছে তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে আর তাহার সাহায্যে বাঙ্গলার নরনারীর স্বার্থ পুষ্ট করিতে হইবে।

২। দেশবিদেশে বাঙালী বাণিজ্যদপ্তর কায়েম করিয়া বাঙ্গলার কৃষি-জাত দ্রব্যের বাজার বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

৩। দেশবিদেশে বাঙালী-পরিচালিত অর্থনৈতিক গবেষক সঙ্ঘ বসাইয়া আমাদের সুবিধাজনক সর্ত্তে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও পুঁজি আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যুবক বাঙ্গলার শক্তিযোগী স্বদেশসেবকদের ভিতর যাঁহারা রাষ্ট্রিক হিসাবে কাজে নামিতে চাহেন তাঁহাদের কয়েকজনে অগ্রসর হইয়া এই কর্ম্মপ্রণালীকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলুন। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনের কাজে এই ঢঙের একদল ঘরামীও আবশ্যক।

পরিশিষ্ট

মালদহে সম্বর্দ্ধনা

পাণ্ডিত্য ও মনীষার প্রতীক বাংলার গৌরব

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার করকমলেষু—

প্রীতিভাজনেষু,

মালদহের আপনি। আপনার মালদহ এই আপনার আকস্মিক শুভাগমনে আপনার উদ্দেশ্যে তাহাদের সন্নিহিত ও বহুকাল সঞ্চিত শ্রদ্ধা-প্রীতির অকপট নিদর্শন উপস্থিত করিতেছে।

আপনার শৈশবের খেলার সাথী, যৌবনের কর্ম্মসঙ্গী ও প্রবাসের সুখস্মৃতি মালদহবাসী আপামরসাধারণের এ ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র আপনি গ্রহণ করুন।

আপনার আদর্শের অনুকৃতি, শিক্ষার শুভপরিণতি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব-পরিপুষ্ট মালদহবাসীর এই সস্নেহ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন আপনি গ্রহণ করুন।

আপনার পাণ্ডিত্য, আপনার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, আপনার বিশ্ব-সমাদর মালদহবাসী গৌরব ও স্পর্দ্ধার আস্পদ এবং সম্পূর্ণ ই নিজস্ব জ্ঞান করে।

আপনার যশোভাতি বিশ্বপরিব্যাপ্ত হউক, আপনি দীর্ঘায়ু হউন, আপনার পারিবারিক জীবন মঙ্গলময় হউক এবং আপনার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও ভাবধারা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যচ্যুত না হউক ইহাই আপনার মালদহবাসীর আন্তরিক কামনা এবং প্রার্থনা। ইতি—

১৩৩৯, ৩রা আশ্বিন। আপনার একান্ত সুহৃদ মালদহ বাসিবৃন্দ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী